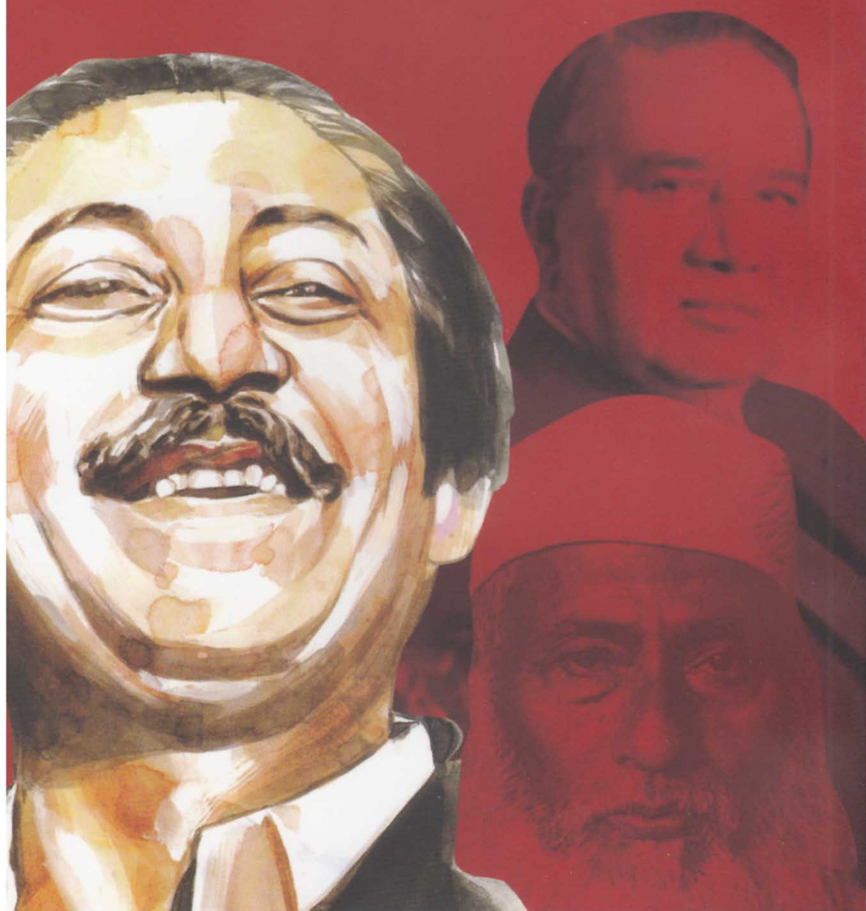
আওয়ামী লীগ

উত্থানপর্ব ১৯৪৮-১৯৭০

মহিউদ্দিন আহমদ



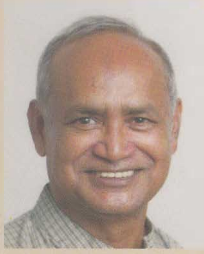
একটা জনগোষ্ঠীর জেগে ওঠার কাহিনি লেখা হয়েছে এ বইয়ে। এর সঙ্গে মিশে আছে একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম ও বেড়ে ওঠার গল্প, সাংবিধানিক গণতন্ত্র আর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে নিরন্তর লড়াই। অনুসন্ধানী গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ অতীত খুঁড়ে জানা-অজানা অনেক তথ্য তুলে এনেছেন এ বইয়ে, যা পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে ইতিহাসের মহাসড়কে।



Prothoma

201612000066
TK. 480.00

এ দেশে বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠেছে অনেক রাজনৈতিক দল। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগ নানা দিক থেকেই ব্যতিক্রম। আওয়ামী লীগ পুরোনো একটি দল। বিশাল এর ক্যানভাস। আওয়ামী লীগের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে অবধারিতভাবে চলে আসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। একজন ব্যক্তি, একটি রাজনৈতিক দল এবং একটি দেশ যখন এক মোহনায় মিশে যায়, তখন তাদের আলাদা করে দেখা বেশ কঠিন। নানান চড়াই-উতরাই পেরিয়ে দলটি একসময় হয়ে উঠেছে রাজনীতির মূলধারা এবং ধীরে ধীরে এর নেপথ্য থেকে উঠে এসেছে একটি জনগোষ্ঠীর জেগে ওঠার গল্প। স্মৃতি-বিস্মৃতির ঝাঁপি খুলে গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ ছেঁকে তুলেছেন এই দলের উত্থানপর্ব।



আলোকচিত্র : খালেদ সরকার

মহিউদ্দিন আহমদ

জন্ম ১৯৫২, ঢাকায়। পড়াশোনা গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে। ১৯৭০ সালের ডাকসু নির্বাচনে মুহসীন হল ছাত্র সংসদের সহসাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বিএলএফের সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। দৈনিক *গণকণ্ঠ*-এ কাজ করেছেন প্রতিবেদক ও সহকারী সম্পাদক হিসেবে। দক্ষিণ কোরিয়ার সুংকোংহে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মাস্টার্স ইন এনজিও স্টাডিজ' কোর্সের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও অধ্যাপক। তাঁর লেখা ও সম্পাদনায় দেশ ও বিদেশ থেকে বেরিয়েছে বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা অনেক বই। প্রথমা প্রকাশন থেকে বেরিয়েছে *জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি*, *বিএনপি : সময়-অসময়*। *প্রথম আলোয়* কলাম লেখেন।

প্রচ্ছদ : **মাসুক হেলাল**

আওয়ামী লীগ : উত্থানপর্ব
১৯৪৮-১৯৭০



আওয়ামী লীগ

উত্থানপর্ব ১৯৪৮-১৯৭০

মহিউদ্দিন আহমদ



প্রথমা
প্রকাশন



আওয়ামী লীগ : উত্থানপর্ব ১৯৪৮-১৯৭০
গ্রন্থস্বত্ব : ২০১৬ মহিউদ্দিন আহমদ
প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪২৩, ডিসেম্বর ২০১৬
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মাসুক হেলাল
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৪৮০ টাকা

Awami League: Utthanporbo 1948-1970
by Mohiuddin Ahmad
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 88-02-8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 480 only

ISBN 978 984 91766 6 4

উ ৎ স র্গ

সাকিনা খাতুন, আমার মা

সূচিপত্র

পরিশিষ্ট

ভূমিকা

লেখক-অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনের *হিন্দুধর্ম* বই থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করা যাক। তাঁর জবানিতেই লিখছি, 'পূর্ব বাংলার একটি গ্রামে নদীর তীরে বসে থাকা এক বাউলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁকে শুধিয়েছিলাম, পরের প্রজন্মের জন্য আপনার নিজের জীবনের কথা কিছু লিখে রেখে যান না কেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আমরা সহজপন্থী, তাই পেছনে কোনো চিহ্ন রেখে যেতে চাই না।" নদীর স্রোতে তখন ভাটা পড়েছে, জল ছিল সামান্যই। শুধু কজন মাল্লাকে দেখা যাচ্ছিল কাদার ওপর তাঁদের নৌকোগুলো ঠেলা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলছিল লম্বা আঁচড়ের দাগ কেটে কেটে। বাউল বললেন, "ভরা নদীতে যে নৌকা চলে, সে কি কোনো দাগ রেখে যায়? যারা শুধু খুদে প্রয়োজনে কাদার ওপর নৌকা নিয়ে টানাটানি করে, তারাই লম্বা আঁচড় রেখে যায় পেছনে। এটা সহজ পথ নয়। ভক্তদের জীবনের মধ্য দিয়ে যে ভক্তিরসের স্রোত বয়ে চলেছে, তাতে নিজের ভক্তিরসের ধারাকে মিশিয়ে দিয়ে ভেসে চলাই আসল কাজ।"' ক্ষিতিমোহন সেন একটা উপসংহার টানলেন, ইতিহাস রক্ষায় বাউলদের অনীহা বা অনাগ্রহ মজ্জাগত।

যাঁরা সৃষ্টির আনন্দে কীর্তি গড়েন, তাঁদের ইতিহাস লেখার সময় কই, প্রয়োজনই-বা কী। একদল মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করবেন, অন্যরা তা লিখবেন। এটা স্বাভাবিক এবং এটাই হয়ে আসছে। কিন্তু অন্যরা যখন ইতিহাস লেখেন, তখন তার মধ্যে নানা রকমের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ঢুকে যায়। চাল কিংবা আটার সঙ্গে কাঁকর মিশিয়ে ওজন বাড়ানো যায়, তাতে খাবারের স্বাদ যায় নষ্ট হয়ে। ইতিহাসের ব্যাপারটাও ওই রকম, আসল জিনিসটা ছেঁকে তুলতে হয়।

ইতিহাসের মৌল উপাদান হলো মানুষ এবং তার চারপাশের ঘটনাপ্রবাহ। মানুষের মনের কারবার ইতিহাসবিদ করেন কি? মনের বিচারে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একই কাজ একজনের চোখে 'বিপ্লব', আরেকজনের চোখে 'ষড়যন্ত্র'। এখানে লেখকের পক্ষপাত চলে আসতে পারে, অর্থাৎ তিনি বিষয়টা কীভাবে দেখবেন।

লেখার সময় আমরা অনেকেই সীমানা অতিক্রম করি, ঘটনাপ্রবাহ সাজাই নিজের খেয়াল-খুশিমতো। আর একই সঙ্গে হয়ে যাই বিচারক, অকারণে রায় দিয়ে বসি। নিজের ধারণাপ্রসূত মন্তব্য পাঠককে গেলাতে যাই। তখন নিরপেক্ষতার চাদরটা আর গায়ে থাকে না। অথচ ইতিহাস যদি নির্মোহ না হয়, তা বেশি দিন টেকে না; চোখরাঙানি দিয়েও টেকানো যায় না, আইন করেও নয়।

একটা রাজনৈতিক দল নিয়ে লিখতে গেলে লেখককে অনেক কিছু নিয়ে ভাবতে হয়। আমাদের দেশের মেঠো রাজনীতিতে খেলোয়াড় অনেক। সবাই জয়ের জন্য মরিয়া। সবাই দাবি করেন, আমিই সেরা। নেতারা দলের অন্যদের কাছে সত্য জানতে চান না, সব সময় আনুগত্য খোঁজেন। অন্যরাও দলে নিজের জায়গাটা মজবুত করার জন্য সব সময় নেতার বন্দনা করেন। তাই দলের কেউ যদি দল সম্পর্কে লেখেন, সেটা হয়ে যায় নেতৃবন্দনার পুঁথি। একটু এদিক-সেদিক হলেই বৃত্ত থেকে ছিটকে পড়ার ভয়। আমাদের মধ্যে অনেক বর্ণচোরা আছেন, যাঁরা সরাসরি দল করেন না। কিন্তু গাছেরও খান, তলারটাও কুড়োন। তাঁরা ইতিহাসচর্চার নামে তৈরি করেন কেচ্ছা বা মিথ। ফলে আমরা বিভ্রান্ত হই, আসল সত্যটা জানতে পারি না।

বেশ কিছুদিন ধরে রাজনৈতিক দলগুলোর আদি-অন্ত ঘাঁটাঘাঁটি করছি। এবার আমার বিষয় 'আওয়ামী লীগ'। এই দলটিকে নানাভাবে দেখা যায়। চেষ্টা করেছি এর সুলুকসন্ধান করতে। আমি হাত দিয়েছি অনেক বড় একটা ক্যানভাসে। কাজটা খুবই কঠিন।

গরু একটি গৃহপালিত তৃণভোজী প্রাণী। তার চারটি পা, দুটি শিং ও একটি লেজ আছে। এই লেজ দিয়ে সে মশা-মাছি তাড়ায়। এ রকম একটা রচনা লেখার ইচ্ছা আমার নেই। আমি লিখতে চাই একটা মহাসড়কের ইতিবৃত্ত। এই সড়কের সবটুকু মসৃণ নয়। অনেক খানাখন্দ আছে, আছে চড়াই-উতরাই। শুধু লেখার জন্য লেখা নয়। আমার সঙ্গে পাঠকও হাঁটবেন ওই পথ ধরে। আমি পাঠককে মনগড়া কেচ্ছা গেলাতে চাই না। আমি চাই, আমরা একসঙ্গে ইতিহাসের মধ্যে প্রবিষ্ট হব।

জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী লীগের প্রাণভোমরা ছিলেন দলের তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। দলের জন্মের ক্ষণটিতে তিনি উপস্থিত ছিলেন না, কারাগারে বন্দী ছিলেন। ধারণা করা হয়, তাঁকে দলের নির্বাহী কমিটিতে জায়গা করে দিতেই যুগ্ম সম্পাদক পদটি তৈরি হয়েছিল। আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় কাউন্সিল সভা হয় ১৯৫৩ সালে। ওই কাউন্সিলে শেখ মুজিব পুরোপুরি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান। সঙ্গে সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক পদটি লোপ পায়। এরপর শেখ মুজিব আর পেছন ফিরে তাকাননি। একসময় তিনি হয়ে ওঠেন 'বঙ্গবন্ধু'।

আওয়ামী লীগের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে অবধারিতভাবে চলে আসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। একজন ব্যক্তি, একটা রাজনৈতিক দল ও একটা দেশ যখন এক মোহনায় মিশে যায়, তখন তাদের আলাদা করে দেখা বা বোঝা কঠিন একটা কাজ। এ কাজই করতে হচ্ছে আমাকে। এ জন্যই আওয়ামী লীগ আর শেখ মুজিব সমার্থক হয়ে উঠেছে বারবার এবং ধীরে ধীরে নেপথ্য থেকে উঠে এসেছে একটা জাতিরাষ্ট্রের জন্মকথা।

আমার কাজ অনেকটা রাঁধুনির মতো। বিভিন্ন সূত্র থেকে চাল-ডাল-তেল-মসলা জোগাড় করে তবেই তো রান্না। এ জন্য আমাকে খোঁজখবর করতে হয়েছে অনেক। আওয়ামী লীগ যেহেতু একটা পুরোনো দল, এর তথ্যের ঝাঁপিটিও অনেক বড়। তবে তা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে নানা জায়গায়। অনেক তথ্য হারিয়েও গেছে।

লিখতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকে সমর্থন ও সাহায্য পেয়েছি। যাঁদের প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে, তাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। আমি তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁদের নামের একটা তালিকা বইয়ের শেষে দেওয়া আছে। এ বইয়ে ব্যবহৃত ছবিগুলো বিভিন্ন পত্রিকা, ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও ইন্টারনেট থেকে নেওয়া।

কাজটি করতে গিয়ে অনেক কিছু জেনেছি, শিখেছি। আমার যেটুকু জানা, তা অন্যদের সঙ্গে বিনিময় করতে চাই। একটা মাত্র বই দিয়ে একটা রাজনৈতিক দল বা একটা সময়কে তুলে ধরা অসম্ভব। এ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে, আরও হবে। আমি আমার শ্রম ও বিবেচনা দিয়ে এ কাজে অংশ নিয়েছি মাত্র।

লেখায় ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। শুদ্ধতার কোনো সীমা নেই। শুভাকাঙ্ক্ষী পাঠক ভুল ধরিয়ে দিয়ে লেখাটি যদ্দুর সম্ভব ত্রুটিমুক্ত রাখতে সাহায্য করবেন বলে আশা করছি।

মহিউদ্দিন আহমদ
mohi2005@gmail.com

দেশভাগ

বাংলা-ভারত উপমহাদেশে মুসলমান ও হিন্দু এ দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ হাজার বছর ধরে পাশাপাশি বাস করছে। এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় একটি বিরাট সময় ধরে শাসকগোষ্ঠী ছিল মুসলমান। দুই সম্প্রদায়ের মানুষের সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন ছিল। এগারো শতকের মধ্য এশিয়ার বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ আল বিরুনির চোখে বিষয়টি ধরা পড়েছিল। একজন মুসলমান হিসেবে হিন্দুদের সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

> ধর্মের দিক থেকে তারা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, আমরা যা বিশ্বাস করি তারা তা করে না এবং তাদের যা তা আমরা মানি না। তারা আমাদের পোশাক, জীবনযাত্রা এবং নিয়মকানুন সম্পর্কে তাদের সন্তানদের বাজে ধারণা দেওয়া থেকে শুরু করে যা কিছু ভালো এবং সংগত, তা থেকে আমাদের অন্যভাবে চেনায়। সব বিদেশির বিরুদ্ধেই তাদের সংকীর্ণতা, তারা বলে ম্লেচ্ছ অর্থাৎ অপবিত্র। আন্তসম্প্রদায় বিয়ে এবং একসঙ্গে বসা, খানাপিনা করাসহ সব ধরনের যোগাযোগ নিষিদ্ধ। তারা আমাদের ছোঁয়া অপবিত্র মনে করে, তা আগুন হোক কিংবা পানি। যে তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত নয়, তাকে তারা গ্রহণ করে না, এমনকি তাদের ধর্মের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও। ফলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা প্রায় অসম্ভব এবং এটাই তাদের সঙ্গে আমাদের বিশাল পার্থক্য তৈরি করে দিয়েছে।[১]

মুসলমান ও হিন্দু এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবধান যতই দুস্তর হোক না কেন, যখন-তখন তাদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি হতো না। বিশেষ করে গ্রামের জনজীবন ছিল শান্ত, নিরুপদ্রব। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা 'ম্লেচ্ছদের' চালচলন যতই এড়িয়ে চলুক না কেন, মুসলমানদের সঙ্গে সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের একটি রীতি গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগের সাহিত্যে এর ছাপ দেখা যায়। তাদের মধ্যে আত্মীয়-সম্বোধনের চল ছিল। একবার শ্রীচৈতন্য তাঁর ভক্তদের নিয়ে নদীয়ায় কাজীর বাড়ি আক্রমণ করলে কাজী চৈতন্যের নানা নীলাম্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর সখ্যের কথা বলে চৈতন্যের মেজাজ ঠান্ডা করতে চেয়েছিলেন। কাজীর বয়ান উঠে এসেছে *চৈতন্য-চরিতামৃত* কাব্যে :

গ্রাম সম্পর্কে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা,
দেহ-সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম-সম্পর্ক সাঁচা।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা,
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।[২]

আল বিরুনি যখন এ দেশে এসেছিলেন, তখন এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রচার কেবল শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছিল। কিন্তু তা সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সামাজিক বুনন মজবুত করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বিশ শতকে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনগুলোতে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালে এ দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর জন্য ছিল 'পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা'। অর্থাৎ মুসলমানরা মুসলমান প্রার্থীদের এবং হিন্দুরা হিন্দু প্রার্থীদের ভোট দেবে। অখণ্ড বাংলায় আইনসভার ২৫০টি আসনের মধ্যে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ছিল ১২২টি এবং বর্ণহিন্দুদের জন্য ৬০টি আসন। অন্যান্যের মধ্যে তফসিলি হিন্দুদের জন্য ৩৫টি, ইউরোপীয়দের জন্য ২৫টি এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের জন্য ৪১টি আসন। মুসলমান আসনগুলোতে মুসলিম লীগের ৩৮ জন এবং কৃষক-প্রজা পার্টির ৪৩ জন প্রার্থী জিতেছিলেন।[৩] সারা ভারতে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ৪৮২টি প্রাদেশিক আইনসভার আসনের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থীরা মাত্র ২৬টিতে জিতেছিলেন।[৪] কংগ্রেসকে হিন্দুদের দল হিসেবেই দেখা হতো।

মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে হিন্দু মধ্যবিত্ত মানস কিছুটা বোঝা যায় জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়। ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেছিলেন :

> হিন্দুস্তান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে—এ দেশে চিত্ত তাহার নাই।...জগতে অনেক বস্তু আছে যাহাকে ত্যাগ করিয়াই তবে পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান মিলনও সেই জাতীয় বস্তু।...[৫]

১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এর উদ্যোক্তা এবং প্রথম সভাপতি ছিলেন ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ তৈরি হয় ১৯০৭ সালে কলকাতায়। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি ছিলেন নবাব সলিমুল্লাহ। বিচারপতি জাহিদ হোসেন ও নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক।[৬] কৃষক-প্রজা পার্টি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯১৪ সালে, বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়ায় অনুষ্ঠিত একটি প্রজা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর হাশিম আলী খান। ১৯২৯ সালে কলকাতার কয়েকজন মুসলমান নেতা নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি গঠন করেন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে স্যার আবদুর রহিম ও মাওলানা আকরাম খাঁ। ১৯৩৫ সালে

ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রজা সমিতির সভাপতি হন আবুল কাসেম ফজলুল হক। ১৯৩৬ সালের এপ্রিলে আবুল কাসেম ফজলুল হকের সভাপতিত্বে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সমিতির নাম কৃষক-প্রজা পার্টি রাখা হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে দলটি একটি ১৪ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে।[৭]

মুসলমান ছাত্ররাও এ সময় সংগঠিত হতে থাকেন। ১৯৩৩ সালে খুলনার এস এম মজিদের নেতৃত্বে কলকাতায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র সমিতি তৈরি হয়। বামপন্থীরা ১৯৩৫ সালে গঠন করেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রলীগ। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বরে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ কলকাতায় এসে ছাত্র সমিতির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ফজলুল হকও এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় ছাত্র সমিতির নাম বদলে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ বা অল বেঙ্গল মুসলিম স্টুডেন্টস লীগ রাখা হয়। এম এ এইচ ইস্পাহানির বাড়িতে অনুষ্ঠিত এ সভায় ইস্পাহানিকে সভাপতি ও মাহমুদ নূরুল হুদাকে সম্পাদক করে মুসলিম ছাত্রলীগের নতুন কমিটি তৈরি করা হয়। কমিটির অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন আবদুল ওয়াসেক (সহসভাপতি), জিয়াউল ইসলাম (সহসম্পাদক) ও সৈয়দ মাসুদ রুমী (ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র), মহীউদ্দীন আহমদ (নোয়াখালী), আবু সাঈদ চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, কামাল রহিম চৌধুরী, মাওলানা আসাদুজ্জামান ওফেন্দি প্রমুখ (সদস্য)। খাজা নুরুদ্দীনকে পৃষ্ঠপোষক করা হয়। জিন্নাহর পরামর্শে ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় দুই দিনের এক সম্মেলনে অল ইন্ডিয়া মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন গঠন করা হয়। ফেডারেশনের কমিটিতে ছিলেন ৪০ বছর বয়সী রাজাসাহেব মাহমুদাবাদ (সভাপতি), এস এম এ মজিদ (সহসভাপতি), মোহাম্মদ নোমান জুবেরি (সম্পাদক) ও মাহমুদ নূরুল হুদা (সহসম্পাদক)।[৮]

১৯০৫ সালে বঙ্গ প্রদেশকে ভাগ করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশকে নিয়ে নতুন একটি প্রদেশ গঠন করা হয়। নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয় ঢাকাকে। ১৯১১ সালে 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করা হলে বাংলার মুসলমানরা তাঁদের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে চিন্তিত হন। তবে তাঁদের নেতৃত্বে ছিল অভিজাত শ্রেণি। তাঁদের মনমানসিকতা ছিল বর্ণহিন্দুদের মতোই। এই শ্রেণির মানুষেরা মনে করতেন, তাঁরা আরব, মোগল, পাঠান, তুর্কি বা অন্য কোনো বহিরাগত ব্যক্তির বংশধর। তাঁদের সন্তানদের তাঁরা আরবি, ফারসি ও উর্দু শেখাতেন এবং নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন—পাছে তাঁদের 'ধর্মান্তরিত মুসলমান' বা অনার্য বলে কেউ মনে করে। তাঁরা শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান—এদের বংশধর হিসেবে নিজেদের 'শরিফ' বলে প্রচার করতেন এবং চাষি, জেলে, জোলা প্রভৃতি শ্রেণির লোকদের 'আতরাফ' বা নিচু জাতের মানুষ মনে করতেন।[৯]

বাংলার মুসলমান নেতাদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিলেন এ কে ফজলুল হক। গরিব প্রজাদের প্রতি দরদ, বাঙালি জাতীয়তাবোধ ও মুসলিম স্বাতন্ত্র্য—এই তিনের সমাহার ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। ১৯৩৭ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে তিনি উপস্থিত জনতার কাছ থেকে 'শেরে বাঙাল' খেতাব পেয়েছিলেন।[১০] পরে তিনি 'শেরেবাংলা' নামে পরিচিতি পান।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের সমন্বয়ে বাংলায় জোট সরকার তৈরি হয়। বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন এ কে ফজলুল হক। প্রাদেশিক সরকারের প্রধানকে 'মুখ্যমন্ত্রী' বলা হলেও তখন বাংলার 'মুখ্যমন্ত্রী'কে 'প্রধানমন্ত্রী' বলা হতো। বাংলার আরেক নেতা মুসলিম লীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার সদস্য হন। ফজলুল হক ১৯৩৯ সালের অক্টোবরে মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান সোহরাওয়ার্দী।[১১]

১৯৪০ সালের ২২ মার্চ ফজলুল হকের নেতৃত্বে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একটি প্রতিনিধিদল নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে যোগ দিতে লাহোরে যায়। মুসলিম লীগের ২৭তম বার্ষিক সম্মেলন লাহোরে শুরু হয় ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ বিকেল তিনটায়। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি মামদোতের নবাবের উদ্বোধনী ভাষণের পর মুসলিম লীগের সভাপতি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ লম্বা বক্তৃতা দেন। পরদিন ২৩ মার্চ বিকেল তিনটায় অধিবেশন আবার শুরু হলে বাংলার প্রধানমন্ত্রী আবুল কাসেম ফজলুল হক 'লাহোর প্রস্তাব' পাঠ করেন ও ভাষণ দেন। চৌধুরী খালিকুজ্জামান প্রস্তাব সমর্থন করে বক্তব্য দেন। অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য দেন জাফর আলী খান, সরদার আওরঙ্গজেব খান ও আবদুল্লাহ হারুন। এরপর অধিবেশন মুলতবি হয়ে যায়। ২৪ মার্চ বেলা সোয়া এগারোটায় অধিবেশন আবার শুরু হলে লাহোর প্রস্তাবের ওপর বক্তব্য দেন যুক্তপ্রদেশের নবাব মোহাম্মদ ইসমাইল খান, বেলুচিস্তানের কাজী মোহাম্মদ ঈসা, মাদ্রাজের আবদুল হামিদ খান, বোম্বের ইসমাইল ইব্রাহিম চুন্দ্রিগড়, মধ্যপ্রদেশের সাইয়িদ আবদুর রউফ শাহ এবং পাঞ্জাবের ডা. মোহাম্মদ আলম। অধিবেশন আবারও মুলতবি করা হয়। রাত নয়টায় সভা আবার শুরু হলে সাইয়িদ জাকির আলী ও বেগম মোহাম্মদ আলী লাহোর প্রস্তাবের ওপর কথা বলেন। এরপর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। সবশেষে পরের বছরের জন্য কার্যকরী কমিটি নির্বাচন করে রাত সাড়ে এগারোটায় সম্মেলনের ইতি টানা হয়।[১২] লাহোর প্রস্তাবের চূড়ান্ত খসড়াটি তৈরি করেছিলেন স্যার জাফরুল্লাহ খান (পরে পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক)।[১৩]

কামরুদ্দিন আহ্মদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, লাহোর প্রস্তাবের প্রাথমিক খসড়াটি তৈরি করেছিলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী স্যার সিকান্দার হায়াত খান। কিন্তু সাবজেক্ট কমিটির সভায় তা পুরোপুরি বদলে ফেলা হয়েছিল। প্রস্তাবের কোথাও 'পাকিস্তান' শব্দটির উল্লেখ ছিল না। লাহোর সম্মেলনে প্রস্তাবটি পাঠ করে এ কে ফজলুল হক আবেগতাড়িত হয়ে একটা ভাষণ দেন। ভাষণের একপর্যায়ে তিনি বলেন, 'যদিও আমি বাংলায় একটা কোয়ালিশন সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছি, বলতে দ্বিধা নেই আমি প্রথমে একজন মুসলমান এবং তারপর বাঙালি। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলোর মুসলমানদের ওপর যদি আঘাত করা হয়, আমি বাংলার হিন্দুদের ওপর প্রতিশোধ নেব। ১৯০৬ সালে বাংলায় মুসলিম লীগের পতাকা ওড়ানো হয়েছিল এবং মুসলিম লীগের এই মঞ্চ থেকে বাংলার নেতা হিসেবে আমি মুসলমানদের আবাসভূমির জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করছি।'[১৪] লাহোর প্রস্তাব ২৪ মার্চ পাস হলেও প্রস্তাব উত্থাপনের দিনটি, অর্থাৎ ২৩ মার্চ 'পাকিস্তান দিবস' হিসেবে পরবর্তী সময়ে পালন করা একটা রেওয়াজে পরিণত হয়। 'লাহোর প্রস্তাবে' ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অংশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে 'স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ' প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়।[১৫]

লাহোর প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে প্রচার করা হয়। ছয় বছরের মধ্যেই লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে স্বীকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ধারণাটি ভেস্তে যায়। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে হিন্দু-মুসলমান বিভাজন আরও স্পষ্ট হয়। মুসলমানপ্রধান কোনো এলাকায় কোনো কংগ্রেস প্রার্থী এবং হিন্দুপ্রধান কোনো এলাকায় মুসলিম লীগের কোনো প্রার্থী জিততে পারলেন না। অখণ্ড বাংলায় ২৫০টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ জিতল ১১৩টি আসনে, কংগ্রেস জয়ী হলো ৮৬টি আসনে। বাকি ৫১টি আসনে জিতলেন অন্যান্য দলের প্রার্থীরা।[১৬]

ভারতের ১১টি প্রদেশে ৪৯৪টি মুসলমান আসনের ৪৩০টিতে মুসলিম লীগের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছিলেন, যা কিনা সব মুসলমান আসনের শতকরা ৮৭ ভাগ। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় মুসলিম লীগ জিতেছিল মুসলমানদের শতভাগ আসনে।[১৭]

ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ সরকারের তিন সদস্যের 'ক্যাবিনেট মিশন' এল। এই মিশনের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ দিল্লিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আইনসভায় মুসলিম লীগ থেকে নির্বাচিত সদস্যদের একটা সম্মেলন ডাকলেন। সম্মেলন শুরু হয় ১৯৪৬ সালের ৭ এপ্রিল। একটি প্রস্তাবের খসড়া তৈরির জন্য কমিটি করা হয়। বাংলার নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৯ এপ্রিল মুসলিম লীগ থেকে নির্বাচিত একমাত্র প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জিন্নাহর নির্দেশে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। এ সময় সোহরাওয়ার্দী এক জ্বালাময়ী ভাষণে বলেন :

> এই বিরাট ভারতবর্ষে ১০ কোটি মুসলমান এমন একটি ধর্মমতে বিশ্বাসী, যা নিয়ন্ত্রণ করছে তাঁদের শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন।...আমি এখন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে চাই, পাকিস্তান অর্জনে বাংলার প্রতিটি মুসলমান জীবন উৎসর্গ করার জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। জনাব জিন্নাহ, আপনাকে আমি আহ্বান করছি, আসুন, আমাদের পরীক্ষা করে দেখুন।[১৮]

প্রস্তাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা-আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান—যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ—ইত্যাদি অঞ্চল নিয়ে 'পাকিস্তান অঞ্চল' নামে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানানো হয়।[১৯]

দিল্লি সম্মেলনের প্রস্তাবটি ছিল লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, মাঝখানে এক বিরাট শত্রুভাবাপন্ন দেশের অবস্থানের কারণে পাকিস্তানের উভয় অংশ বিচ্ছিন্ন থাকবে এবং এই রাষ্ট্রকে রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হবে। বিতর্কের সময় জিন্নাহ মন্তব্য করেন, লাহোর প্রস্তাবে state শব্দটির শেষে 's' অক্ষরটি এসেছিল ছাপার ভুলের কারণে। এ সময় লিয়াকত আলী খান কার্যবিবরণীর আসল খাতা নিয়ে এলেন। দেখা গেল, ভুল জিন্নাহ সাহেবেরই। আবুল হাশি[illegible] জিন্নাহ এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে প্রস্তাবটি এমনভাবে লেখা হবে, যাতে লাহোর প্রস্তাবকে ক্ষুণ্ন না করেও ভারতের মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা গণপরিষদ দাবি করা সম্ভব হবে।[২০]

১২ মে (১৯৪৬) জিন্নাহর একটি প্রস্তাব মুসলিম লীগ অনুমোদন করে। এ প্রস্তাবে বলা হয়, 'পাকিস্তান গ্রুপে' পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, বাংলা ও আসাম—এই ছয়টি প্রদেশ থাকবে; পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ—এই তিনটি বিষয় এই গ্রুপের হাতে থাকবে। 'পাকিস্তান গ্রুপ' ও এর আওতাধীন প্রদেশগুলোর সংবিধান তৈরির জন্য একটা আলাদা কমিটি থাকবে এবং এ কমিটি 'পাকিস্তান' ও তার প্রদেশগুলোর মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার বিন্যাস ঠিক করবে। সংবিধান তৈরি হয়ে গেলে প্রদেশগুলো নিজেরাই এই গ্রুপে (পাকিস্তান) থাকা বা না থাকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন যাতে ঠিকমতো হয়, সে জন্য এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে গণভোটের মাধ্যমে। এ প্রস্তাব যখন পাস হয়, মুসলিম লীগ তখন পর্যন্ত পাকিস্তান ও ভারতকে নিয়ে একটি কনফেডারেশনের ধারণা লালন করছিল এবং প্রদেশগুলো কেন্দ্রের (পাকিস্তান গ্রুপের) সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে এ রকম চিন্তা মোটেও ছিল না।[২১]

১৯৪৬ সালের ১৬ মে ক্যাবিনেট মিশন তার পরিকল্পনা প্রকাশ করে। পরিকল্পনাটি ছিল এ রকম :

১) ব্রিটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি ভারতীয় ইউনিয়ন বা যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবে। ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে থাকবে বৈদেশিক, দেশরক্ষা ও যোগাযোগ। ইউনিয়ন সরকারের কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আদায়ের ক্ষমতাও তাকে দেওয়া হবে। অন্য সব বিষয় থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

২) কোনো প্রধান সাম্প্রদায়িক বিষয়ে আইন তৈরি করতে হলে আইনসভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের এবং প্রধান দুই সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন দরকার।

৩) প্রদেশগুলো তিনটি গ্রুপে ভাগ করা এবং তাদের দলীয় বা গ্রুপ সরকার গঠনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হলো। গ্রুপগুলো হলো : (ক) হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ; (খ) পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তান—যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ; (গ) বাংলা ও আসাম, যেখানে মুসলমানরা অল্পসংখ্যায় বেশি।[২২]

১০ জুলাই (১৯৪৬) বোম্বাইয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরু বললেন, কংগ্রেস গণপরিষদে যোগ দেবে, কিন্তু প্রয়োজন মনে করলে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা সংশোধন করার স্বাধীনতাও তার থাকবে। এ বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১৯ জুলাই (১৯৪৬) এক বিশেষ কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলিম লীগ গণপরিষদে যোগ দিতে অস্বীকার করে।[২৩]

১২ আগস্ট (১৯৪৬) নেহরু ইউনিয়ন সরকার গঠন করেন। মুসলিম লীগ ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের ঘোষণা দেয়। ওই দিন কলকাতায় শুরু হয় নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। হাজার হাজার মানুষ নিহত হন। এমনকি গর্ভবতী নারীদের পেট চিরে অজাত শিশুদের হত্যা করা হয়।[২৪] এর আগে মুসলিম লীগের নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটে এক সভায় ঘোষণা করেছিলেন, 'আমাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে।' হিন্দুরা সন্ত্রস্ত এবং শেষ পর্যন্ত 'এগ্রেসিভ' হয়ে উঠল। '১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলিকাতায় কেয়ামত নামিয়া আসিল।'[২৫]

ভারত ভাগ করে পাকিস্তান তৈরির দাবিকে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নেতা গান্ধী শুধু অযৌক্তিকই মনে করেননি, তিনি এ দাবিকে ব্লাসফেমি হিসেবে মনে করেছিলেন। ১৯৪৬ সালের ৬ অক্টোবর *হরিজন* পত্রিকায় এক মন্তব্যে তিনি বলেন :

> মুসলিম লীগের দাবি ইসলামবিরোধী এবং আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এটা পাপ। ইসলাম মানুষের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃত্বের কথা বলে, মানব পরিবারের সংহতি নষ্ট করার কথা বলে না। সুতরাং যারা ভারত ভাগ করতে চায়, তারা

ভারত ও ইসলাম উভয়েরই শত্রু। তারা আমাকে কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলতে পারে, তবুও তারা আমাকে এমন কিছু মেনে নিতে বলতে পারে না, যা আমি ভুল মনে করি।[২৬]

১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করল, তারা ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারত ছেড়ে যাবে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের শাসক (ভাইসরয়) হয়ে এলেন। ২ জুন (১৯৪৭) তিনি বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। ৩ জুন পরিকল্পনাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হলো। ৯ জুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভায় জিন্নাহ মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার পক্ষে মত দেন। এ পরিকল্পনায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ করার প্রস্তাব ছিল। আবুল হাশিম এক বিবৃতিতে বললেন, 'মাথাছাঁটা পাকিস্তান' গ্রহণ করা উচিত হবে না। কাউন্সিল সভায় এক আবেগ জড়ানো ভাষণে জিন্নাহ প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'আপনারা কি আমার জীবদ্দশায় পাকিস্তান চান?' প্রায় সবাই হ্যাঁ-সূচক জবাব দেন। একটু বিরতি দিয়ে জিন্নাহ বললেন, 'বন্ধুগণ, তাহলে আপনাদের গ্রহণ করতে হবে এই মাথাছাঁটা কীটদষ্ট পাকিস্তানকে।'[২৭]

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুসলিম লীগের নেতা আবুল হাশিম এবং কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসু সার্বভৌম অখণ্ড বাংলার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের তৈরি করা খসড়া পরিকল্পনায় বাংলা ভাষাভাষী বৃহত্তর বঙ্গদেশ গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় বিহার প্রদেশের বাংলা ভাষাভাষী পূর্ণিয়া জেলা ও বাংলার বর্ধমান বিভাগের জেলাগুলো নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ; প্রেসিডেন্সি, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং আসামের সিলেট জেলা নিয়ে মধ্যপ্রদেশ এবং সিলেট জেলা বাদে আসাম প্রদেশের জেলাগুলো নিয়ে পূর্ববঙ্গ প্রদেশ গঠন করার প্রস্তাব ছিল। এই তিনটি প্রদেশ নিয়ে তৈরি হবে বৃহত্তর বঙ্গদেশ রাষ্ট্র।[২৮] সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনা, যা গান্ধীর কাছে শরৎ বসু এবং জিন্নাহর কাছে সোহরাওয়ার্দী পাঠিয়েছিলেন—তা ছিল :

১) বাংলায় সাবেক মুসলিম লীগ সরকার বহাল থাকবে, তবে হিন্দু মন্ত্রীদের জায়গায় বাংলায় কংগ্রেস মনোনীত ব্যক্তিদের অবিলম্বে নিয়োগ দিতে হবে।

২) বঙ্গদেশ পাকিস্তান বা হিন্দুস্তান কারও সঙ্গে যোগ না দিয়ে অখণ্ড ও স্বাধীন থেকে যাবে। বঙ্গদেশ পাকিস্তান বা হিন্দুস্তানের সঙ্গে যোগ দেবে না স্বাধীন থাকবে, সর্বজনীন ভোটের মাধ্যমে যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত বাংলাদেশের গণপরিষদ তা নির্ধারণ করবে।

৩) জনসংখ্যার অনুপাতে আইনসভায় মুসলমান, হিন্দু, তফসিলি এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আসন নির্দিষ্ট হবে।[২৯]

কয়েক দিন পর কলকাতায় সোহ্‌রাওয়ার্দীর বাসায় মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের এক সভায় মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে খাজা নাজিমুদ্দিন, সোহ্‌রাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শরৎ বসু ও কিরণশংকর রায়কে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করা হয়। ১২ মে (১৯৪৭) আবুল হাশিম ও শরৎ বসু গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সার্বভৌম বাংলার বিষয়ে জানান এবং তাঁর আশীর্বাদ লাভ করেন। ২০ মে লীগ-কংগ্রেসের যৌথ কমিটির সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে এক সাময়িক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দেন। ২৩ মে শরৎ বসু গান্ধীর কাছে এক চিঠিতে এই চুক্তির কথা উল্লেখ করে তাঁর (গান্ধীর) নির্দেশনা চান। ৮ জুলাই এই চিঠির উত্তরে গান্ধী লেখেন :

> আমি তোমার মুসাবিদা পাঠ করেছি। আমি পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে মোটামুটি পণ্ডিত নেহরু ও সরদার প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করেছি। উভয়েই প্রস্তাবটির ঘোরবিরোধী এবং ওটা হিন্দু ও তফসিলি সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে একটি বিরোধ বাধানোর কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়—এই হচ্ছে তাঁদের অভিমত। এটা শুধু তাঁদের সন্দেহ নয়, বরং দৃঢ় বিশ্বাস।...বঙ্গদেশের অখণ্ডতার জন্য সংগ্রামে বিরত থাকা তোমার পক্ষে সমীচীন হবে, বঙ্গদেশ বিভক্তির জন্য যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তাকে বন্ধ না করাই ভালো।[৩০]

ভারতের মুসলমানরা কোনো রকম পরিকল্পনা করে কিংবা ফন্দি এঁটে দেশ ভাগ করতে চাননি। এটা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ব্যাপারে ভীতি থেকে উৎসারিত প্রতিক্রিয়া। ইংরেজ আমলে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে শ্রেণি ছিল দুটি, অভিজাত জমিদার আর সাধারণ চাষি, জোলা ও জেলে। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডে সরকারি চাকরিতে কোটা সিস্টেম মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। 'বাঙালি হিন্দুরা যদি এটা খুশিমনে মেনে নিত ও বন্ধুতার জন্য ডান হাত বাড়িয়ে দিত, তাহলে বাঙালি মুসলমানরাও হয়তো দেশভাগের কথা মুখে আনত না। ওরা দেশভাগের কথা মুখে না আনলে এরাও হয়তো প্রদেশভাগের কথা মুখে আনত না।'[৩১] মুসলমানরা নিজেদের বঞ্চিত মনে করতেন এবং এ জন্য তাঁরা দায়ী করতেন হিন্দুদের। বিষয়টা যে একেবারে অমূলক ছিল না, এটা উঠে এসেছে অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখায় :

> সিউড়িতে আগে কলেজ ছিল না। যুদ্ধকালে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপকরা কলকাতা থেকে এসে শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। একদিন আমার আদালতে একজন মুসলমান কর্মচারী আমাকে বলেন যে, তার ছেলেটিকে কলেজে পড়াতে চান, কিন্তু মুসলমান বলেই ওকে ভর্তি করা হচ্ছে না। সে কী কথা! আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পাই যে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজেও মুসলমান ছাত্রদের ভর্তি করা হয় না। সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমল থেকেই কলেজের নিয়মাবলীতে ধর্ম

নিয়ে বাছবিচার আছে।...হিন্দু কলেজেও ছাত্রদের বেলা বাছবিচার করা হতো। সেই কারণেই প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় ও তাতে খ্রিস্টান মুসলমান অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদেরও ভর্তি হতে দেওয়া হয়। মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ থাকলে তারা হিন্দুদের চেয়ে পিছিয়ে থাকত না। পিছিয়ে না থাকলে বিশেষ সুবিধা দাবি করত না। এতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমদর্শিতার অভাব সূচিত হয়।[৩২]

১৯৪৭ সালের ৩ জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করলেন, ব্রিটিশ সরকার দেশ বিভাগের নীতি মেনে নিয়েছে এবং ১৪ আগস্ট তারা ভারতের শাসনভার ছেড়ে দেবে। বাংলার আইনসভার সদস্যরা অধিবেশনে বসে আলোচনা করলেন—তাঁরা ভারতে যোগ দেবেন, না পাকিস্তানে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য ছিলেন মুসলমান। তাঁরা পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার পক্ষে মত দেন। ২০ জুন (১৯৪৭) স্পিকার নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর আইনসভার সদস্যরা আলাদা বৈঠক করে ১০৬-৩৫ ভোটে বাংলা অখণ্ড রাখার পক্ষে মত দেন। বর্ধমানের মহারাজা স্যার উদয়চাঁদ মাহতাবের সভাপতিত্বে অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর আইনসভার সদস্যরা অপর একটি সভায় ৫৮-২১ ভোটে বাংলা ভাগ করার পক্ষে মত দেন।[৩৩] অর্থাৎ আইনসভায় সব মুসলমান সদস্য বাংলা অখণ্ড রাখা এবং একজন ছাড়া সব হিন্দু সদস্য বাংলা ভাগ করার পক্ষে দাঁড়ালেন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ভোট দেন। তাঁরা সবাই ছিলেন 'হিন্দু'।[৩৪] ব্যতিক্রম ছিলেন বঙ্গীয় কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা কিরণশংকর রায়। তিনি একমাত্র 'হিন্দু' সদস্য, যিনি বাংলা ভাগ করার বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন।[৩৫] ৬-৭ জুলাই (১৯৪৭) আসাম প্রদেশের সিলেট জেলায় একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ভোটের রায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিলেটবাসী পাকিস্তানের অংশ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।[৩৬]

সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিনের মধ্যে কে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের পার্লামেন্টারি দলের নেতা হবেন, এ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। নাজিমুদ্দিন ৭৫-৩১ ভোটে জিতে যান।[৩৭] সোহরাওয়ার্দী ভোটে হেরে যাওয়ার পরমুহূর্তে বসিরহাটের আবদুর রহমানকে সঙ্গে করে পাশের কামরায় যেখানে পশ্চিমবঙ্গ মুসলিম লীগের সংসদীয় দলের সদস্যরা তাঁদের নেতা নির্বাচন করার জন্য বসেছিলেন, সেখানে ছুটে যান। আবদুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর নাম প্রস্তাব করেন এবং তিনি পশ্চিমবঙ্গ মুসলিম লীগের সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন। 'এটা ছিল দেবতাদের উপভোগ করার মতো এক দৃশ্য। যে ব্যক্তি এক মুহূর্ত আগেও পাকিস্তানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন, তিনি



Dawn



BIRTH OF PAKISTAN AN EVENT IN HISTORY

Lord Mountbatten's Address to Pakistan Constituent Assembly

COLOURFUL SCENES OF SPLENDOUR AT THE SECRETARIAT HALL

VICEROY'S GOOD WISHES FOR THE PROSPERITY OF NEW NATION

TRIBUTES TO QAED-E-AZAM JINNAH

Some Salient Features

DAWN OF FREEDOM IN INDIAN UNION

Hindsembly Members Take Prescribed Oath

NEW CABINET IN INDIA

ভারত ভাগ হলো, *ডন*, করাচি, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা হিসেবে নিজের নাম প্রস্তাব করলেন।'[৩৮]

অমুসলিম অংশের (পশ্চিমবঙ্গ) পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত হন ডা. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ। সোহরাওয়ার্দী ১৩ আগস্ট (১৯৪৭) পর্যন্ত অখণ্ড বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৩ আগস্ট তিনি পূর্ববঙ্গের শাসনভার নাজিমুদ্দিনের হাতে এবং পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের হাতে তুলে দেন।[৩৯]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাংলা ভাগকে অনিবার্য করে তুলেছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে যে মানুষের প্রতিষ্ঠা এবং রাজত্ব কায়েমের চেষ্টা হয়েছিল—সে মানুষ মুসলমান মধ্যবিত্ত। 'এ আন্দোলন তাই এক মানুষের (হিন্দু মধ্যবিত্ত) হাত থেকে অন্য মানুষের (মুসলমান মধ্যবিত্ত) পরিত্রাণ পাওয়ার আন্দোলন। এ জন্যই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হিন্দু মধ্যবিত্তরা দেশ ত্যাগ করল এবং মুসলমান মধ্যবিত্ত অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণি হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণির আওতাবহির্ভূত হয়ে কায়েম করল নিজের রাজত্ব। কিন্তু ইসলামের আওয়াজ তোলা সত্ত্বেও তার মধ্যে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণিনির্বিশেষে মানুষ কোনো স্বীকৃতি পেল না।'[৪০]

বাংলা যখন ভাঙছিল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল তখনো। হিন্দুদের দ্বারা মুসলমান হত্যার প্রতিবাদে গান্ধী কলকাতার দাঙ্গা-উপদ্রুত বেলেঘাটা এলাকায়

এক দরিদ্র মুসলমানের বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং দাঙ্গা না থামা পর্যন্ত আমরণ অনশনের ঘোষণা দেন। তাঁর পাশে রইলেন সোহরাওয়ার্দী।[৪১]

অগুনতি মানুষ সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও দাঙ্গার শিকার হয়েছিলেন। হঠাৎ করেই তাঁরা হয়ে গেলেন 'নিজগৃহে পরবাসী'। প্রায় দেড় কোটি লোক জন্মভূমি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। এভাবেই শুরু হয়েছিল স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ দেশত্যাগের প্রক্রিয়া। *দ্য স্টেটসম্যান*-এর সম্পাদক আয়ান স্মিথ *পাকিস্তান* গ্রন্থে লিখেছেন, ১৬ মাসের গৃহযুদ্ধে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ নিহত হয়েছিলেন। এর সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কমনওয়েলথভুক্ত সব দেশের মোট ৫ লাখ ৪০ হাজার মানুষের মৃত্যুর তুলনা করা যায়।[৪২]

বাঙালি মুসলমান পরিচিত প্রতিবেশী হিন্দুর সঙ্গে এক রাষ্ট্রে বসবাস করবে না, এই লক্ষ্য নিয়ে অপরিচিত দূরবর্তী অঞ্চলের মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পাকিস্তান বানাল। তবে মোহভঙ্গ হতে দেরি হলো না।

ছাত্রলীগের জন্ম

ভারতের মুসলমানের সনাতন মনস্তত্ত্বে 'উম্মাহ' ছিল, কিন্তু ইউরোপীয় ধাঁচের আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা ছিল না। দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে তৈরি হলো পাকিস্তান। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ পাকিস্তান পেয়ে আবেগে ভেসে গেল। কিন্তু ধর্ম-বর্ণ-গোত্রনির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে সম-অংশীদারির ভিত্তিতে একটা জাতি-রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্ন যখন উঠল, তখন দ্বিজাতিতত্ত্বের সঙ্গে এই বাস্তবতার দ্বন্দ্ব সামনে চলে এল। দ্বিজাতিতত্ত্বের লজিকটা তখন আর কাজ করছিল না।

১৯৪০-এর দশকে মুসলিম লীগ যখন প্রবল প্রতাপে বিরাজমান, তখন মূলধারার বাইরে কিছু কিছু রাজনৈতিক উদ্যোগ দেখা যাচ্ছিল। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলিম লীগের বামধারার কর্মীদের উদ্যোগে ঢাকায় 'গণআজাদী লীগ' নামে একটি সংগঠনের জন্ম হয়। এ সংগঠনের আহ্বায়ক মনোনীত হন ঢাকার মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় কর্মী কামরুদ্দিন আহ্মদ। এ সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, তাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখ। তাঁরা মুসলিম লীগের প্রতি আস্থা হারিয়েছিলেন এবং এ দেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিচর্চার চিন্তা করেছিলেন।[১]

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পর কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্র পূর্ব পাকিস্তানে তাঁদের পরবর্তী কাজ কী হবে তা আলোচনার জন্য কলকাতার সিরাজউদ্দৌলা হোটেলে সমবেত হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আতাউর রহমান (রাজশাহী), কাজী মহম্মদ ইদরিস, শহীদুল্লা কায়সার, আখলাকুর রহমান প্রমুখ। তাঁরা পাকিস্তানে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আন্দোলন এবং তার জন্য উপযুক্ত সংগঠন তৈরি করা দরকার বলে একমত হন। ঢাকায় এসে তাঁরা কামরুদ্দিন আহ্মদ, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, শামসুদ্দীন আহমদ, তসদ্দুক আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, নূরুদ্দীন আহমদ, আবদুল ওদুদ, হাজেরা মাহমুদ প্রমুখের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং রাজনৈতিক

কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য একটি সম্মেলন আয়োজনের ব্যাপারে একমত হন। ছাত্র ফেডারেশন নামে একটি অসাম্প্রদায়িক সংগঠন তখনো ছিল। কিন্তু কমিউনিস্টদের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণে মুসলমান ছাত্ররা তাতে যোগ দিতে চাইতেন না। ৬ সেপ্টেম্বর (১৯৪৭) বেলা দুইটায় ঢাকায় খান সাহেব আবুল হাসনাতের বাসায় তসদ্দুক আহমদের সভাপতিত্বে সম্মেলন শুরু হয়। ৭ সেপ্টেম্বর ২৫ জন সদস্য নিয়ে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের পূর্ব পাকিস্তান সাংগঠনিক কমিটি তৈরি হয়।[২]

যুবলীগ শুরুতেই দলাদলির মধ্যে পড়ে। সংগঠনের লক্ষ্য কী হবে, এ নিয়ে সম্মেলনের সাবজেক্ট কমিটির সভাতেই মতভেদ দেখা দেয়। সাবজেক্ট কমিটির অন্যতম সদস্য শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণনায় পাওয়া যায়:

> ...আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে পারলাম, কিছু কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন কর্মীও যোগদান করেছে।...আমি বললাম, এর একমাত্র কর্মসূচি হবে সাম্প্রদায়িক মিলনের চেষ্টা...যাকে ইংরেজিতে বলে 'কমিউনাল হারমনি', তার জন্য চেষ্টা করা। অনেকেই এই মত সমর্থন করল, কিন্তু কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন দলটা বলল, আরও প্রোগ্রাম নেওয়া উচিত, যেমন অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম। আমরা বললাম, তাহলে তো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হয়ে যাবে। অনেক আলোচনার পর ঠিক হলো, একটা সাব-কমিটি করা হবে, তাঁরা কর্মসূচি প্রণয়ন করবেন এবং গণতান্ত্রিক যুবলীগের কার্যনির্বাহী কমিটির কাছে তা পেশ করবেন।...কয়েক দিন পর কার্যকরী কমিটির এক সভায় ড্রাফট কর্মসূচি পেশ করা হলো, যাকে পরিপূর্ণ একটা ম্যানিফেস্টো বলা যেতে পারে। আমি ভীষণভাবে বাধা দিলাম এবং বললাম, কোনো ব্যাপক কর্মসূচি এখন গ্রহণ করা হবে না। একমাত্র 'কমিউনাল হারমনি'র জন্য কর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর কোনো কাজই আমাদের নাই।[৩]

শেখ মুজিবুর রহমান তখনো মুসলিম লীগের কাউন্সিল সদস্য ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগ সদস্যদের একই সঙ্গে অন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠনে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁকে না জানিয়ে কার্যকরী কমিটির এক সভায় কমিটির সদস্যসংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়। ফলে কমিটিতে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সংখ্যা বেড়ে যায়। শেখ মুজিব এক সভায় বললেন, 'মুসলিম লীগের কোনো কর্মী আপনাদের সাথে থাকবে না। যুবলীগও আজ থেকে শেষ। আপনাদের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা আমাদের জানা আছে।' ঢাকার মোগলটুলীতে যুবলীগের অফিস ছিল। শেখ মুজিব এবং তাঁর সমর্থকেরা অফিস থেকে যুবলীগের সাইনবোর্ড নামিয়ে ফেলেন।[৪]

রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল পাকিস্তানের জন্ম হওয়ার আগেই। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন যখন ভারতভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন,

বাংলাভাগের বিষয়টি তখনই চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। জুন মাসের প্রথম দিকেই সংবাদপত্রে খবর বেরোয় যে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে চাইছেন। বেশ কয়েকজন বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবী এর বিরোধিতা করে প্রবন্ধ লেখেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, আবদুল হক, ফররুখ আহমদ, আবুল হাশিম প্রমুখ। উর্দুর বিরোধিতা করে এবং বাংলা ভাষার পক্ষে প্রথম প্রবন্ধটি লিখেছিলেন আবদুল হক। 'বাংলা ভাষাবিষয়ক প্রস্তাব' শিরোনামে তাঁর লেখাটি *দৈনিক ইত্তেহাদ*-এর রবিবাসরীয় বিভাগে ১৯৪৭ সালের ২২ ও ২৯ জুন দুই কিস্তিতে ছাপা হয়েছিল। 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ৩০ জুন দৈনিক *আজাদ*-এ ছাপা হয়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বিবৃতি দিলে জুলাইয়ের (১৯৪৭) শেষ দিকে তার বিরোধিতা করে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দৈনিক *আজাদ*-এ একটি প্রবন্ধ লেখেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে এসব লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং বলা চলে, পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের যে সূচনা হয়েছিল, তার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিলেন বুদ্ধিজীবীরা।[৫]

১ সেপ্টেম্বর (১৯৪৭) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র 'তমদ্দুন মজলিস' নামে নতুন একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫ সেপ্টেম্বর তাঁরা *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু* শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এতে লিখেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষক কাজী মোতাহার হোসেন এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক ইত্তেহাদ*-এর সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক এবং তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক আবুল কাসেম ভাষা বিষয়ে একটি প্রস্তাব লেখেন। প্রস্তাবে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা, আদালত ও অফিসের ভাষা হবে বাংলা এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে বাংলা ও উর্দু।[৬]

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির উত্তাপ ছড়াতে থাকে। মুসলমান ছাত্ররা অনেকেই এত দিন নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। এর সভাপতি শামসুল হুদা চৌধুরী রেডিও পাকিস্তানে চাকরি নেন। সাধারণ সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের মুখমন্ত্রী (অখণ্ড বাংলায় বলা হতো প্রধানমন্ত্রী) খাজা নাজিমুদ্দিনের অনুসারী ছিলেন। কাউন্সিল সভার মাধ্যমে এই সংগঠনের নেতৃত্বে পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা তেমন ছিল না। কলকাতার মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম গ্রুপের অনুসারী তরুণ ও ছাত্ররা নতুন একটি ছাত্রসংগঠন তৈরির কথা ভাবলেন। এই উদ্দেশ্যে

তাঁরা ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের মিলনায়তনে একটি ছাত্র-কর্মী সভা ডাকেন। ঘটনাচক্রে ওই দিন ফেনী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক নাজমুল করিম সেখানে উপস্থিত হলে তাঁকে সভাপতি করে সভার কাজ শুরু হয়। সবাই একমত হয়ে সেদিন 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। রাজশাহী থেকে আসা নইমুদ্দিন আহমদকে আহ্বায়ক করে ১৪ সদস্যের একটি অস্থায়ী সাংগঠনিক কমিটি তৈরি হয়। কমিটির সদস্য হন নইমুদ্দিন আহমদ (রাজশাহী), আবদুর রহমান চৌধুরী (বরিশাল), শেখ মুজিবুর রহমান (ফরিদপুর), অলি আহাদ (কুমিল্লা), আজিজ আহমদ (নোয়াখালী), আবদুল মতিন (পাবনা), দবিরুল ইসলাম (দিনাজপুর), মফিজুর রহমান (রংপুর), শেখ আবদুল আজিজ (খুলনা), নওয়াব আলী (ঢাকা), নূরুল কবির (ঢাকা শহর), আবদুল আজিজ (কুষ্টিয়া), সৈয়দ নূরুল আলম (ময়মনসিংহ) ও আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী (চট্টগ্রাম)। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে জড়িয়ে বিতর্ক তৈরি করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে প্রথম কমিটির অন্যতম সদস্য অলি আহাদের ভাষ্য হলো :

> শেখ মুজিবুর রহমান তখন ঢাকায় ছিলেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সাংগঠনিক কমিটিতে তাঁহার অন্তর্ভুক্তি তিনি সানন্দেই গ্রহণ করিবেন। এবং তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা অনীহা প্রকাশ না করিয়া বরং সংগঠনকে দৃঢ় ও মজবুত করার প্রয়াসে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে অধুনা অনেকেই শেখ মুজিবুর রহমানকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রচার করিতেছেন। ইহা ইতিহাসের বিকৃতি মাত্র।[৭]

ঢাকার ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম গ্রুপের তরুণ কর্মীরা 'মুসলিম লীগ ওয়ার্কার্স ক্যাম্প' করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অফিস করা হলো এখানেই। শেখ মুজিব কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে এখানেই থাকতেন। ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁর ভাষ্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠান গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট সাড়া পাওয়া গেল ছাত্রদের মধ্যে। এক মাসের ভেতর আমি প্রায় সব জেলায়ই কমিটি করতে সক্ষম হলাম। যদিও নইমুদ্দিন কনভেনর ছিল, কিন্তু সবকিছুই আমাকেই করতে হতো।[৮]

নতুন একটি ছাত্র সংগঠন তৈরির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে ১৯৪৮ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে 'পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আবেদন' শিরোনামে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়। অস্থায়ী সাংগঠনিক কমিটির ১৪ সদস্যের নামে প্রকাশিত প্রচারপত্রে ধারণা দেওয়া হয়, ছাত্রসংগঠনে কোনো অছাত্র থাকতে পারবে না এবং ছাত্রসংগঠন দলীয় রাজনীতিতে অংশ নেবে না।[৯]

ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করার সময় মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলি আহাদ 'মুসলিম' শব্দটি সংগঠনের নামের সঙ্গে ব্যবহার করার বিরোধিতা করেছিলেন। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমান 'মুসলিম' শব্দটি রাখার পক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, ওই মুহূর্তে এটা রাখা দরকার। তা না হলে মুসলিম লীগ সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাবে।[১০] এ জন্য কেউ কেউ শেখ মুজিবকে 'সাম্প্রদায়িক' বানানোরও চেষ্টা করেছেন। যদিও শেখ মুজিব এটা কৌশল হিসেবেই নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মত ছিল :

> এখনো সময় আসে নাই। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও দেশের আবহাওয়া চিন্তা করতে হবে। নামে কিছুই যায়-আসে না। আদর্শ যদি ঠিক থাকে, তবে নাম পরিবর্তন করতে বেশি সময় লাগবে না। কয়েক মাস হলো পাকিস্তান পেয়েছি। যে আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান পেয়েছি, সেই মানসিক অবস্থা থেকে জনগণ ও শিক্ষিত সমাজের মত পরিবর্তন করতে সময় লাগবে।[১১]

ইতিমধ্যে ভাষা নিয়ে আবার বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে বিরোধী দলের পক্ষে কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা হয়। প্রস্তাবের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বলেন :

> ...পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং একটি সাধারণ ভাষার দ্বারা ঐক্যসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা হইতে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।[১২]

গণপরিষদের কোনো বাঙালি মুসলমান সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব সমর্থন করেননি। গণপরিষদের সহসভাপতি তমিজুদ্দিন খানও প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন।[১৩]

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ঢাকায় ফিরে এলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ২৬ ফেব্রুয়ারি তাঁকে সংবর্ধনা দেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রশীদ বিল্ডিংয়ে তমদ্দুন মজলিসের অফিসে অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র শামসুল আলম। সভায় ১১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১৪]

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে আরও প্রতিনিধিত্বশীল করার লক্ষ্যে ২ মার্চ (১৯৪৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে আয়োজিত এক সভায় পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান

মুসলিম ছাত্রলীগ, গণআজাদী লীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ছাত্র সংসদ এবং কলেজের ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি তৈরি করা হয়। ১১ মার্চের হরতালকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে কমিটি ৩ মার্চ একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। বিবৃতিতে সই দেন শামসুল আলম (আহ্বায়ক, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ), অধ্যাপক এম এ কাসেম (সম্পাদক, তমদ্দুন মজলিস), নইমুদ্দিন আহমদ (আহ্বায়ক, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ), তফাজ্জল আলী (মেম্বার অব লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি-এমএলএ), আনোয়ারা খাতুন (এমএলএ), কামরুদ্দিন আহ্মদ (সাবেক অফিস সম্পাদক, ঢাকা জেলা মুসলিম লীগ), শামসুল হক (সংগঠক, মুসলিম লীগ), এ সালাম (দৈনিক *পূর্ব পাকিস্তান*), এস এম বজলুল হক (সম্পাদক, *কাফেলা*), সৈয়দ নজরুল ইসলাম (সহসভাপতি, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদ), মোহাম্মদ তোয়াহা (সহসভাপতি, ফজলুল হক মুসলিম হল ছাত্র সংসদ), অলি আহাদ (আহ্বায়ক, ঢাকা শহর মুসলিম ছাত্রলীগ) ও আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী (সম্পা *ইনসান*)। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন :

> বাংলা সমগ্র পাকিস্তানের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসীর মাতৃভাষা। লজ্জার বিষয় যে এই ভাষাকেই রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করিতে আন্দোলনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।...ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্যই পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস ১১ মার্চ রোজ বৃহস্পতিবার সাধারণ হরতাল ঘোষণা করিয়াছে।...এই গণতান্ত্রিক দাবিকে দমন না করিয়া বাংলা ভাষাকে মানিয়া লইলে, আমরা বিশ্বাস করি ইহাই হইবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের একতার ভিত্তি।[১৫]

১১ মার্চের হরতালকে সামনে রেখে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৪ ও ৫ মা৮ (১৯৪৮) সভায় মিলিত হয়ে বিস্তারিত কর্মসূচি নেয়। ওই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অলি আহাদের মন্তব্য হলো, '১১ মার্চ সাধারণ হরতালের আহ্বানের সংবাদ পত্রিকায় পাঠ করিয়া আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবার নিমিত্ত শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ হইতে ১০ই মার্চ রাত্রে ঢাকায় আসেন।'[১৬]

অলি আহাদের বক্তব্য থেকে মনে হতে পারে, হরতালের প্রস্তুতিপর্বে শেখ মুজিবের অংশগ্রহণ ছিল না। কিন্তু শেখ মুজিব বলছেন ভিন্ন কথা। তাঁর বর্ণনামতে :

> ...১১ মার্চকে 'বাংলা ভাষার দাবি' দিবস ঘোষণা করা হলো। জেলায় জেলায় আমরা বের হয়ে পড়লাম। আমি ফরিদপুর, যশোর হয়ে দৌলতপুর, খুলনা ও বরিশালে ছাত্রসভা করে ওই তারিখের তিন দিন পূর্বে ঢাকায় ফিরে এলাম।...রাতে কাজ ভাগ হলো—কে কোথায় থাকবে এবং কে কোথায় পিকেটিং করার ভার নেব।...

১১ মার্চ ভোরবেলা শত শত ছাত্রকর্মী ইডেন বিল্ডিং, জেনারেল পোস্ট অফিস ও অন্যান্য জায়গায় পিকেটিং শুরু করল।...সকাল আটটায় জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে ছাত্রদের ওপর ভীষণভাবে লাঠিচার্জ হলো। একদল মার খেয়ে স্থান ত্যাগ করার পর আরেক দল হাজির হতে লাগল।...নয়টায় ইডেন বিল্ডিংয়ের সামনের দরজায় লাঠিচার্জ হলো। খালেক নেওয়াজ খান, বখতিয়ার...এম এ ওয়াদুদ গুরুতররূপে আহত হলো।...এর মধ্যে শামসুল হক সাহেবকে ইডেন বিল্ডিংয়ের সামনে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে।...আমাদের ওপর কিছু উত্তম-মধ্যম পড়ল এবং ধরে নিয়ে জিপে তুলল। হক সাহেবকে পূর্বেই জিপে তুলে ফেলেছে। বহু ছাত্র গ্রেপ্তার ও জখম হলো। কিছুসংখ্যক ছাত্রকে গাড়ি করে ৩০-৪০ মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে আসল। কয়েকজন ছাত্রীও মার খেয়েছিল। অলি আহাদও গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। তাজউদ্দীন, তোয়াহা ও অনেককে গ্রেপ্তার করতে পারে নাই। আমাদের প্রায় ৭০-৭৫ জনকে বেঁধে নিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিল সন্ধ্যার সময়।[১৭]

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ১১ মার্চের পুলিশি হামলার প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ আইনসভা থেকে সদস্যদের পদত্যাগ করার আহ্বান জানান। কিন্তু তিনি নিজে পদত্যাগ করেননি। ১৫ মার্চ (১৯৪৮) আইনসভায় বাজেট অধিবেশন চলাকালে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। উভয় পক্ষ একসঙ্গে বসে একটি আট দফা চুক্তির খসড়া তৈরি করে। খসড়া চুক্তিটি নিয়ে কামরুদ্দিন আহ্মদ ও অধ্যাপক আবুল কাসেম কারাগারে আটক নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যান। বন্দীদের পক্ষে শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান ও অলি আহাদ খসড়া চুক্তিটি দেখে দেওয়ার পর সরকারের পক্ষে খাজা নাজিমুদ্দিন এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কামরুদ্দিন আহ্মদ চুক্তিতে সই দেন। চুক্তিনামায় ছিল :

১) ২৯ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৮) হতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।
২) পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করে এক মাসের মধ্যে এই বিষয়ে বিবৃতি দিবেন।
৩) ১৯৪৮ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে বেসরকারি আলোচনার জন্য নির্ধারিত তারিখে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার এবং একে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় চাকরির পরীক্ষা দিতে সেন্ট্রাল সার্ভিসেস এক্সামিনেশনে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।
৪) পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে এপ্রিল মাসে একটি প্রস্তাব আনা হবে যে প্রদেশের অফিস-আদালতের ভাষা ইংরেজির বদলে বাংলা হবে।
৫) আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।

৬) সংবাদপত্রের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে।

৭) ২৯ ফেব্রুয়ারি হতে পূর্ববঙ্গের যে সকল অংশে ভাষা আন্দোলনের কারণে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে, তা প্রত্যাহার করা হবে।

৮) সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি।[১৮]

চুক্তির আট নম্বর দফাটি নাজিমুদ্দিন নিজ হাতে লিখেছিলেন।[১৯]

চুক্তি অনুযায়ী ১৫ মার্চ (১৯৪৮) বিকেলেই ১১ মার্চে আটক হওয়া বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলতলায় শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে একটি ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল পূর্ববঙ্গ আইনসভা ভবনের দিকে যায়। মিছিলকারীরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয় এবং লাঠিচার্জ করে। ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন অবস্থা বেগতিক দেখে সেনাবাহিনীর সাহায্য চান। ওই সময় পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) ছিলেন মেজর জেনারেল আইয়ুব খান। তিনি নিজেই এসেছিলেন আইন পরিষদ ভবনে। এ প্রসঙ্গে জেনারেল আইয়ুব খানের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হলো :

> পুলিশের মনোবল অবশ্যই নিচু হয়ে গিয়েছিল। আমি পরিষদে গেলাম এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। আমি তাঁকে বললাম যে সন্ধ্যা হয়ে আসছে এবং ছেলেরা আমার বাহিনীর কাছাকাছি এসে গেছে। তিনি আমাকে বললেন, 'আমি কী করব?' আমি বললাম, 'সভা বন্ধ করে বাড়ি চলে যান।' তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আমি তো একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের মাঝপথে আছি!' তিনি আমার মুখ দেখে বুঝলেন যে আমি মজা পাচ্ছি এবং বললেন, 'ঠিক আছে, আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিন।' এরপর তিনি সভায় গিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলে ফিরে এলেন এবং বললেন, 'আমি বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরি, কিন্তু এখান থেকে বের হব কীভাবে?' আমি মেজর পীরজাদাকে বললাম মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি পরিষদ ভবনের পেছনে নিয়ে আসতে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে বের করে নিয়ে এলাম। কাজ শেষ করে বেরিয়ে এসে আমি ছেলেদের বললাম, পাখি উড়ে গেছে। তারা সবাই জোরে হেসে উঠল এবং একটু আগের উত্তেজনা খুশির বন্যায় ভেসে গেল। ফজলুল হক বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে নিয়ে বেরিয়ে আসলেন এবং ছাত্রদের আবার উত্তেজিত করার চেষ্টা করলেন। আমি মোহাম্মদ আলীর কাঁধে টোকা দিয়ে বললাম, আপনি কি গুলি খেতে চান? তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, 'আপনি রূঢ় আচরণ করছেন।' আমি গোলমাল আর বাড়াতে চাইলাম না, তাই জোরের সঙ্গেই তাঁকে বাড়ি চলে যেতে বললাম।[২০]

১৯ মার্চ বিকেলে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথমবারের মতো ঢাকা সফরে আসেন। ২১ মার্চ বিকেলে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। জিন্নাহ তাঁর এক ঘণ্টার ভাষণে অনেক বিষয়ে কথা বলেন, ভাষার প্রশ্নটিও বাদ যায়নি। তাঁর বক্তব্য ছিল ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি আক্রমণাত্মক এবং সাম্প্রদায়িক জিগিরে ভরা। তিনি বলেন :

> ...আমাদের ঐতিহাসিক দুশমনদের এজেন্ট এবং অনেক কমিউনিস্ট আমাদের মাঝে ঢুকে পড়েছে।...এরা পূর্ব বাংলাকে ভারতের সঙ্গে মিশিয়ে দেখতে চায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ষড়যন্ত্রকারীরা দিবাস্বপ্ন দেখছে।...
>
> এই পাকিস্তানে আমরা যে যেখানেই বাস করছি, তাঁরা কেউই এখানে আদিবাসী নন। সুতরাং আমরা বাঙালি, আমরা পাঠান, আমরা পাঞ্জাবি বলে কী লাভ? আমাদের সকলের প্রথম পরিচয় আমরা মুসলমান।...
>
> ভাষাকে ইস্যু করে, যা কিনা আমি আগেও বললাম, মুসলমানদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে।...আবারও বলছি, এ প্রদেশের অধিবাসীরাই তাদের প্রাদেশিক ভাষা যথাসময়ে নির্ধারণ করে নিতে পারবেন। কিন্তু আমি আপনাদের কাছে এ কথাটা পরিষ্কার করে জানিয়ে রাখতে চাই, নিখিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হতে হবে। কোনো প্রাদেশিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না। আর এ ব্যাপারে আপনাদের যারা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে, তারা অবশ্যই পাকিস্তানের জানি দুশমন।[২১]

রেসকোর্সের বক্তৃতার পর ছাত্রদের মধ্যে জিন্নাহর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা কিছুটা কমে যায়।[২২] এর প্রকাশ ঘটে ২৪ মার্চ জিন্নাহর সম্মানে আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে। কার্জন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জিন্নাহ তাঁর মৌখিক ভাষণে বলেন, 'রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগের ভাষা হিসেবে একটি ভাষা থাকবে এবং সে ভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়।'[২৩] জিন্নাহর বক্তৃতার এই পর্যায়ে কিছু ছাত্র 'না, না' বলে চিৎকার করতে থাকেন। যাঁরা চিৎকার করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন আবদুল মতিন ও এ কে এম আহসান।[২৪]

জিন্নাহ ২৪ মার্চ সন্ধ্যায় পূর্ব পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমেদের সরকারি বাসায় (পরবর্তী সময়ে প্রেসিডেন্ট ভবন ও রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'সুগন্ধা') রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। বৈঠকে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে শামসুল হক, কামরুদ্দিন আহ্‌মদ, অধ্যাপক আবুল কাসেম, তাজউদ্দীন আহমদ, শামসুল আলম, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মো. তোয়াহা, নইমুদ্দিন আহমদ, অলি আহাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় জিন্নাহ বলেন, একাধিক রাষ্ট্রভাষা জাতীয় সংহতির পক্ষে

ক্ষতিকর এবং পাকিস্তানের সংহতির জন্য প্রয়োজনবোধে মাতৃভাষা পরিবর্তন করতে হবে। সভা শেষে সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে জিন্নাহকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়, 'বঙ্গভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হউক।'[২৫]

জিন্নাহর মনে হয়েছিল, ছাত্র আন্দোলনের পেছনে এ কে ফজলুল হকের হাত আছে। তিনি ফজলুল হকের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন খাদ্যমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ আফজালকে ফজলুল হকের কাছে পাঠালেন। ফজলুল হক জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী ছিলেন না। বললেন, 'জিন্নাহ আলেকজান্ডারের মতো রাজ্য জয় করে এসেছে, আমি পরাজিত রাজা পুরু। আমার সঙ্গে তার দেখা হলে সে যে তার ক্ষমতার বহর দেখাবে তা আমি হজম করতে পারব না।' নাজিমুদ্দিন একসময় অখণ্ড বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের অধীনে মন্ত্রী ছিলেন। শেষমেশ তিনি গেলেন। তাঁর অনুরোধে ফজলুল হক জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলেন। পরদিন সকালে তিনি তাঁর অনুচর আজিজুল হক শাজাহান, খন্দকার চুনু মিয়া, মকবুল মুন্সি ও ওফাচাঁদ ড্রাইভারকে নিয়ে একটা বেবি অস্টিনে চড়ে জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। গেটে সেনাবাহিনীর জিওসি আইয়ুব খান, পুলিশের আইজি জাকির হোসেন এবং বারান্দায় জিন্নাহ, নাজিমুদ্দিন ও জিন্নাহর ছোট বোন ফাতেমা জিন্নাহ পায়চারি করছিলেন। ফজলুল হক গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় উঠে জিন্নাহর সঙ্গে একটা ঘরে ঢুকলেন। ঘরের কপাট বন্ধ হলো। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে ফজলুল হক বেরিয়ে এসে কিছু না বলে সরাসরি গাড়িতে উঠলেন। বললেন, 'আমি তো যেতে চাচ্ছিলাম না। জানতাম এমনই হবে।' পরে জানা গেল জিন্নাহ-হক সংলাপের বৃত্তান্ত। আজিজুল হক শাজাহানের বিবরণে তাঁদের বাক্যালাপ এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে :

জিন্নাহ : পাকিস্তান তো তুমি কোনো দিন চাওনি। সব সময় বিরোধিতা করে এসেছ।

হক : প্রস্তাবটি তো আমিই করেছিলাম। কিন্তু ওটার খতনা করা হয়েছে। এটা আমি চাইনি।

জিন্নাহ : পাকিস্তানের এই অংশ বেঁচে থাক তা তুমি চাও না। তাই ভারত থেকে কংগ্রেসের কাছ থেকে টাকা এনে ছাত্রদের মাথা খারাপ করে দিয়েছ। তারা আমাকে হেস্তনেস্ত করছে।

হক : আমি এখানে কোনো রাজনীতি করি না। হাইকোর্টে শুধু মামলা নিয়ে চিন্তা করি। আইন-আদালত নিয়ে থাকি।

জিন্নাহ : জানো, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ?

হক : আমি আমার এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছি।

জিন্নাহ : নো নো, ইউ আর টকিং উইথ দ্য গভর্নর জেনারেল অব পাকিস্তান।

হক : একজন কনস্টিটিউশনাল গভর্নর জেনারেলের কতটুকু ক্ষমতা তা আমি জানি।

জিন্নাহ : জানো, তোমাকে আমি কী করতে পারি?

হক : (ডান হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে) তুমি আমার এ্যাই করতে পারো। মি. জিন্নাহ ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে এটা বাংলাদেশ এবং তুমি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে কথা বলছ।[২৬]

উত্তেজনা চরমে পৌঁছাল। ফাতেমা জিন্নাহ প্রসঙ্গ পাল্টাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। হক সাহেব বললেন, তিনি কলকাতায় যাবেন এবং বিবৃতি দিয়ে বিলেতে পড়ার সময় জিন্নাহ কী করে বেড়িয়েছেন তা সবাইকে জানাবেন। তিনি কোনো দিন মুখ খোলেননি, এবার তা করবেন। জিন্নাহ এরপর ঢাকার বাইরে গেলেন। সিলেট-চট্টগ্রাম সীমান্ত দেখে চুপসে গেলেন। অবাঙালি পুলিশ সবাই অপশন দিয়ে ভারতে চলে গেছে। বর্ডার একেবারে ফাঁকা। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড আর নৌবাহিনীর কিছু লোক কাজ চালাচ্ছে। জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ফ্রেডরিক বার্নকে বললেন, যেভাবেই হোক ফজলুল হককে ম্যানেজ করতে হবে। গভর্নরের অনুরোধে ফজলুল হক আবার জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করলেন। আলোচনা শেষে

পূর্ব্ব পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্র ছাত্রীদের প্রতি আবেদন

[illegible]

ছাত্র সমাজের অকুণ্ঠ ত্যাগ ও কর্মপ্রেরণা দ্বারাই আমরা পাকিস্তান অর্জন করিয়াছি। এই শিশু রাষ্ট্রকে গড়িয়া তুলিবার [illegible] আমাদেরই প্রধান ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র [illegible] সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছে তার আশু সমাধানের জন্য সুষ্ঠু ছাত্র আন্দোলন একান্ত প্রয়োজনীয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ [illegible] "মুসলিম ছাত্র লীগ" আমাদের নিরাশ করিয়াছে। বর্তমানে নির্জীব ও অকর্মণ্য এই প্রতিষ্ঠানের [illegible] আমরা যাহা চাহিয়াছি, তাহার কিছুই পাই নাই। তাই পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়িয়া তুলিবার জন্য [illegible] ছাত্র আন্দোলন একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এই ছাত্র আন্দোলন পরিচালনা করিবার জন্য "পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ" নামে একটি নূতন ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনে [illegible] করিবার জন্য আমরা আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি।

প্রশ্ন উঠিতে পারে পূর্বতন "মুসলিম ছাত্রলীগের" পরিবর্তে নূতন ছাত্র প্রতিষ্ঠান কেন? আমাদের মনে হয় নিম্নোক্ত কারণ গুলি এই প্রস্তাবিত নূতন ছাত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের পক্ষে যথেষ্ট :—(১) ছাত্র লীগের বাৎসরিক সাধারণ নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সর্বশেষ অধিবেশন হইয়াছিল ১৯৪৪ সালে কুষ্টিয়াতে। তারপর গত চার বৎসরে ছাত্র লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কাউন্সিলের অন্ততঃ ৮টি অধিবেশন হওয়া বাধ্যতামূলক থাকা সত্ত্বেও একটি অধিবেশনও ডাকা হয় নাই। (২) বার বার রিকুইজিশন নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও সেক্রেটারী কাউন্সিলের অধিবেশন আহ্বান করিতে ও নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন (কিন্তু দলবাজী করিবার জন্য ঢাকায় যুব-সম্মেলন করিয়াছেন)। (৩) চারি বৎসর পূর্বে গঠিত ছাত্র লীগের কর্ম পরিষদের সদস্যদের প্রায় সকলেরই ছাত্র জীবনের অবসান হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির মানসে তাঁহারা গদি আঁকড়াইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। (৪) ভূতপূর্ব ছাত্র লীগের কর্মকর্তারা দলীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়া [illegible] তাঁহারা [illegible] করিতেছেন। (৫) মুসলিম লীগ বিভক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও ছাত্র লীগ বিভক্ত হয় নাই (বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানে বিভক্ত হওয়ার পর "নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ" আর থাকিতে পারে না)। (৬) বর্তমানে উদ্ভূত জরুরী সমস্যাগুলির সমাধান করিতে এবং ছাত্র আন্দোলন পরিচালনা করিবার ব্যাপারে ছাত্র লীগের কর্মকর্তারা অমার্জনীয় নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। (৭) তথাকথিত ছাত্র নেতাদের ছাত্রনীতি বিরোধী কার্যকলাপ ও প্রতিষ্ঠানের নাম ভাঙাইয়া চাকুরী সংগ্রহের প্রচেষ্টা ছাত্র সমাজে গভীর হতাশা ও বিক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে। (৮) [illegible] ছাত্র নেতাদের বাংলা ভাষা বিরোধী কার্যকলাপ এবং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করিবার আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সক্রিয় কর্মপন্থা এবং [illegible] ছাত্র ও জনসাধারণের মাঝে ছাত্র লীগের প্রতি ঘৃণার সঞ্চার করিয়াছে। (৯) এই কর্মকর্তারা নিজেরাও কিছু করিতেছেন না, পক্ষান্তরে কেহ কিছু করিবার জন্য আগাইয়া আসিলে নেতৃত্ব খোওয়া যাইবার ভয়ে তাঁহাদের বাধা দিতেছেন। এ বিষয়ে [illegible] ছাত্র সম্মেলন (রাজশাহী) এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া যুব-সম্মেলন (কলিকাতা) সম্পর্কে মিঃ আজিজুর রহমানের বিবৃতি প্রণিধান যোগ্য। (১০) তদুপরি ছাত্র লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ীই ছাত্র লীগ বাতিল হইয়া গিয়াছে।

১৯৪৮ সালের মার্চে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের একটি প্রচারপত্র। সূত্র : উমর

ফজলুল হক খুশিমনে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন, 'দীর্ঘদিনের বন্ধুর কাছে গিয়ে পর্বত মুহূর্তে গলে বন্ধুত্বের সাগরে পরিণত হয়ে গেছে। আমি অতীতের সব কথা ভুলে গিয়ে আমার বুকে ঝোলানো কোরআন শরিফ ধরে বলেছিলাম, এ অঞ্চলের মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমি আমার জীবনের শেষ রক্ত বিলিয়ে দেব।'[২৭]

জিন্নাহর প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর ঢাকা সফরের পর ভাষা আন্দোলনে ভাটা পড়ে। ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার পর ১১ সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জিন্নাহ ভাষা প্রশ্নে আর কোনো কথা বলেননি। জিন্নাহর মৃত্যুর পর পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হন। পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হন নুরুল আমিন। ১৯৪৮ সালের ১৮ নভেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকা সফরে আসেন। ২৭ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাঁকে সংবর্ধনা দেন। তাঁর সম্মানে একটি মানপত্র পড়ে শোনান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক গোলাম আযম। মানপত্রে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। মানপত্রে বলা হয়:

> আমরা উর্দুকে যোগাযোগের ভাষা (লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা) হিসেবে গ্রহণ করেছি। আমরা জোরগলায় দাবি করছি যে, ৬২ শতাংশ মানুষের ভাষা বাংলাকেও ন্যায্য স্থান দেওয়া হোক এবং উর্দুর সঙ্গে একে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হোক। তা না হলে পূর্ব পাকিস্তান চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে থাকবে।[২৮]

এদিকে মুসলিম লীগ সরকার দ্বারা ছাত্র নির্যাতন ও গ্রেপ্তার সমানে চলছিল। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর এক সভায় পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ১৯৪৯ সালের ৮ জানুয়ারি প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট ও সভার মাধ্যমে 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের ডাক দেয়। ওই দিন ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনেশিয়াম মাঠে জমায়েত হন। নইমুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে ছাত্রসভায় বক্তৃতা করেন শেখ মুজিবুর রহমান, দবিরুল ইসলাম ও অলি আহাদ। পরে সলিমুল্লাহ হলের ১২ নম্বর কামরায় দলের সাংগঠনিক কমিটির সভায় অলি আহাদ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগকে অসাম্প্রদায়িক ছাত্রসংগঠন করা এবং সব ধর্মের ছাত্রদের এই সংগঠনের সদস্য হওয়ার সুযোগ দেওয়ার দাবিতে প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান, আবদুর রহমান চৌধুরী ও নইমুদ্দিন আহমদের বিরোধিতার মুখে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। অলি আহাদ সভায় পদত্যাগপত্র জমা দিলে শেখ মুজিব তা ছিঁড়ে ফেলেন। ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লা কায়সার ও বাহাউদ্দিন চৌধুরী অলি আহাদকে ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দিতে অনুরোধ জানালে অলি আহাদ বলেন, 'পদত্যাগ করিলেও আমি ছাত্রলীগের সহযোগী হিসেবেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিব।'[২৯]

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রধান লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে কাজ করা। দুই মাস না যেতেই এর কর্মপরিধি আরও বেড়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন আয়ের (চতুর্থ শ্রেণির) কর্মচারীরা কয়েকটি দাবি জানিয়ে এক মাসের নোটিশ দিয়ে ১৯৪৯ সালের ৩ মার্চ থেকে ধর্মঘট শুরু করেন। ছাত্রলীগের সদস্যরা তাঁদের সমর্থন জানান ও সহযোগিতা করেন। কর্তৃপক্ষ ১১ মার্চ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ২৭ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঘোষণা করে। দবিরুল ইসলাম (আইনের ছাত্র), আবদুল হামিদ চৌধুরী (এমএ ক্লাস), অলি আহাদ (বিএ দ্বিতীয় বর্ষ), আবদুল মান্নান (বিএ ক্লাস), উমাপতি মিত্র (এমএসসি পরীক্ষার্থী) ও সমীর কুমার বসু (এমএ ক্লাস)—এই ছয়জনকে চার বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৫ জনকে বিভিন্ন হল থেকে বের করে দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আবদুর রহমান চৌধুরী (আইনের ছাত্র), মোল্লা জালালউদ্দিন (এমএ ক্লাস), দেওয়ান মাহবুব আলী (আইনের ছাত্র), আবদুল মতিন (এমএ ক্লাস), আবদুল মতিন খান চৌধুরী (আইনের ছাত্র), আবদুর রশীদ ভুঁইয়া (এমএ ক্লাস), হেমায়েতউদ্দিন আহমদ (বিএ ক্লাস), আবদুল মতিন খান (এমএ পরীক্ষার্থী), নূরুল ইসলাম চৌধুরী (এমএ ক্লাস), সৈয়দ জামাল কাদেরী (এমএসসি ক্লাস), আবদুস সামাদ (এমকম ক্লাস), সিদ্দিক আলী (এমএ ক্লাস), আবদুল বাকী (বিএ ক্লাস), জে. পাত্রনবিশ (এমএসসি ক্লাস) ও অরবিন্দ বসু (আইনের ছাত্র)। পাঁচজনকে ১৫ টাকা করে জরিমানা করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান (আইনের ছাত্র), কল্যাণ দাশগুপ্ত (এমএ ক্লাস), নইমুদ্দিন আহমদ (এমএ ও আইনের ছাত্র), নাদেরা বেগম (এমএ ক্লাস) ও আবদুল ওয়াদুদ (বিএ ক্লাস)। লুলু বিলকিস বানুর (আইনের ছাত্রী) ১০ টাকা জরিমানা হয়েছিল।[৩০] লুলু ছাত্রলীগ মহিলা শাখার আহ্বায়ক ছিলেন।[৩১]

ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা মুচলেকা দিয়ে কাজে যোগ দিতে থাকেন। তাঁদের ধর্মঘটের পেছনে সাধারণ ছাত্রদের জোরালো সমর্থন ছিল না। সাধারণ ছাত্ররা নিয়মিত পড়ালেখা করতে চাইতেন। এখানেই আন্দোলন শেষ। যেসব ছাত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তাঁদের অনেকেই মুচলেকা দিয়ে শাস্তি প্রত্যাহার করিয়ে নেন। ছাত্রনেতাদের দোদুল্যমানতা ও আপসকামী মনোভাব প্রসঙ্গে শেখ মুজিবের পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

> ১৬ এপ্রিল খবর পেলাম, ছাত্রলীগের কনভেনর নইমুদ্দিন আহমদ ছাত্রলীগের আরেক নেতা আবদুর রহমান চৌধুরী (এখন অ্যাডভোকেট)—ভিপি সলিমুল্লাহ

হল, দেওয়ান মাহবুব আলী (এখন অ্যাডভোকেট) আরও অনেকে গোপনে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে বন্ড দিয়েছেন। যাঁরা ছাত্রলীগের সভ্যও না, আবার নিজেদের প্রগতিবাদী বলে ঘোষণা করতেন, তাঁরাও অনেকে বন্ড দিয়েছেন। ২৭ জনের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই বন্ড দিয়ে দিয়েছেন। কারণ, ১৭ তারিখের মধ্যে বন্ড না দিলে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকবেন না।

ছাত্রলীগের কনভেনর ও সলিমুল্লাহ হলের ভিপি বন্ড দিয়েছেন খবর রটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের মনোবল একদম ভেঙে গিয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি কয়েকজনকে নিয়ে নইমুদ্দিনকে ধরতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাঁকে পাওয়া কষ্টকর, তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। সে এক বাড়িতে লজিং থাকত। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে তাঁকে ধরতে পারলাম। তিনি স্বীকার করলেন আর বললেন, 'কী করব, উপায় নাই। আমার অনেক অসুবিধা।' তাঁর সঙ্গে আমি অনেক রাগারাগি করলাম এবং ফিরে এসে নিজেই ছাত্রলীগের সভ্যদের খবর দিলাম, রাতে সভা করলাম। অনেকে উপস্থিত হলেন। সভা করে তাঁদের বহিষ্কার করা হলো এবং রাতের মধ্যে প্যামপ্লেট ছাপিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিলি করার বন্দোবস্ত করলাম। কাজী গোলাম মাহবুবকে (এখন অ্যাডভোকেট) জয়েন্ট কনভেনর করা হয়েছিল। তিনি নিঃস্বার্থভাবে কাজ চালিয়েছিলেন।...

এ সময় ড. ওসমান গনি সাহেব সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট ছিলেন। তিনি এক্সিকিউটিভ কমিটির সভায় আমাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করলেন। তাঁকে সমর্থন করলেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ। কিন্তু কমিটির অন্য সদস্যরা রাজি হলেন না। ১৮ তারিখ বিকেলে ঠিক করলাম, ধর্মঘট করে বোধহয় কিছু করা যাবে না। তাই ১৮ তারিখে শোভাযাত্রা করে ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়িতে গেলাম এবং ঘোষণা করলাম, 'আমরা এখানেই থাকব, যে পর্যন্ত শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহার না করা হয়।' ১০০ জন করে ছাত্র রাত-দিন ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়িতে বসে থাকবে। তাঁর বাড়ির নিচের ঘরগুলোও দখল করে নেওয়া হলো। একদল যায়, আরেক দল থাকে। ১৮ তারিখ রাত কেটে গেল; শুধু আমি জায়গা ত্যাগ করতে পারছিলাম না। কারণ শুনলাম, তিনি পুলিশ ডাকবেন। ১৯ তারিখ বেলা তিনটায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এসপি বিরাট একদল পুলিশ বাহিনী নিয়ে হাজির হলেন। আমি তাড়াতাড়ি সভা ডেকে একটা সংগ্রাম পরিষদ করতে বলে দিলাম। সবার মতো আমাকেও দরকার হলে গ্রেপ্তার হতে হবে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পাঁচ মিনিট সময় দিলেন আমাদের স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে।...পাঁচ মিনিট পরে এসে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের গ্রেপ্তারের হুকুম দিলেন। তাজউদ্দীন আহমদ আটকা পড়েছেন। তাঁকে নিষেধ করা হয়েছে গ্রেপ্তার না হতে। তাজউদ্দীন বুদ্ধিমানের মতো কাজ করলেন। বলে দিলেন, 'আমি প্রেস রিপোর্টার।' একটা কাগজ বের করে কে কে গ্রেপ্তার হলেন, তাঁদের নাম লিখতে শুরু করলেন। আমি তাঁকে চোখ টিপ মারলাম। আমাদের গাড়িতে তুলে একদম জেলগেটে নিয়ে এল।...

> জুন মাসের প্রথম দিক থেকে দু-একজন করে ছাড়তে শুরু করে।...শেষ পর্যন্ত শুধু আমি ও শাহাবউদ্দিন চৌধুরী রইলাম।[৩২]

১৯৪৯ সালের এপ্রিলে কারাগারে যাওয়ার পরপরই শেখ মুজিবুর রহমানের ছাত্ররাজনীতির ইতি ঘটে। ওই বছর ২৩ জুন ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়। ২৭ জুন শেখ মুজিব জেল থেকে ছাড়া পান। শুরু হলো নতুন দলের রাজনীতি।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রথম কাউন্সিল সভা ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকার তাজমহল সিনেমা হলে শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে শুরু হয়।[৩৩] সম্মেলনে দবিরুল ইসলাম ও খালেক নেওয়াজ খানকে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে ছাত্রলীগের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি করা হয়। এটি ছিল ছাত্রলীগের সঙ্গে শেখ মুজিবের শেষ আনুষ্ঠানিক বৈঠক। সভাপতির ভাষণে তিনি ঘোষণা দেন, তিনি যেহেতু আর ছাত্র নন, এই প্রতিষ্ঠানে তিনি আর সদস্য হিসেবে থাকবেন না।[৩৪]

মোগলটুলী থেকে রোজ গার্ডেন

ঢাকার ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একটি শাখা অফিস ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই শাখা অফিসকে কেন্দ্র করেই বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি সংগঠিত হয়। ঢাকার নবাববাড়িকেন্দ্রিক প্রভাব খর্ব করার ক্ষেত্রে ১৫০ নম্বর মোগলটুলীর তরুণদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। অফিসটি ঢাকায় হলেও সারা পূর্ব পাকিস্তানে নাজিমুদ্দিনবিরোধী তরুণেরা এই অফিসকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। তাঁরা প্রথম দিকে মুসলিম লীগকে নতুনভাবে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য শামসুল হক ও শেখ মুজিবুর রহমান 'ওয়ার্কার্স ক্যাম্প' নামে মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন আহ্বান করে সদস্য সংগ্রহের জন্য রসিদ বই দিতে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আকরাম খাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে এ সম্মেলন হয়।[১]

আকরাম খাঁ ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের কর্মীদের রসিদ বই দেননি। এই ক্যাম্পের কর্মীরা সবাই মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম গ্রুপের অনুগত ছিলেন। আকরাম-নাজিমুদ্দিন উপদলের সমর্থকেরা সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের কর্মীদের বিপজ্জনক মনে করতেন। নাজিমুদ্দিনের সোহরাওয়ার্দী-ভীতির কারণে মোগলটুলীর তরুণেরা উপেক্ষিত হন। এর মধ্যেই টাঙ্গাইলের একটি আসনে উপনির্বাচন হয়, যা মুসলিম লীগের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে।[২]

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে আইনসভার দক্ষিণ টাঙ্গাইলের একটি আসনের নির্বাচিত সদস্য অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ পদত্যাগ করায় আসনটি শূন্য হয়েছিল। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ওই আসনে করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নীর বিরুদ্ধে দাঁড়ান। আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় চর ভাসানে দীর্ঘকাল থেকে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়েছিলেন। এ জন্য লোকে তাঁকে ভাসানী নামে সম্বোধন করত। মওলানা ভাসানীর কাছে পন্নী হেরে যান। নির্বাচনী হিসাব দাখিল না

করার অজুহাতে ভাসানীর নির্বাচন অবৈধ ঘোষণা করা হয়।[৩] ভাসানী, পন্নীসহ চারজন প্রার্থীকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত যেকোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।[৪] টাঙ্গাইলের আসনটি আবার শূন্য ঘোষণা করে ১৯৪৯ সালের ২৬ এপ্রিল উপনির্বাচনের নতুন তারিখ ঠিক করা হয়। মুসলিম লীগ সরকার আগের জারি করা নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে খুররম খান পন্নীকে মনোনয়ন দেয়। মোগলটুলীর ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের তরুণেরা মুসলিম লীগের তরুণ নেতা শামসুল হককে পন্নীর বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। খন্দকার মোশতাক আহমদ, ইয়ার মোহাম্মদ খান, আজিজ আহমদ, শওকত আলী, হজরত আলী প্রমুখের পরিচালনায় মুসলিম লীগের বিদ্রোহী তরুণ কর্মীরা শামসুল হকের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে প্রায় নিঃস্ব ও সহায়-সম্বলহীন শামসুল হক নির্বাচনে জয়ী হন। পন্নী ছিলেন জমিদার এবং ভোটারদের বেশির ভাগই ছিল তাঁর প্রজা।[৫]

এই উপনির্বাচনের সময় মওলানা ভাসানীর সই জাল করে ইশতেহার বিলি করে অসদুপায় অবলম্বন করা হয়েছে, এই অজুহাতে শামসুল হকের বিরুদ্ধে একটি আদালতে নির্বাচনী মামলা দায়ের করা হয়। ভাসানী ওই সময় আসামে তাঁর মুরিদদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে গ্রেপ্তার হয়ে ধুবড়ি জেলে আটক ছিলেন। ইশতেহারে ভাসানীর সইয়ের সঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছিল না। বছর খানেক ধরে মামলা চলে এবং আদালত শামসুল হকের নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেন।[৬]

মওলানা ভাসানী ধুবড়ি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ঢাকায় আসেন এবং আলী আমজাদ খানের বাসায় ওঠেন। মোগলটুলীর কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে আলাপ করে তিনি একটি কর্মী সম্মেলন আহ্বান করেন। একটি বড় আকারের কর্মী সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসেবে এই সভায় আলী আমজাদ খানকে সভাপতি এবং ইয়ার মোহাম্মদ খানকে সাধারণ সম্পাদক করে অভ্যর্থনা কমিটি তৈরি করা হয়। কমিটির কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে আপত্তি ওঠায় মওলানা ভাসানীকে সভাপতি, ইয়ার মোহাম্মদ খানকে সম্পাদক ও খন্দকার মোশতাক আহমদকে দপ্তর সম্পাদক করে অভ্যর্থনা কমিটি পুনর্বিন্যাস করা হয়। কমিটির পক্ষ থেকে ২৩-২৪ জুন (১৯৪৯) ঢাকায় মুসলিম লীগের কর্মীদের একটি সম্মেলন ডাকা হয়।[৭]

মুসলিম লীগ সরকারের ভয়ভীতি, ত্রাস ও নির্যাতনকে উপেক্ষা করে সম্মেলনকে সহযোগিতা দিতে অনেক ঢাকাবাসী সাহস পাননি। সম্মেলনের জন্য সরকারি কোনো মিলনায়তন জোগাড় করা যায়নি।[৮]

এই পরিস্থিতিতে কাজী হুমায়ুন বশীর তাঁর কে এম দাস লেনের বাসভবন রোজ গার্ডেনে সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেন। সম্মেলনের প্রস্তুতি চলার সময় ভাসানী ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে থাকতেন। ১০ জুনের দিকে সংবাদ পাওয়া গেল,

সরকার ভাসানীকে গ্রেপ্তারের পরিকল্পনা করছে। খন্দকার মোশতাক আহমদ তখন কাজী বশীরের সঙ্গে পরামর্শ করে শওকত আলীর সহায়তায় ভাসানীর গায়ে কম্বল পেঁচিয়ে তাঁকে সেই রাতেই ঘোড়ার গাড়িতে করে রোজ গার্ডেনে পৌঁছে দেন। সম্মেলন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভাসানী কাজী বশীরের রোজ গার্ডেনেই ছিলেন।[৯]

২৩ জুন (১৯৪৯) বেলা তিনটায় রোজ গার্ডেনের দোতলার হলঘরে সম্মেলন শুরু হয়। সেখানে ২৫০ থেকে ৩০০ কর্মী উপস্থিত হন। প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন শামসুল হক, আবদুল জব্বার খদ্দর, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন, আলী আহমেদ খান, খন্দকার মোশতাক আহমদ, শওকত আলী, ফজলুল কাদের চৌধুরী, শামসুদ্দিন আহমেদ (কুষ্টিয়া), আতাউর রহমান খান, আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, আলী আমজাদ খান, ইয়ার মোহাম্মদ খান প্রমুখ। এ ছাড়া মওলানা মোহম্মদ আরিফ চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সহসভাপতি মওলানা শামসুল হক, যুগ্ম সম্পাদক মওলানা এয়াকুব শরীফ, ঢাকার প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরির মালিক আবদুর রশিদ এবং রেলশ্রমিক সংগঠন, ছাত্রসংগঠন ও অন্য নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও সম্মেলনে যোগ দেন। ফজলুল হক কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি একটা ভাষণও দেন।[১০] কয়েক মিনিট পরই তিনি সম্মেলনের স্থান ছেড়ে চলে যান। 'হয়তো তাঁহার ভয়



ঢাকার কে এম দাস লেনে অবস্থিত 'রোজ গার্ডেন'। এই বাড়িতেই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম

ছিল, পাছে না সরকারি আনুকূল্য হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়েন। অর্থাৎ উজিরে আলা নুরুল আমিন সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদ হারাইতে হয়।'[১১]

আতাউর রহমান খান মূল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। অনেক আলোচনার পর 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে নতুন একটা রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। আওয়ামী লীগ নামটি মওলানা ভাসানীর দেওয়া।[১২] কয়েকজন কর্মী দলের নামের সঙ্গে 'মুসলিম' নামটি রাখার ব্যাপারে আপত্তি করলেও অধিকাংশ কর্মী আওয়ামী মুসলিম লীগ নামকরণের পক্ষে ছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল যে তাঁরা সবাই মুসলিম লীগের কর্মী। আকরাম খাঁ, নুরুল আমিন, চৌধুরী খালেকুজ্জামান ও লিয়াকত আলী পরিচালিত মুসলিম লীগ হলো সরকারি মুসলিম লীগ এবং তাঁদেরটা হবে আওয়ামের অর্থাৎ জনগণের মুসলিম লীগ।[১৩]

সম্মেলনে বিবেচনার জন্য শামসুল হক *মূলদাবী* নামে পুস্তিকা আকারে একটি কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। *মূলদাবী*তে মুসলিম লীগ সম্পর্কে বলা হয়:

> নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কখনো দলবিশেষের প্রতিষ্ঠান ছিল না; ইহা ছিল ভারত উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের জাতীয় প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চ। ইহার উদ্দেশ্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের মূল নীতিগুলিকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে প্রয়োজন নতুন চিন্তাধারা, নতুন নেতৃত্ব এবং নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতি ও কর্মসূচি এবং মুসলিম লীগকে মুসলিম জনগণের সত্যিকার জাতীয় প্ল্যাটফর্ম মঞ্চ হিসাবে গড়িয়া তোলার।...কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান পকেট লীগ নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত কর্মপন্থা অনুসরণ না করিয়া তাঁহাদের নিজেদের কায়েমি স্বার্থ এবং প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য লীগের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা ভাঙ্গাইয়া চলিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যকেই তাঁহারা মুসলিম লীগকে দলবিশেষের প্রতিষ্ঠান করিয়া ফেলিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, মানবের প্রতি আশীর্বাদস্বরূপ ইসলামকেও ব্যক্তি, দল ও শ্রেণিবিশেষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যায় এবং অসাধুভাবে কাজে লাগানো হইতেছে। কোনো পাকিস্তানপ্রেমিক এমনকি মুসলিম লীগের ঝানু কর্মীগণ পর্যন্ত নীতি ও কর্মসূচি সম্পর্কে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে অথবা প্রস্তাব করিতে পারে না। কেহ যদি এইরূপ করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে পাকিস্তানের শত্রু বলিয়া আখ্যাত করা হয়।...
>
> পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলন মনে করে যে মুসলিম লীগকে এসব স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় লোকদের পকেট হইতে বাহির করিয়া সত্যিকার জনগণের মুসলিম লীগ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে মুসলিম লীগকে সত্যিকার শক্তিশালী মুসলিম লীগ বা মুসলিম জামাত বা মুসলিম জাতীয় প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চে পরিণত করিতে হইলে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমকে ইহার সদস্য শ্রেণিভুক্ত করিতে হইবে, অন্যথায় মুসলিম লীগকে পাশ্চাত্য সভ্যতা,

গণতন্ত্র ও সাংগঠনিক নীতি ও প্রভাবান্বিত দলবিশেষের পার্টি বলিয়া ঘোষণা করিয়া অপরাপর সবাইকে সাধ্যমতো দল গঠন করিবার সুযোগ, সুবিধা ও অধিকার দিতে হইবে। মুসলিম লীগের ভিতর প্রত্যেক ব্যক্তি, দল ও উপদলের স্বাধীন মতামত আদর্শ, নীতি ও কর্মসূচি ব্যক্ত এবং তার পিছনে সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার দিতে হইবে। তদুপরি ছাত্র, যুবক, মহিলা, চাষি, খেতমজুর, মজদুর প্রভৃতি শ্রেণি সংঘ গড়িয়া তুলিবার স্বাধীনতা থাকিবে।[১৪]

*মূলদাবী*তে উপস্থাপিত বক্তব্যে এটা পরিষ্কার যে সম্মেলনের উদ্যোক্তারা মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে চেয়েছিলেন এবং এ জন্য এর গণতন্ত্রায়ণের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। মুসলিম লীগের তৎকালীন নেতৃত্বে এটা সম্ভব হবে না বিধায় তাঁরা নতুন একটা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এই প্ল্যাটফর্ম অবশ্য মুসলিম লীগের মূল আদর্শকে তখনো চ্যালেঞ্জ করেনি। আওয়ামী মুসলিম লীগ মুসলমানদেরই দল থাকল। অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে ছিল: বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি গ্রহণ ও জমির ওপর অন্যান্য কায়েমি স্বার্থ উচ্ছেদ; অর্ডিন্যান্স জারি করে 'তেভাগা' দাবি মেনে নেওয়া; প্রাথমিক শিল্পগুলোকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা, যেমন যুদ্ধশিল্প, ব্যাংক, বিমা, যানবাহন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, খনি, বন-জঙ্গল ইত্যাদি; পাট ও চা-শিল্পকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা; সমস্ত ব্রিটিশ ও বৈদেশিক ব্যবসাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা; শিল্পে মুনাফার হার আইন করে বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি।[১৫]

আওয়ামী মুসলিম লীগের সঙ্গে ১৫০ নম্বর মোগলটুলীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেই নতুন এই দলে যোগ দেননি। তাঁদের মধ্যে কামরুদ্দিন আহ্‌মদ, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা ও তাজউদ্দীন আহমদ উল্লেখযোগ্য। শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে আটক থাকার কারণে উপস্থিত হতে পারেননি।

২৩ তারিখের অধিবেশনের শেষ দিকে মওলানা ভাসানী প্রস্তাব করেন, প্রতিটি জেলা ও প্রতিষ্ঠানের একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে সাংগঠনিক কমিটি করা হোক। এত বড় কমিটি করার ব্যাপারে অনেকেরই আপত্তি ছিল। পরে মওলানা ভাসানীকেই কমিটি করার অনুরোধ জানানো হয়। ভাসানী পরামর্শের জন্য কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে একটি ঘরের মধ্যে ঢোকেন এবং কিছুক্ষণ পর বাইরে এসে ৪০ জন নিয়ে একটি কমিটির প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটির ব্যাপারে সবাই একমত হন। কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (সভাপতি), আতাউর রহমান খান, সাখাওয়াত হোসেন, আলী আহমেদ খান, আলী আমজাদ খান ও আবদুস সালাম খান (সহসভাপতি), শামসুল হক

(সাধারণ সম্পাদক), শেখ মুজিবুর রহমান (যুগ্ম সম্পাদক), খন্দকার মোশতাক আহমদ ও এ কে এম রফিকুল হোসেন (সহসম্পাদক) এবং ইয়ার মোহাম্মদ খান (কোষাধ্যক্ষ)।[১৬] বদরুদ্দীন উমর তাঁর লেখা *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* গ্রন্থে শেখ মুজিবুর রহমান ও খন্দকার মোশতাক আহমদ—এ দুজনকেই যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে অলি আহাদ ও মীজানুর রহমান চৌধুরী তাঁদের লেখায় বলেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একমাত্র যুগ্ম সম্পাদক। পত্রিকায় ছাপা হওয়া সংবাদে শেখ মুজিবের নামের পাশে 'নিরাপত্তা বন্দী' কথাটি লেখা ছিল। জেলে আটক অবস্থায় দলের একটি উঁচু পদে তাঁর নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে এটা অনুমান করা যায়, তাঁকে একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক হিসেবে মনে করা হতো। দলের নামকরণ নিয়ে শেখ মুজিবের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল এ রকম :

> পাকিস্তান হয়ে গেছে, সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দরকার নাই। একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে, যার একটা শুধু ম্যানিফেস্টো থাকবে। ভাবলাম, সময় এখনো আসে নাই, তাই যাঁরা বাইরে আছেন তাঁরা চিন্তাভাবনা করেই করেছেন।[১৭]

এ দেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের জন্ম ও উত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় মুসলিম লীগের বাইরে একমাত্র সংগঠিত রাজনৈতিক দল ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। বাংলার মুসলমান তরুণদের মধ্যে এই পার্টির ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। দেশভাগের সময় সাম্প্রদায়িক হানাহানির কারণে কমিউনিস্ট পার্টির অনেক সদস্য দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যান। যাঁরা থেকে যান, তাঁরা দলটিকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম জনসভাটি অনুষ্ঠিত হয় ২৪ জুন (১৯৪৯) বিকেল পাঁচটায় ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে। সভাপতিত্ব করেন মওলানা ভাসানী। প্রায় চার হাজার লোক জনসভায় উপস্থিত ছিলেন।[১৮] সভা শুরু হওয়ার ঠিক আগে একদল গুন্ডা মাইক্রোফোন নষ্ট করে দিয়েছিল এবং মঞ্চ ভেঙে দিয়েছিল। তারা আওয়ামী লীগের অনেক কর্মীকে মারধরও করেছিল। তারা ছিল বাবুবাজারের বড় বাদশার লোক। তাকে বোঝানো হয়েছিল, সভার আয়োজকেরা পাকিস্তানের শত্রু। গুন্ডারা চলে যাওয়ার সময় ওই এলাকার বাসিন্দা আরিফুর রহমান চৌধুরী বাদশাকে ডেকে এনে সভায় কী কথা হয় তা শুনতে বলেন। কয়েকজনের বক্তৃতার পর বাদশা মঞ্চের কাছে এসে বলল, মুসলিম লীগের নেতারা তাকে ভুল বুঝিয়ে সভা ভাঙার জন্য ৫০০ টাকা দিয়েছে। সে আরও বলল, 'আজ থেকে আমি আওয়ামী লীগের সভ্য হলাম, দেখি আরমানিটোলায় কে আপনাদের সভা ভাঙতে পারে?'[১৯]

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কমিটির প্রথম সভা হয় ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে। ফজলুল হক এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। একটা গঠনতন্ত্র উপকমিটি ও একটা কর্মপন্থা উপকমিটি তৈরি করা হয়।[২০] *মূলদাবী*র প্রস্তাবগুলো সামান্য রদবদল করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রথম খসড়া ম্যানিফেস্টো হিসেবে প্রকাশ করা হয়। দলের অফিস স্থাপন করা হয় ইয়ার মোহাম্মদ খানের ১৮ নম্বর কারকুনবাড়ি লেনে। মওলানা ভাসানী ঢাকায় এলে সচরাচর এ বাড়িতেই থাকতেন। পরে আওয়ামী লীগের অফিস ৯৪ নম্বর নবাবপুর রোডে নিয়ে যাওয়া হয়।[২১]

আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি আলী আমজাদ খানকে সভাপতি এবং কুমিল্লার আলী আহমেদ মোক্তারকে সাধারণ সম্পাদক করে দলের ঢাকা নগর কমিটি গঠন করা হয়। আলমাস আলী ও আউয়াল সাহেবের নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জে প্রথম মহকুমা কমিটি গঠন করা হয়েছিল।[২২]

প্রথম দিকে মাত্র তিনটি জেলায় আওয়ামী লীগের কমিটি করা সম্ভব হয়েছিল। চট্টগ্রামে এম এ আজিজ ও জহুর আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি জেলা কমিটি করা হয়। খড়কীর পীর সাহেব ও অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান যশোরে একটি কমিটি করেন। তাঁদের সাহায্য করেছিলেন মশিউর রহমান ও খালেক সাহেব। তবে তাঁরা তখনো প্রকাশ্যে আওয়ামী লীগে যোগ দেননি। ফরিদপুরে আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে একটি কমিটি হয়।[২৩]

দেশে তখন খাদ্যসংকট। চালের দাম বেড়ে যাচ্ছে হু হু করে। ১১ অক্টোবর (১৯৪৯) ঢাকায় আরমানিটোলা ময়দানে আওয়ামী লীগ একটি জনসভা করে। সভায় বক্তৃতা করেন আতাউর রহমান খান, শামসুল হক ও শেখ মুজিবুর রহমান।[২৪] সভা শেষে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে একটি ভুখা মিছিল বের হয়। মিছিলটি গভর্নমেন্ট হাউসের দিকে যেতে থাকে। ওই সময় প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গভর্নমেন্ট হাউসে ছিলেন। পুলিশ নবাবপুর রেলক্রসিংয়ের কাছে মিছিলটিকে বাধা দেয়। মিছিল থেকে ভাসানী, শামসুল হকসহ অনেকেই গ্রেপ্তার হন। শেখ মুজিব গ্রেপ্তার এড়িয়ে গা-ঢাকা দেন।[২৫] এটাই শেখ মুজিবের প্রথম 'আন্ডারগ্রাউন্ড' জীবন।

ওই সময় সোহরাওয়ার্দী কলকাতার পাট চুকিয়ে করাচিতে বাস করছিলেন। তখন তিনি লাহোরে মামদোতের নবাবের একটি মামলা পরিচালনা করছিলেন। মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকে লাহোরে গিয়ে সোহরাওয়ার্দী, মিয়া ইফতেখার উদ্দিন ও মানকী শরিফের পীর সাহেবের সঙ্গে সারা পাকিস্তানে একটা রাজনৈতিক দল গঠন করার ব্যাপারে আলোচনা করতে বলেন।[২৬]

শেখ মুজিব ছদ্মনামে প্লেনের টিকিট কেটে লাহোরে যান এবং সেখানে কয়েক

সপ্তাহ থাকেন। ডিসেম্বরে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। এবার কিন্তু পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভব হয়নি। পয়লা জানুয়ারি (১৯৫০) তিনি গ্রেপ্তার হন। ১২ সেপ্টেম্বর তাঁকে তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[২৭] অবশ্য তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছিল একটানা ২৬ মাস। মওলানা ভাসানী ও শামসুল হক মুক্তি পান, তবে 'নিরাপত্তা বন্দী' হিসেবে তাঁরাও জেলে আটক থাকেন।[২৮]

আওয়ামী লীগের নেতাদের গ্রেপ্তার হওয়া দেখে অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। দলের অন্যতম সহসভাপতি সাখাওয়াত হোসেন ও সহসম্পাদক এ কে এম রফিকুল হোসেন দৈনিক *আজাদ*-এ বিবৃতি দিয়ে পদত্যাগ করেন। গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ না করে অন্যতম সহসভাপতি আতাউর রহমান খান সন্তানদের দেখতে আসামের শিলংয়ে চলে যান। ওরা সেখানে লেখাপড়া করত।[২৯]

এ সময় *ইত্তেফাক*-এর প্রকাশনা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ৫০ নবাবপুর রোডে বসবাসকারী ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির কর্মচারী ফয়জুর রহমান সম্পাদক হিসেবে তাঁর বাড়ির ঠিকানায় *ইত্তেফাক* ছাপাতেন। ১৮ নম্বর কারকুনবাড়ি লেনের ইয়ার মোহাম্মদ খানের নামে ডিক্লারেশন ছিল প্রকাশক হিসেবে। পত্রিকাটি অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতো এবং একসময় তা বন্ধ হয়ে যায়।[৩০] এ সময় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ঢাকায় আসেন। তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক ইত্তেহাদ*-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং পত্রিকা প্রকাশনা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। ১৯৫১ সালের ১৫ আগস্ট থেকে *ইত্তেফাক* আবার সাপ্তাহিক হিসেবে ছাপা হতে থাকে। ইয়ার মোহাম্মদ খান মানিক মিয়াকে সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ দেন। *ইত্তেফাক*-এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মওলানা ভাসানীর নাম ছাপা হতো।[৩১]

১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর থেকে *ইত্তেফাক* দৈনিক হিসেবে ছাপা হতে থাকে। একপর্যায়ে মানিক মিয়া তাঁর নামে ডিক্লারেশন করিয়ে নেন। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মওলানা ভাসানীর নাম ছাপা বন্ধ হয়ে যায়। সোহরাওয়ার্দীর টাকায় তখন *ইত্তেফাক* চলত। সোহরাওয়ার্দী একজন 'হিন্দু' মালিকের কাছ থেকে ১ নম্বর রামকৃষ্ণ মিশন রোডের বাড়িটি *ইত্তেফাক*-এর নামে কিনে নেন এবং বংশাল রোডে মালিটোলার আসগর হোসেন এমএলএর মালিকানাধীন পুরোনো একটা ছাপাখানা কিনে রামকৃষ্ণ মিশন রোডে *ইত্তেফাক* অফিসে নিয়ে আসেন। সোহরাওয়ার্দী *ইত্তেফাক*-এর জন্য একটা ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেছিলেন। বোর্ডে ছিলেন সোহরাওয়ার্দী (চেয়ারম্যান), আখতার সোলায়মান, রায় বাহাদুর রণদা প্রসাদ সাহা, খয়রাত হোসেন, আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান। সদস্যসচিব ছিলেন সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া।[৩২] *ইত্তেফাক* ক্রমে আওয়ামী লীগের প্রধান প্রচারমাধ্যম হয়ে ওঠে।

১৯৪৯ সালে একটি গণতান্ত্রিক কর্মসূচি নিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু মুসলমানরাই এর সদস্য হতে পারতেন। অবশ্য দলের প্রচারকাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। এ অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা সাম্প্রদায়িক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আওয়ামী মুসলিম লীগকে সরকারবিরোধী গণতান্ত্রিক দল হিসেবে গণ্য করেছিলেন।

১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ কলকাতায় পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার পর থেকেই এর সদস্যরা আন্ডারগ্রাউন্ড-জীবন শুরু করেন।[৩৩] দলটি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি মনে করত, পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের মধ্যে যে জাতীয় অধিকারবোধ জেগে উঠেছে, আওয়ামী মুসলিম লীগ হলো তার ধারক ও বাহক।

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের একটি কৌশল হিসেবে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে কাজ করার প্রস্তাব উঠেছিল। মোহাম্মদ তোয়াহা ও সরদার হালিম এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁরা মনে করতেন, আওয়ামী মুসলিম লীগের মতো একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রগতিশীল কাজ করা যায় না।[৩৪]

১৯৫০ সালের ১৮-১৯ মার্চ লাহোরে সোহরাওয়ার্দীর সভাপতিত্বে নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের একটি কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে সোহরাওয়ার্দী এ সম্মেলনেই নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন এবং লাহোরের মুচিগেটে এক জনসভায় ভাষণ দেন।[৩৫]

লিয়াকত আলী খান ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের 'মূলনীতি' কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করেন। সংবিধান তৈরির ভিত্তি হিসেবে এ রিপোর্ট বিবেচনা করার কথা ছিল। মূলনীতি কমিটি 'হাউস অব ইউনিটস' ও 'হাউস অব পিপলস' নামে দুটি আইনসভা নিয়ে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদ, ফেডারেল পদ্ধতির সরকার এবং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করে। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভ হয়।

১৯৫০ সালেই পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটিতে পাকিস্তানের ভৌগোলিক বাস্তবতার নিরিখে সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসনের বিধান রাখার সুপারিশ করা হয়েছিল। বিশেষ করে যোগাযোগ ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ যথাসম্ভব কম রাখার কথা বলা হয়েছিল।[৩৬]

১৯৫০ সালের অক্টোবরে ঢাকায় রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের একটি সভায় 'ডেমোক্রেটিক ফেডারেশনের সংগ্রাম কমিটি' নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। পরে এটা 'ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন' নামে পরিচিতি পায়। ৪-৫ নভেম্বর

(১৯৫০) এই ফেডারেশনের উদ্যোগে আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে ঢাকায় সংবিধান বিষয়ে একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য পরিপূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছিল। সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশগুলোর মধ্যে ছিল :

১) রাষ্ট্রের নাম হবে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র (ইউনাইটেড স্টেটস অব পাকিস্তান)। এর দুটো অংশ থাকবে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান।
২) পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা ও উর্দু।
৩) দেশরক্ষা এবং বৈদেশিক বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকবে। দেশরক্ষা বাহিনীর দুটি ইউনিট থাকতে হবে, যার একটি থাকবে পূর্ব পাকিস্তানে এবং অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তানে। প্রতিটি অঞ্চলের দেশরক্ষা বাহিনী সেই অঞ্চলের লোক দিয়েই গঠিত হতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের একটি আঞ্চলিক বৈদেশিক মন্ত্রণালয় থাকবে। অন্য সব ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে প্রদেশের হাতে। কেন্দ্র কতগুলো বিষয়ের ওপর কর ধার্য করতে পারবে, কিন্তু প্রদেশের অনুমতি ছাড়া কেন্দ্র তা করতে পারবে না।[৩৭]

১৯৫০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে পাঞ্জাবের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মামদোতের নবাব ইফতেখার হোসেন খান মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে এসে জিন্নাহ মুসলিম লীগ তৈরি করেছিলেন। সোহরাওয়ার্দী তাঁর দল আওয়ামী মুসলিম লীগকে জিন্নাহ মুসলিম লীগের সঙ্গে একত্র করে জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন এবং এই নামে পাঞ্জাবের আইনসভা নির্বাচনে অংশ নেন। নির্বাচনে মুসলিম লীগ বেশির ভাগ আসনে জয়ী হয়। ১৯৭টি আসনের মধ্যে জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ পায় ৩২টি আসন।[৩৮]

১৯৫২ সালের এপ্রিলে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে পরামর্শ করতে করাচি যান। সোহরাওয়ার্দী তখন হায়দরাবাদে। শেখ মুজিব হায়দরাবাদে গেলেন। তখনো পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগের অংশ না হওয়ায় সোহরাওয়ার্দী মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে শেখ মুজিবের যে আলাপ হয়েছিল, তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> তিনি (সোহরাওয়ার্দী) বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কোনো এফিলিয়েশন নেয় নাই। আমি তো তোমাদের কেউ নই।' আমি বললাম, 'প্রতিষ্ঠান না গড়লে কার কাছ থেকে এফিলিয়েশন নেব। আপনি তো আমাদের নেতা আছেনই। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ আপনাকে তো নেতা মানে, এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও আপনাকে সমর্থন করে।' তিনি বললেন, 'একটা কনফারেন্স ডাকব, তার আগে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এফিলিয়েশন নেওয়া দরকার।' আমি তাঁকে জানালাম, আপনি জিন্নাহ আওয়ামী

লীগ করছেন, আমরা নাম পরিবর্তন করতে পারব না। কোনো ব্যক্তির নাম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ করতে চাই না। দ্বিতীয়ত, আমাদের ম্যানিফেস্টো আছে, গঠনতন্ত্র আছে, তার পরিবর্তন করা সম্ভবপর নয়। মওলানা ভাসানী সাহেব আমাকে ১৯৪৯ সালে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তখনো তিনি নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তাঁরও কোনো আপত্তি থাকবে না, যদি আপনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র মেনে নেন।'

> অনেক আলোচনার পরে তিনি মানতে রাজি হলেন এবং নিজের হাতে তাঁর সম্মতির কথা লিখে দিলেন।[৩৯]

ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও করাচিতে আওয়ামী লীগ গঠন করা হয়েছে। তবে নবাব মামদোতের দল জিন্নাহ মুসলিম লীগে যোগ দেওয়ায় পাঞ্জাবে জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ করা হয়েছিল। করাচি আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মাহমুদুল হক ওসমানী ও শেখ মঞ্জুরুল হক।[৪০] শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার পর সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ বাদ দিয়ে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন। তিনি নিজেই এর সভাপতি হন। সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন মাহমুদুল হক ওসমানী।[৪১]

করাচি থেকে ঢাকায় ফিরে শেখ মুজিব মওলানা ভাসানীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ভাসানী তখনো জেলে বন্দী। সবার সঙ্গে আলোচনা করে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের এফিলিয়েশন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এরপর জেলায় জেলায় আওয়ামী মুসলিম লীগের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে শেখ মুজিব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কমিটি করার জন্য তিনি একের পর এক জেলা সফর করতে থাকেন। জেলাগুলোয় সংগঠন গড়ে তোলার কাজটি ছিল খুবই পরিশ্রমের। নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছিল। শেখ মুজিব স্বয়ং প্রক্রিয়াটির বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> আতাউর রহমান সাহেব ও আমি পাবনা, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুরে প্রোগ্রাম করলাম। নাটোর ও নওগাঁয় কমিটি করতে পেরেছিলাম, কিন্তু রাজশাহীতে তখনো কিছু করতে পারি নাই। দিনাজপুরে সভা করলাম, সেদিন বৃষ্টি ছিল। তাই লোক বেশি হয় নাই। রাতে এক কর্মিসভা করে রহিমুদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে একটা জেলা কমিটি করলাম। এভাবে বিভিন্ন জেলায় কমিটি করতে পারলাম। কিন্তু রাজশাহীতে পারলাম না। পাবনায়ও কেউ এগিয়ে এল না। থাকার জায়গা পাওয়া কষ্টকর ছিল। পরে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও আব্দুর রব ওরফে বগাকে দিয়ে একটা কমিটি করলাম।...খুলনায় কোনো বয়সী লোক পাওয়া গেল না। আমার সহকর্মী যুবক শেখ আবদুল আজিজ সভাপতি ও

> মমিনুদ্দিনকে সেক্রেটারি করে জেলা আওয়ামী লীগ গঠন করলাম। জুন, জুলাই, আগস্ট মাস (১৯৫২) পর্যন্ত আমি বিশ্রাম না করে প্রায় সব জেলা ও মহকুমা ঘুরে আওয়ামী লীগ শাখা গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলাম।
>
> শামসুল হক সাহেব পূর্বেই ময়মনসিংহে কমিটি গঠন করেছিলেন। জনাব আবুল মনসুর আহমদ সাহেব কলকাতা থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি হলেন এবং হাশিমউদ্দিন সাহেবকে সেক্রেটারি করলেন।...নোয়াখালীতে আবদুল জব্বার খদ্দর সাহেব জেলা কমিটি গঠন করেছেন। চট্টগ্রামে আবদুল আজিজ, মোজাফফর আহমদ, জহুর আহমদ চৌধুরী ও কুমিল্লায় আবদুর রহমান খান, লাল মিঞা ও মোশতাক আহমদ আওয়ামী লীগ গঠন করেছেন। আমি এসব জেলায়ও ঘুরে প্রতিষ্ঠানকে জোরদার করতে চেষ্টা করলাম।...[৪২]

শেখ মুজিবের বয়স তখন মাত্র ৩২ বছর। দলে তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা আছেন অনেক। কিন্তু দেশের আনাচকানাচে ঘুরে ঘুরে মানুষের সঙ্গে মেশা, কর্মী সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই করা এবং প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সরকারবিরোধী সংগঠনকে মাঠপর্যায়ে বিস্তৃত করার গুরুদায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়েছিল। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠলেন দলের প্রাণপুরুষ।

ভাষার লড়াই

দেশভাগের সময় পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন ২০০ জনেরও কম। ভারতের উত্তর প্রদেশের কমিউনিস্ট নেতা সাজ্জাদ জহির পাকিস্তানে এসে কমিউনিস্ট পার্টি পুনর্গঠনে সাহায্য করেন এবং পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরও ছিলেন মোহাম্মদ হুসেইন আতা, জামালুদ্দিন বুখারী ও ইব্রাহিম এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিলেন মণি সিংহ, নেপাল নাগ, মনসুর হাবিব, কৃষ্ণ বিনোদ রায় ও সুধীন রায় (খোকা রায়)।[১] ওই সময় সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আকবর খান একটি অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন একদল উচ্চাকাঙ্ক্ষী সেনা কর্মকর্তা। পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি এই অভ্যুত্থান পরিকল্পনায় যুক্ত ছিল। পরে এই পরিকল্পনা স্থগিত করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনাটি ফাঁস হয়ে গেলে বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তার হন।[২] গ্রেপ্তার হওয়া ১১ জন সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা ও চারজন অসামরিক নাগরিকের মধ্যে ছিলেন মেজর জেনারেল আকবর খান, বেগম নাসিম আকবর খান, *পাকিস্তান টাইমস*-এর সম্পাদক কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার কমোডর মোহাম্মদ খান জানজুয়া, মেজর জেনারেল নাজির আহমদ, কমিউনিস্ট পার্টির মোহাম্মদ আতা, ব্রিগেডিয়ার সাদিক, লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন, মেজর হাসান খান, লে. কর্নেল নিয়াজ মোহাম্মদ আরবাব, ক্যাপ্টেন খিজির হায়াত, মেজর হাসান, মেজর ইসহাক মোহাম্মদ প্রমুখ। তাঁদের বিরুদ্ধে 'রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলা' রুজু করা হয়। সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদে একটা বিশেষ আদালতে বিচারে ১৪ জনের সাজা হয়েছিল। অসামরিক অভিযুক্তদের প্রত্যেকের চার বছরের কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা হয়। আকবর খানের হয় ১২ বছরের নির্বাসনদণ্ড। হাইকোর্টে আকবর খানের পক্ষে আপিল করেছিলেন সোহরাওয়ার্দী। ফলে সাজা কমে গিয়েছিল। সাজ্জাদ জহির সাজা ভোগ করার পর ছাড়া পেয়ে ভারতে চলে গিয়েছিলেন।[৩]

আকবর খানের পরিকল্পনায় কয়েকজন উঁচু পদের সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত ছিল, যাঁদের অন্যতম ছিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খান। এ প্রসঙ্গে পরে আইয়ুব খান বলেছিলেন, আকবর খানের পক্ষে মামলা লড়ে সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের বড় ক্ষতি করেছেন।[৪]

পাকিস্তানের শাসকেরা গণতন্ত্রের ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সোহরাওয়ার্দীকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সোহরাওয়ার্দী কলকাতা ছেড়ে পাকাপাকিভাবে পাকিস্তানে চলে আসেন। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার পর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে সোহরাওয়ার্দী 'ভারতের দালাল'।[৫] সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তান গণপরিষদে বিরোধী দলের নেতা ছিলেন। বিরোধী দল সম্পর্কে লিয়াকত আলী খানের ভাষা ছিল কুরুচিপূর্ণ। বিরোধীদের তিনি একবার বলেছিলেন, 'ডগস লেট লুজ বাই ইন্ডিয়া' (ভারতের লেলিয়ে দেওয়া কুকুর)। বিরোধী দলের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করতে গিয়ে তিনি আরও বলেছিলেন, 'শের কুচাল দেঙ্গে' (মাথা ভেঙে দেব)।

১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডিতে এক জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। পাঞ্জাবের গোলাম মোহাম্মদ গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন।

১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নাজিমুদ্দিন প্রথমবার ঢাকা সফরে আসেন। ২৭ জানুয়ারি বিকেলে পল্টন ময়দানে এক জনসভায় তিনি ঘোষণা দেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ ঘোষণা ছিল ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে তাঁর স্বাক্ষরিত চুক্তির বরখেলাপ। নাজিমুদ্দিনের ঘোষণার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০ জানুয়ারি (১৯৫২) এক সভায় ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দেয়। ৩০ জানুয়ারি সন্ধ্যা ছয়টায় ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরিতে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে এক সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ২৮ সদস্যের সংগ্রাম পরিষদে আওয়ামী মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগের প্রাধান্য ছিল। ছাত্রলীগের কাজী গোলাম মাহবুব আহ্বায়ক মনোনীত হন।[৬]

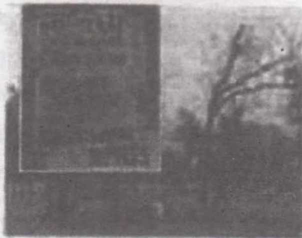
মুসলিম লীগের নেতা হামিদুল হক চৌধুরী ১৯৫০ সালে দলের কাউন্সিল অধিবেশনে উপদলীয় কোন্দলের একপর্যায়ে দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। তখন থেকে তাঁর মালিকানাধীন ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা *পাকিস্তান অবজারভার* সরকারবিরোধী ভূমিকায় নামে। ১৯৫২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি 'Crypto Fascism'

ইত্তেফাক

THE ITTEFAQ

সংগঠন শক্তি ও সফলতাই ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর ডাক

রাজধানীর রাজপথে সমগ্র প্রদেশের বজ্রকণ্ঠের শপথ ঘোষিত



২১শে ফেব্রুয়ারী প্রদেশের সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট

১১ই ফেব্রুয়ারী পতাকা দিবস

২১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের ঘোষণা-সংবলিত সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক*-এর প্রথম পাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় ছাপার কারণে ১৩ ফেব্রুয়ারি পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সম্পাদক আবদুস সালাম গ্রেপ্তার হন।[৭]

২০ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) রাতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ৯৪ নম্বর নবাবপুর রোডের অফিসে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। আগের সফরসূচি অনুযায়ী মওলানা ভাসানী ঢাকার বাইরে ছিলেন।[৮] বিকেলেই ঢাকা শহরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি

করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল বের করা হবে কি না, এ নিয়ে সংগ্রাম পরিষদের সভায় আলোচনা ও বিতর্ক হয়। সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের মধ্যে আতাউর রহমান খান, শামসুল হক, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন, আবুল কাসেম, শামসুল হক চৌধুরী, খালেক নেওয়াজ খান, কাজী গোলাম মাহবুব, মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ ১৪৪ ধারা অমান্য করার বিরুদ্ধে ছিলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ১৪৪ ধারা না ভাঙার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন :

> আওয়ামী মুসলিম লীগ নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। দ্বিতীয়ত, গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করিয়া সরকার প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচন অনিশ্চয়তার গর্ভে নিক্ষেপ করিবে, এবং তৃতীয়ত, রাষ্ট্রবিরোধী ও ধ্বংসাত্মক শক্তি মাথাচাড়া দিয়া উঠিবে।[৯]

১৪৪ ধারা জারির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একুশে ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ মিছিল প্রত্যাহারের প্রস্তাব সভায় উত্থাপন করা হলে শামসুল আলম, আবদুল মতিন, গোলাম মওলা ও অলি আহাদ—এই চারজন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন।[১০]

একুশে ফেব্রুয়ারির (১৯৫২) ঘটনা নিয়ে নানা মত ও প্রতিবেদন পাওয়া যায়। ওই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ ছাত্রনেতা মোহাম্মদ সুলতানের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। মোহাম্মদ সুলতান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রথম সভাপতি এবং ১৯৫৩ সালের মার্চে প্রকাশিত *একুশে ফেব্রুয়ারি* সংকলনের প্রকাশক। সংকলনটি সম্পাদনা করেছিলেন কবি হাসান হাফিজুর রহমান। সাক্ষাৎকারটির উল্লেখযোগ্য অংশ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হলো :

> ফয়েজ : কমিউনিস্ট পার্টি সে সময় রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে এমন অবস্থায় নিয়ে যেতে চায়নি, যাকে রাজনৈতিক দিক থেকে হঠকারিতা বলা যায়।...
>
> সুলতান : আমার মনে হয়, দেশের বামপন্থী চিন্তাধারা নতুন ছাত্র-যুব সংগ্রামী সমাজকে তারা তখন সঠিকভাবে ধরতে পারেনি।...তাদের একটা নির্দেশ ছিল যে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ যাতে না করা হয়, সেভাবে প্রস্তুতি নেয়া। প্রায় ১৪টি সংগঠন সেই মিটিংয়ে (সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ, ২০ ফেব্রুয়ারি) উপস্থিত ছিল।...সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার প্রস্তাব যখন পাস হচ্ছিল, তখন অলি আহাদ দাঁড়িয়ে বলেন, আমি এই প্রস্তাবের সঙ্গে একমত নই এবং আমার আর একটি প্রস্তাব আছে। তাঁর প্রস্তাবে বলা হয়, সর্বদলীয় সভা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে না বলে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও আগামীকাল (২১ ফেব্রুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সভায় যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রস্তাব গৃহীত হয়

এবং ছাত্ররা মিছিল করে বেরিয়ে যায়, তাহলে মূল প্রস্তাব ও এই কমিটি বাতিল বলে গণ্য হবে। এই প্রস্তাবটিও মূল প্রস্তাবের সঙ্গে সংযোজিত হয়ে গৃহীত হয়।...বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে দেখলাম ছাত্রসমাজ ব্যাপকভাবে ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে। আমরা আটজন ছাত্রকর্মী রাত একটার সময় বসলাম ঢাকা হল (শহীদুল্লাহ হল) ও ফজলুল হক হলের মাঝখানের পুকুরঘাটে। আগামীকাল একুশে কীভাবে মিছিল ও আন্দোলন পরিচালনা করব ও প্রথমে কীভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করব, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ফয়েজ : পুকুরঘাটের সভায় কারা কারা ছিলেন?

সুলতান : গাজীউল হক, এস এ বারী, হাবীবুর রহমান শেলী, কমরুদ্দীন শহুদ, আমি নিজে—অন্যদের নাম এখন মনে আসছে না।

ফয়েজ : আবদুল মতিন ও অলি আহাদ ছিলেন?

সুলতান : মতিন উপস্থিত ছিলেন না। অলি আহাদ তখন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নন বলে ডাকা হয়নি। এ কেবল ছাত্রদের সভা।...আমরা ওখানেই প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে গাজীউল হককে আগামীকাল সকালে (একুশে) ছাত্রদের সভায় সভাপতিত্ব করতে হবে। আর কাউকেই আমরা সভাপতি হতে দেব না। দুই নম্বর সিদ্ধান্ত হলো, ১৪৪ ধারা ভাঙার জন্য প্রথম ব্যক্তি হিসেবে হাবীবুর রহমান শেলী থাকবে।...একুশের সকাল নয়টার আগে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেই দেখি মেডিকেল কলেজ এলাকাসহ এই অঞ্চল পুলিশ সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘিরে আছে। এর পরই ছাত্রছাত্রীরা মিছিল করে আসতে শুরু করল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মিটিং ঠিক বেলা ১১টায় আরম্ভ হলে আমাদের পূর্ব রাত্রের কর্মসূচি অনুযায়ী গাজীউল হক চেয়ারে বসল, আমাদের প্রস্তাবমতে। সেই আমতলাতেই মিটিং।

ফয়েজ : কোনো প্রতিবাদ হয়নি?

সুলতান : ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে শামসুল হক সাহেব দাঁড়িয়ে বলতে চেষ্টা করেন যে আজকে কোনোমতেই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে না। এই ছাত্রলীগের তখন প্রেসিডেন্ট কামরুজ্জামান সাহেব ও সেক্রেটারি ওয়াদুদ সাহেব।...শামসুল হক সাহেব ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করার সময় মিটিং থেকে তীব্র প্রতিবাদ হয় এবং তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয়। এরপর মতিন সাহেব প্রস্তাব এনে বক্তৃতা করেন ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল করার পক্ষে। বিপুল সমর্থনের পর মিছিল করার জন্য সভা ভেঙে যায়।

ফয়েজ : গাজীউল হককে সভাপতি করা নিয়ে কি কোনো 'হিচ' বা আপত্তি হয়েছিল?

সুলতান : অন্য কাউকে সভাপতি করার উদ্দেশ্যে কেউ কেউ চেষ্টা করেছিল। আমরা প্রস্তাব করেই একটা টিনের চেয়ার নিয়ে তাকে আমতলায় বসিয়ে দিই।...সকাল সাড়ে নয়টা থেকে দশটার মধ্যে তোয়াহা সাহেব ও শহীদুল্লা (কায়সার) সাহেব একটা প্রস্তাব নিয়ে আসেন। প্রস্তাবটি যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে প্রস্তাব হয়েই যায়, তবে যেন ১০ জন ১০ জন করে মিছিল বের হয়।

ফয়েজ : কেন, ১০ জনের মিছিল কেন?

সুলতান : যেন মিছিলে শৃঙ্খলা থাকে।...

ফয়েজ : পরোক্ষভাবে এবার তাঁরা (কমিউনিস্ট পার্টি) সমর্থন জানালেন।

সুলতান : হ্যাঁ, মিছিল হবেই এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত দেখে তারা মিছিলের বিরোধিতা করেনি। তারপর একটার পর একটা মিছিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় বেরিয়ে যেতে শুরু করল। পুলিশ আইন ভঙ্গকারী একটি একটি দল ধরে গাড়িতে তুলে নিচ্ছে। কাউকে জেলের দিকে, কাউকে বা দূরবর্তী টঙ্গী এলাকায়।

ফয়েজ : প্রথম ব্যাচে কি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাবীবুর রহমান শেলী ছিলেন?

সুলতান : প্রথম ব্যাচের প্রথম ব্যক্তিই তিনি ছিলেন। এভাবে ছেলেদের আট-দশটা মিছিল বের হবার পর মেয়েদের মিছিল শুরু হয়।

ফয়েজ : মেয়েদের পৃথক মিছিলে কারা ছিলেন?

সুলতান : তাঁদের সবার নাম এখন আর মনে নেই। তবে সুফিয়া ইব্রাহীম (ড. মিসেস সুফিয়া ইসতিয়াক), ড. হালিমা খাতুন, রওশনারা বাচ্চু ও শাফিয়া খাতুনের নাম মনে পড়ে। দেখা গেল পুলিশ মেয়েদের গাড়িতে তুলতে চেষ্টা করছে না। কিন্তু মেয়েদের মিছিলের ওপর পুলিশ বেধড়ক লাঠিচার্জ শুরু করে দিয়েছে এবং বহু মেয়ে সেদিন মিছিল করতে গিয়ে আহত হয়েছিলেন। এই বিরতিহীন মিছিল ঠেকাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছাড়তে শুরু করে।...

ফয়েজ : কটা হবে তখন?

সুলতান : সাড়ে ১২টা থেকে ১টা হবে। গ্যাসে টিকতে না পেরে বিক্ষোভকারী ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ মিটিং করেন এবং তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে মুনীর চৌধুরী, অজিত গুহ (জগন্নাথ কলেজ) ও মুজাফফর আহমদ চৌধুরী সেখানে আগমন করেন। ছাত্র, শিক্ষক, বয়, বেয়ারা—সবাই সংগ্রামে জড়িত হয়ে পড়েন।

ফয়েজ : শেখ মুজিব কি এই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হতে পেরেছিলেন?

সুলতান : তিনি জড়িত হতে পারেননি। এ কথা সঠিক নয় যে তিনি সেবারের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। একুশের সঙ্গে কোনোমতেই

নয়। তার বেশ আগে থেকেই তিনি জেলে ছিলেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে সরিয়ে অন্যত্র (ফরিদপুর জেলে) নিয়ে যাওয়া হয়।[১১]

অলি আহাদের বিবরণ থেকে জানা যায়, ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার জেলা প্রশাসক কোরায়শী 'প্রয়োজনীয় ধৈর্য, সহনশীলতা ও প্রজ্ঞার পরিচয়' না দিয়ে পুলিশকে বিক্ষোভরত ছাত্রদের ওপর গুলি চালানোর আদেশ দেন। ওই সময় পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের অধিবেশন চলছিল। পুলিশের গুলিবর্ষণের ব্যাপারে ব্যাখ্যা চেয়ে পরিষদ সদস্য মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ একটি মুলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করলে খয়রাত হোসেন ও বেগম আনোয়ারা খাতুন তা সমর্থন করেন। প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন বলেন, 'কয়েকজন ছাত্র গুরুতররূপে আহত হয়েছে শুনে ব্যথিত হয়েছি। তাই বলে আমাদের ভাবাবেগে চালিত হলে চলবে না।' প্রতিবাদে মাওলানা তর্কবাগীশ পরিষদ কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করে ছাত্রদের সমাবেশে যোগ দেন। পরিষদ সদস্য খয়রাত হোসেন, আবুল কালাম শামসুদ্দিন (দৈনিক *আজাদ*-এর সম্পাদক), বেগম আনোয়ারা খাতুন এবং কংগ্রেস দলের সবাই ওয়াকআউট করেন। সন্ধ্যায় ঢাকা শহরে কারফিউ জারি ও সেনাবাহিনী তলব করা হয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া আহত ১০ জনের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত ও আবদুল জব্বার এবং বাদামতলী কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের ছেলে রফিকুদ্দীন আহমেদ মারা যান। গভীর রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ঘেরাও করে সশস্ত্র পুলিশ নিহত ব্যক্তিদের লাশ সরিয়ে নেয়। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি বংশাল রোডে মুসলিম লীগের সমর্থক *দৈনিক সংবাদ* অফিসে জনতা আক্রমণ চালায়। সেখানে পুলিশ গুলি চালালে আবদুস সালাম নামের একজন রিকশাচালক ঘটনাস্থলেই নিহত হন। নওয়াবপুর রোডে 'খোশমহল' রেস্টুরেন্টের কাছে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমান আহত হন এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। ২২ ফেব্রুয়ারি ভিক্টোরিয়া পার্কের (বর্তমানে বাহাদুর শাহ পার্ক) আশপাশে, নওয়াবপুর রোড ও বংশাল রোডে পুলিশের গুলিতে কতজন নিহত হয়েছেন, তার সঠিক সংখ্যা কারও জানা নেই।[১২]

এ ছাড়া আরও যাঁরা নিহত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আবদুল আউয়াল, কিশোর অহিউল্লাহ ও সিরাজউদ্দিনের নাম জানা যায়।[১৩]

১৯৫২ সালের ২১-২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মোট কতজন নিহত হয়েছিলেন এবং কী তাঁদের পরিচয়, তার কোনো বিস্তারিত অনুসন্ধান হয়নি। পুলিশের বিরুদ্ধে লাশ গুমের অভিযোগ ছিল। পাকিস্তানি বামপন্থী লেখক-গবেষক লাল খানের মতে, পুলিশের গুলিতে ২৬ জন নিহত এবং ৪০০ জনের মতো আহত হয়েছিলেন।[১৪]

১৯৫৩ সালের মার্চে একুশের প্রথম সংকলনে ছাপা হওয়া কবিরউদ্দিন আহমেদের লেখা থেকে জানা যায়, ২২ তারিখের সংবাদপত্রের তথ্য অনুযায়ী তিনজন নিহত, ৩০ জন আহত ও ১৮০ জন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ২৩ তারিখের সংবাদপত্রের তথ্য অনুযায়ী পাঁচজন নিহত, ১৫০ জন আহত এবং ৩০ জন গ্রেপ্তার হন। ২৫ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী সলিমুল্লাহ হলের পশ্চিম দিকের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ৮০ জনের মতো কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। আন্দোলনের নয়জন নেতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। ৭ মার্চ সন্ধ্যায় ৮২ নম্বর শান্তিনগরে সভা করার সময় আবদুল মতিন, মীর্জা গোলাম হাফিজ, মুজিবুল হক, হেদায়েত হোসেন চৌধুরী, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, সাদেক খান ও আবদুল লতিফ গ্রেপ্তার হন। কাজী গোলাম মাহবুব, হাসান পারভেজ ও আনিসুজ্জামান পালাতে সক্ষম হন।[১৫]

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে মোহাম্মদ সুলতান যে মন্তব্য করেছেন, তা নিয়ে ভিন্নমত আছে। শেখ মুজিব নিজেই তাঁর ভূমিকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে :

> আমি (জেল) হাসপাতালে আছি। সন্ধ্যায় মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলি আহাদ দেখা করতে আসে। আমার কেবিনের একটা জানালা ছিল ওয়ার্ডের দিকে। আমি ওদের রাত একটার পরে আসতে বললাম। আরও বললাম, খালেক নেওয়াজ, কাজী গোলাম মাহবুব ও আরও কয়েকজন ছাত্রলীগ নেতাকে খবর দিতে।...বারান্দায় বসে আলাপ হলো এবং আমি বললাম, সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে। আওয়ামী লীগ নেতাদেরও খবর দিয়েছি।...আরও বললাম, 'খবর পেয়েছি, আমাকে শিগগিরই আবার জেলে পাঠিয়ে দিবে, কারণ আমি নাকি হাসপাতালে বসে রাজনীতি করছি। তোমরা আগামীকাল রাতেও আবার এসো।'...
>
> পরের দিন রাতে এক এক করে অনেকেই আসল, সেখানেই ঠিক হলো আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর করতে হবে।...আমি আরও বললাম, আমিও আমার মুক্তি দাবি করে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করব। আমার ২৬ মাস জেল হয়ে গেছে।...১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে সকালবেলা আমাকে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হলো...আমাদের ফরিদপুর জেলে এনেছে এবং আজ থেকে অনশন করছি।...২১ ফেব্রুয়ারি আমরা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটালাম। রাতে সিপাহিরা ডিউটিতে এসে খবর দিল, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে। কয়েকজন লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে।[১৬]

জেল থেকে শেখ মুজিবের ছাড়া পাওয়ার আদেশ এসে পৌঁছায় ২৭ ফেব্রুয়ারি রাতে। ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে তিনি ফরিদপুর জেল থেকে বেরিয়ে আসেন।

অনশনের কারণে তাঁর শরীর ছিল দুর্বল। বেশ কিছুদিন গ্রামের বাড়িতে বিশ্রাম নিয়ে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি ঢাকায় আসেন।[১৭] এর মধ্যে আওয়ামী লীগের অফিস চলে এসেছে নবাবপুর রোডে। সভাপতি মওলানা ভাসানী এবং সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক তখনো কারাগারে বন্দী। শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির সভা ডাকেন। আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে এই সভায় ১২-১৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় শেখ মুজিবকে দলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়।[১৮]

১৯৫২ সালের ২৭ এপ্রিল ঢাকার বার লাইব্রেরি হলে আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে ৫০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি 'শহীদ দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সম্মেলনে নিজ নিজ জেলার পক্ষে বক্তৃতা করেন শামসুল হক (রাজশাহী), আজিজুর রহমান (চট্টগ্রাম), আবদুল গফুর (খুলনা), আবুল হোসেন (ফরিদপুর), আবুল হাশেম (বরিশাল), হাতেম আলী তালুকদার (ময়মনসিংহ), হাবিবুর রহমান (সিলেট), শফিকুল হক (কুমিল্লা), এস হোসেন (রংপুর), আবদুস সাত্তার (বগুড়া), আবদুল বারী (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মোহাম্মদ আলী (দিনাজপুর), আবদুল মোমেন (পাবনা), সাইদুর রহমান (কুষ্টিয়া), আলমগীর সিদ্দিকী (যশোর) ও আনিসুর রহমান (নোয়াখালী)। সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমানও বক্তৃতা করেন।[১৯]

একুশে ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের প্রতিবাদ হয়েছিল ব্যাপক। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল, পুলিশি হামলা ও গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটে। একুশে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় গণতান্ত্রিক যুবলীগের চট্টগ্রাম জেলা শাখার আহ্বায়ক এবং *সীমান্ত* পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী রোগশয্যায় বসে 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' শিরোনামে একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন। কবিতার প্রথম কয়েকটি লাইন ছিল :

ওরা চল্লিশজন কিংবা আরো বেশী
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে রমনার রোদ্রদগ্ধ
কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায়...
চল্লিশটি তাজা প্রাণ আর অঙ্কুরিত বীজের খোসার মধ্যে
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের অসংখ্য বুকের রক্ত
রামেশ্বর, আবদুস সালামের কচি বুকের রক্ত...[২০]

১৯৫৩ সালের মার্চে প্রকাশিত এবং হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারি* সংকলনে এগারোটি কবিতা এবং দুটি গান ছাপা হলেও মাহবুব-উল-

আলমের কবিতাটির স্থান হয়নি। সম্ভবত মফস্বলের কবি হিসেবে ঢাকার বিদ্বজ্জনের কাছে তিনি অপাঙ্‌ক্তেয় ছিলেন।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে দুই জ্যেষ্ঠ নেতা ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা ছিল অনুজ্জ্বল। করাচিতে বসে সোহরাওয়ার্দী ঢাকার আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ধরতে পারেননি। একুশে ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের বাড়াবাড়ির নিন্দা জানিয়ে তিনি একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে উর্দু রাষ্ট্রভাষা হোক, এটা তিনি চেয়েছেন বলে পত্রিকায় খবর ছাপা হয়েছিল। দৈনিক *আজাদ*-এ সোহরাওয়ার্দীর সমালোচনা হয়। শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করতে করাচি যান, সেখান থেকে হায়দরাবাদ। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দীর নামে যে খবর পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, তার প্রসঙ্গ উঠতেই সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'এ কথা তো আমি বলি নাই। উর্দু ও বাংলা দুইটা হলে আপত্তি কী? এ কথাই বলেছিলাম।' শেখ মুজিব তাঁকে বললেন, 'সেসব কথা কোনো কাগজে পরিষ্কার করে ছাপানো হয় নাই। পূর্ব বাংলার জনসাধারণ আপনার মতামত না পেয়ে খুব দুঃখিত হয়েছে।' সোহরাওয়ার্দীকে তিনি অনুরোধ করলেন, তাঁকে (সোহরাওয়ার্দীকে) লিখে দিতে হবে যে উর্দু ও বাংলা দুইটাই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তিনি সমর্থন করেন। কারণ, অনেক ভুল-বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। মুসলিম লীগ এবং তথাকথিত প্রগতিবাদীরা প্রপাগান্ডা করছেন তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই লিখে দেব, এটা তো আমার নীতি ও বিশ্বাস।' তিনি লিখে দিলেন।[২১]

এর পরপরই ঢাকায় একটি লিফলেট বিলি করা হয়। বাংলা ভাষার সমর্থনে অনেক বিশিষ্টজনের স্বাক্ষর ছিল এতে। স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর নামও ছিল। ফজলুল হক এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, তাঁর বিরোধীরা নুরুল আমিন এবং তাঁর মধ্যে সম্পর্কে ফাটল ধরাতে চাইছে। তিনি সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদে থাকা অবস্থায় কোনো ঝামেলায় পড়তে চাননি। কিন্তু শিগগিরই তিনি বুঝতে পারলেন, নুরুল আমিনের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ভবিষ্যতে তাঁর কোনো লাভ হবে না। সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। তিনি তাঁর পুরোনো কৃষক-প্রজা পার্টিকে কৃষক-শ্রমিক পার্টি (কেএসপি) নামে পুনরুজ্জীবিত করলেন।[২২]

যুক্তফ্রন্ট

পাকিস্তানের রাজনীতিতে চলছিল ভাঙাগড়ার খেলা। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অস্থিরতা ও ধারাবাহিকতা না থাকার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। ১৯৫৩ সালের ১৭ এপ্রিল গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত করেন। বগুড়ার মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। মোহাম্মদ আলী যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত এবং মার্কিনপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যেদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান, সেদিন সোহরাওয়ার্দী ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা করার সময় তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়াকে স্বাগত জানান। অন্যদিকে আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানী খাজা নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তের নিন্দা করে এই আদেশকে অবৈধ বলে উল্লেখ করেন।

১৯৫৩ সালের প্রথম দিকে মওলানা ভাসানী, শামসুল হক এবং অন্য রাজনৈতিক নেতারা কারাগার থেকে মুক্তি পেতে শুরু করেন। শামসুল হক অসুস্থ থাকায় শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব চালিয়ে যেতে থাকেন। দলের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন ১৯৫৩ সালের ৯ জুলাই ঢাকার নবাবপুর রোডে মুকুল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হয়। দলের সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে বেশ দলাদলি হয়। অনেকেই এই পদে শেখ মুজিবকে চাইতেন না। শেষ পর্যন্ত মওলানা ভাসানীকে সভাপতি এবং শেখ মুজিবকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি তৈরি হয়।[১] অন্যান্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তিরা ছিলেন আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুস সালাম খান ও খয়রাত হোসেন (সহসভাপতি), কোরবান আলী (সাংগঠনিক সম্পাদক), আবদুর রহমান (প্রচার সম্পাদক), মুহম্মদুল্লাহ (দপ্তর সম্পাদক) ও ইয়ার মোহাম্মদ খান (কোষাধ্যক্ষ)। মওলানা ভাসানী কমিটিতে ২৩ জন সদস্যকে মনোনীত করেন। তাঁরা হলেন মুজিবুর রহমান ও শামসুল হক (রাজশাহী), মশিউর রহমান, আবদুল হাই ও

আবদুল খালেক (যশোর), ডা. মাজহার উদ্দিন আহমদ (রংপুর), ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও সৈয়দ আকবর আলী (পাবনা), রহিমুদ্দিন আহমদ (দিনাজপুর), মজিবর রহমান ও আকবর হোসেন আখন্দ (বগুড়া), জহুর আহমদ চৌধুরী ও আবদুল আজিজ (চট্টগ্রাম), আবদুর রহমান খান ও আবদুল বারী (কুমিল্লা), জসিমউদ্দিন আহমদ (সিলেট), সিরাজুদ্দিন আহমদ (নোয়াখালী), এস ডব্লিউ লকিতুল্লাহ ও আবদুল মালেক (বরিশাল), আবদুল হামিদ (ময়মনসিংহ), আছমত আলী খান (ফরিদপুর), খোদা বক্স (টাঙ্গাইল) ও শেখ আবদুল আজিজ (খুলনা)। ১৯৫৩ সালের অক্টোবরে অলি আহাদ আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালের ১ এপ্রিল কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় আবদুর রহমানকে দল থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং তাঁর জায়গায় অলি আহাদ প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পান।[২]

এ সময় এ কে ফজলুল হককে নিয়ে একটু নাটক হয়। তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদে চাকরি করতেন। পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছিলেন না। ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদ ছেড়ে দিয়ে মুসলিম লীগে যোগ দেন। মুসলিম লীগে তখন দলাদলি চরমে উঠেছে। নুরুল আমিনের বিরুদ্ধে মোহন মিয়া একটা উপদল তৈরি করে ফজলুল হককে মুসলিম লীগের সভাপতি করতে চেয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালের ৯ মে ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় মুসলিম লীগের দুই গ্রুপে মারামারি হয়। নুরুল আমিনের গ্রুপ জয়ী হয় এবং মোহন মিয়া তাঁর দলবলসহ বিতাড়িত হন। শেখ মুজিব তখন ফজলুল হককে আওয়ামী লীগে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। চাঁদপুরে এক জনসভায় তিনি যোগদান করলেনও। সভায় তিনি ঘোষণা দিলেন, 'যাঁরা চুরি করবেন তাঁরা মুসলিম লীগে থাকুন, আর যাঁরা ভালো কাজ করতে চান তাঁরা আওয়ামী লীগে যোগদান করুন।'[৩]

পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের পাঁচ বছরের মেয়াদ ১৯৫২ সালেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি নিশ্চিত হয়ে যায় যে শিগগিরই পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ফজলুল হক তার জন্য তৈরি হলেন। ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই তিনি কৃষক-শ্রমিক পার্টি (কেএসপি) গঠন করেন। এটা ছিল কৃষক-প্রজা পার্টিরই রূপান্তর। জমিদারি প্রথা উঠে যাওয়ার ফলে 'প্রজা' শব্দটি রাখার আর কোনো কারণ ছিল না। কৃষক-শ্রমিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক হলেন আবদুল লতিফ বিশ্বাস।[৪]

আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টি একসঙ্গে নির্বাচনী জোট বাঁধবে, এমন চিন্তাভাবনা করছিলেন কেউ কেউ। ফজলুল হককে

বলা হলো, তিনি পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে আওয়ামী লীগের নেতা হবেন, সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গণপরিষদের নেতা থাকবেন। কেউ কেউ ফজলুল হককে বোঝালেন, আলাদা দল করে যুক্তফ্রন্ট করলে সুবিধা হবে, আওয়ামী লীগে গেলে তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে না। মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিব যুক্তফ্রন্ট করার পক্ষে ছিলেন না। ভাসানী শেখ মুজিবকে বলেছিলেন, 'যদি হক সাহেব আওয়ামী লীগে আসেন, তবে তাঁকে গ্রহণ করা হবে এবং উপযুক্ত স্থান দেওয়া যেতে পারে। আর যদি অন্য দল করেন, তবে কিছুতেই তাঁর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করা চলবে না। যে লোকগুলো মুসলিম লীগ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, তারা এখন হক সাহেবের কাঁধে ভর করতে চেষ্টা করছে।'[৫]

এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৩ সালের ১৪-১৫ নভেম্বর ময়মনসিংহে আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল সভা বসে। সভায় সোহরাওয়ার্দীও উপস্থিত ছিলেন। শেখ মুজিবের শেষ প্রস্তাব ছিল, 'ইলেকশন এলায়েন্স করা যেতে পারে। যেখানে হক সাহেবের দলের ভালো লোক থাকবে, সেখানে আওয়ামী লীগ নমিনেশন দেবে না। আর যেখানে আওয়ামী লীগের ভালো লোক থাকবে, সেখানে তারা নমিনেশন দেবে না।'[৬]

শেখ মুজিবকে না জানিয়েই শেরেবাংলা ফজলুল হক ও মওলানা ভাসানী দস্তখত করে যুক্তফ্রন্ট করে ফেলেন। ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট তৈরি হয়।[৭] ফ্রন্টের প্রধান দুই শরিক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান কৃষক-শ্রমিক পার্টি ছাড়াও ফ্রন্টে পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল ও পাকিস্তান খেলাফতে রব্বানী পার্টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সোহরাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্টের সভাপতি মনোনীত হন। আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির কফিলউদ্দিন চৌধুরীকে যুগ্ম সম্পাদক এবং কামরুদ্দিন আহ্‌মদকে দপ্তর সম্পাদক করা হয়। ঢাকার ৫৬ নম্বর সিমসন রোডে যুক্তফ্রন্টের অফিস খোলা হয়। যুক্তফ্রন্টের পক্ষে একটা ২১ দফা কর্মসূচি তৈরি করেন আবুল মনসুর আহমদ। ২১ দফা রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন তিনি এভাবে :

> যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশ্‌তাহার রচনার ভার আমার ওপরই পড়ে। আমি ইতিপূর্বেই আওয়ামী লীগের ৪২ দফার একটি নির্বাচনী ইশ্‌তাহার রচনা করিয়াছিলাম। উহাকেই যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশ্‌তাহার করিবার কথা মওলানা সাহেব বলিলেন। কৃষক-প্রজা পার্টির নেতারা বলিলেন তাঁদের একমাত্র আপত্তি এই যে ঐ ইশ্‌তাহারে দফার সংখ্যা বড় বেশি। উহাকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া পঁচিশ-ত্রিশের মধ্যে আনিতে হইবে। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে ৪২ দফাকে কমাইয়া ২৮ দফা করিলেই তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। এরপর বিনা-বাধায় রচনা শেষ করার জন্য আমাকে একলা ঘরে বন্দী করা হইল।

আমি মুসাবিদায় হাত দিলাম। মুসাবিদা করিতে-করিতে হঠাৎ একটা ফন্দি আমার মাথায় ঢুকিল। এটাকে ইন্‌সপিরেশন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য শহীদ মিনার নির্মাণ, ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থান বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার সেবা-কেন্দ্র করার তিনটি দফা আওয়ামী লীগের ৪২ দফায়ও ছিল। এই তিনটি দফাকে যুক্তফ্রন্টের ইশ্‌তাহারের অন্তর্ভুক্ত করিতে কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতারা রাজি হইয়াছেন। সুতরাং তা হইবে। তা হইলে যুক্তফ্রন্টের মতেও ২১ শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব-বাংলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। কাজেই ২১ ফিগারটাকে কর্মসূচি করিলে কেমন হয়? ৪২ দফা কাটিয়া ২৮ দফা করা গেলে ২৮ দফাকে কাটিয়া ২১ দফা করা যাইবে না কেন? নিশ্চয় করা যাইবে। তাই করিলাম। অতঃপর আমার কাজ সহজ হইয়া গেল। ইতিহাস বিখ্যাত ২১ দফা রচনা হইয়া গেল।[৮]

২১ দফা কর্মসূচির ১৯ নম্বর দফায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের একটা পরিষ্কার রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল। এই দফায় বলা হয়:

লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌম করা হবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় পূর্ব বাংলার সরকারের হাতে আনা হবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করে পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হবে।

যুক্তফ্রন্টের সবচেয়ে বড় সম্পদ ছিল গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের মতো একটি সংগঠিত রাজনৈতিক দল। এ কে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী একটি অভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে প্রচারে নামার ফলে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে গণজোয়ার তৈরি হয়।

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সব সময় প্রচার করত, মুসলিম লীগের বিরোধিতা মানেই ইসলামের বিরোধিতা। কথায় কথায় তারা বলত, 'ইসলাম গেল, ইসলাম ডুবল।' এতে সাধারণ মানুষ অনেক সময় বিভ্রান্ত হতো। ১৯৫৩ সালের ১৩ নভেম্বর চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে এ কে ফজলুল হকের উপস্থিতিতে তাঁর অনুরোধে কেএসপি নেতা বি ডি হাবীবুল্লাহ তাঁর ভাষণে মুসলিম লীগের অপপ্রচারের জবাব দিতে গিয়ে একটি গল্প বলেন:

ইসলাম মোড়ল নদীতে পড়ে গিয়ে চিৎকার করতে লাগল—ইসলাম ডোবে, ইসলাম ডোবে। লোকজন তাকে পাড়ে তুলে বলল, তোমার কাছে

কোরআন-কেতাব আছে নাকি? নতুবা তোমার সঙ্গে ইসলাম ডোবে কী করে? লোকটা বলল, আমার নামই ইসলাম। এ গল্পে জনতা বুঝে গেল কেন মুসলিম লীগ 'ইসলাম ডুবল' বলে চিৎকার শুরু করেছে। জনতা আরও শুনতে চাইল।

আবার আমি বললাম, বার্ধক্য হেতু শিকার করতে অপারগ হয়ে বিড়াল এক ভণ্ড পীর সেজে বসে গেছে, কিন্তু ইঁদুর তবু তার ধারে আসে না। এখন সে কপট অশ্রুপাত করে বলতে লাগল, তোমরা কেন আমার কাছে আসো না? আমি যে নিরামিষ ধরেছি। দুনিয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে হজে যাব বলে মনস্থ করেছি। তোমাদের সঙ্গে করমর্দন করে পশ্চিমে রওনা হব।

এ কথায় ভুলে একটি বেকুব ইঁদুর কাছে এসে করমর্দনের চেষ্টা করতেই বিড়ালতপস্বী তাকে খপ করে কামড়ে ধরল।

বেচারা ইঁদুর একটা বুদ্ধি করে বাঁচার চেষ্টা করে বলল, ভাই, মরার আগে আমাকে আলহামদু, আরাইতাল্লাজি, আলামতারার যেকোনো একটা সুরা শোনাও। কারণ, ওর যেকোনো সুরা পড়তে গেলেই মুখ খুলতে হয় এবং তাহলে ইঁদুর ছুটে যায়। অতএব বিড়াল দাঁত খিঁচুনি দিয়ে পড়ল, 'কুলহু আল্লাহু আহাদ'—তখন ইঁদুরের প্রাণ শেষ। 'আল্লাহুচ্ছামাদ' বলে তাকে একদম গিলে ফেলল। অতএব লীগ মাথায় পাগড়ি বেঁধে যতই বলুক ধর্মের কথা, একবার খপ্পরে গেলে ওই ইঁদুর গেলার মতোই গিলবে।[৯]

৮-১২ মার্চ (১৯৫৪) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তফ্রন্ট 'নৌকা' প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়। ২৩৭টি মুসলমান আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা ২২৮টি আসনে জয়ী হন। আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৪৩টি, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ৪৮টি, নেজামে ইসলাম ২২টি, গণতন্ত্রী দল ১৩টি ও খেলাফতে রব্বানী পার্টি ২টি আসনে জয়ী হয়। ৭২টি সাধারণ (অমুসলিম) আসনে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস ২৫টি, তফসিলি ফেডারেশন ২৭টি, সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট ১৩টি, কমিউনিস্ট পার্টি ৪টি ও গণতন্ত্রী দল ৩টি আসন পায়।[১০]

কমিউনিস্ট পার্টি এ নির্বাচনে মুসলমান ও অমুসলমান মিলিয়ে ৮টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। এই আসনগুলোতে যুক্তফ্রন্ট কোনো প্রার্থী দেয়নি। নেজামে ইসলাম অবশ্য তিনটি মুসলমান আসনে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছিল। অমুসলমান পাঁচটি আসনে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ 'সংখ্যালঘু' প্রার্থী দাঁড় করায়। এ সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণেন্দু দস্তিদার, সুধাংশু বিমল দত্ত, বরুণ রায় ও অজয় বর্মণ—এই চারজন জয়ী হন। ইয়াকুব মিয়া, নগেন সরকার, জমিয়ত আলী ও আবদুল হক হেরে যান। এ ছাড়া আওয়ামী মুসলিম লীগ ও গণতন্ত্রী দলের টিকিটে কমিউনিস্ট পার্টির ১৬-১৭ জন যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন।[১১]

১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত সদস্যদের একটা সভা মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।[১২] সোহরাওয়ার্দীর উপস্থিতিতে এ সভায় ফজলুল হক সর্বসম্মতিক্রমে যুক্তফ্রন্টের সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় আরেকটি প্রস্তাবে পুরোনো প্রাদেশিক আইনসভার যেসব সদস্য নির্বাচনে হেরে গেছেন, কেন্দ্রীয় গণপরিষদ থেকে তাঁদের পদত্যাগ দাবি করা হয়।[১৩]

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ফজলুল হককে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মন্ত্রিসভায় যাঁদের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানও ছিলেন। ফজলুল হক শেখ মুজিবের ওপর নানা কারণে ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি তাঁকে মন্ত্রিসভায় নিতে অস্বীকার করেন। ফলে আওয়ামী লীগের কেউ প্রথমে মন্ত্রিসভায় যোগ দেননি। ৩ এপ্রিল তিনজনকে মন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত হয়। তাঁরা হলেন আশরাফ আলী চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার ও সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া)। নান্না মিয়া ছিলেন ফজলুল হকের ভাগনে। ১৫ এপ্রিল আওয়ামী লীগের পাঁচজন প্রতিনিধি নিয়ে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুস সালাম খান, শেখ মুজিবুর রহমান ও হাশিমুদ্দীন আহমদ।

এ কে ফজলুল হক সোহরাওয়ার্দীকে খুবই অপছন্দ করতেন। অখণ্ড বাংলার রাজনীতিতে তাঁরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীর খুব অনুগত ছিলেন এবং ফজলুল হকের প্রতি তাঁর তেমন সমীহ ছিল না বলে ফজলুল হক মনে করতেন। সোহরাওয়ার্দীর ব্যাপারে ফজলুল হকের মনোভাব কিছুটা আঁচ করা যায় প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকে। ১৯৬১ সালের ৯ ডিসেম্বর ফজলুল হকের জীবনীকার বি ডি হাবীবুল্লাহ তাঁর একটি পাণ্ডুলিপির জন্য আশীর্বাদ চাইতে গেলে ফজলুল হকের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতায় বিষয়টি উঠে আসে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বি ডি হাবীবুল্লাহ যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন। আলাপচারিতার সময় তাঁর ছেলে (পরবর্তী সময়ে সাংবাদিক) আমানউল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে আমানউল্লাহ দুজনের কথোপকথনটি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

হাবীবুল্লাহ : কেমন আছেন?
হক : না, ভালা না।
হাবীবুল্লাহ : ভালাই তো আছেন দেহি। খানটান কী?
হক : এই স্যুপ-টুপ এডা ওডা দেয়।
হাবীবুল্লাহ : ভালাই তো খান।
হক : হাতির কি কলাগাছ না অইলে চলে?

হাবীবুল্লাহ : আপনার অসুবিধাডা কী?

হক : আমি কিছু মনে রাখতে পারি না। এই ধরো, সোহরাওয়ার্দী যে অনেক অপকর্ম করছে, আমি এগুলা মনে রাখতে চাই, কিন্তু পারি না, ভুইল্যা যাই।

হাবীবুল্লাহ : এহন আর ওগুলা মনে রাইখ্যা লাভ অইবে কী?

হক : ঠিক কইছ।[১৪]

যুক্তফ্রন্ট গঠনের ব্যাপারে ফজলুল হকেরও আপত্তি ছিল বলে জানা যায়। তিনি শেখ মুজিবের ওপর নারাজ ছিলেন। কারণ, কিছুদিন আগে শেখ মুজিব তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলেন বলে তাঁর অভিযোগ ছিল। একদিন বি ডি হাবীবুল্লাহ ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ফজলুল হকের কে এম দাস লেনের বাসায় আলাপ করতে যান। তাঁদের সঙ্গে আমানউল্লাহ (বি ডি হাবীবুল্লাহর ছেলে) ছিলেন। তিনি ফজলুল হকের সাথে মানিক মিয়ার আলাপের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

> শেরেবাংলা বললেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনো জোট হবে না। সেদিন তাঁর কথার মাধ্যমে তাঁর যে প্রতিক্রিয়া দেখেছি, তাতে মনে হলো, এই বৃদ্ধ নেতা শেখ মুজিবের অতীতের কিছু আচরণের জন্য খুব ক্ষুব্ধ ছিলেন। মানিক মিয়া তাঁর রাগ থামানোর জন্য বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'শেখ মুজিবুর আমার লগে যে বেয়াদবি করছে, হে আর কী কমু।' অতীতের কোনো আচরণের অভিযোগে তাঁকে ইমোশনালি এক্সাইটেড মনে হচ্ছিল। মানিক মিয়া হক সাহেবের রাগ থামাতে বলেছিলেন, 'মুজিবুর তো আমনের (আপনার) পোলার মতো। আমনের নিজের পোলায় যদি কিছু করত, হেইলে আমনে কি হের উপর এ রহম রাগ অইতে পারতেন? আমনে কি আমনের পোলারে মাপ করতেন না?' মানিক মিয়ার এই কথার পর হক সাহেবের রাগ পড়ে গেল। তিনি বললেন, 'এহন যাও, দ্যাহো, হগলডি মিল্লা কী করতে পারো। তোমাগো মতো আমিও তো চাই হগলডি মিল্লা মুসলিম লীগরে এক্কেরে ডুবাইয়া দেই।' এ সময় হক সাহেবের ভাগনে কেএসপি নেতা আজিজুল হক নান্না মিয়া এবং আমার বাবা সেখানে ছিলেন। আমি তখন বিএম কলেজের ছাত্র। বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম তাঁর নেতার কাছে।[১৫]

যুক্তফ্রন্টের শরিকদের সঙ্গে সমঝোতার মূল্য দিতে গিয়ে অনেক আসনে আওয়ামী লীগকে তার দলের যোগ্য প্রার্থীকেও বসিয়ে রাখতে হয়েছিল। চট্টগ্রামের হালিশহরের একজন শক্তিশালী প্রার্থী ছিলেন আওয়ামী লীগের এম এ আজিজ। শহর আওয়ামী লীগের নেতা তোহফাতুননেসা জানিয়েছেন, ওই আসনে কেএসপির মাহমুদুন্নবী চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল।

শেরেবাংলা ফজলুল হকের তহবিলে বিশ হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে নবী চৌধুরী মনোনয়ন পেয়েছিলেন।[১৬]

বরিশালের কেএসপি নেতা বি ডি হাবীবুল্লাহর মন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল। নবী চৌধুরী ফজলুল হককে টাকা দিয়ে মন্ত্রী হয়ে যান। হাবীবুল্লাহ বাদ পড়েন।[১৭]

যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের আগে ও পরে কয়েকটি ঘটনা ঘটে, যার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অনেক। ২৩ মার্চ (১৯৫৪) চন্দ্রঘোনা কাগজের কলে বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়।[১৮] এ সময় ফজলুল হক চিকিৎসার জন্য কলকাতায় গিয়েছিলেন। ৪ মে (১৯৫৪) কলকাতায় এক সংবর্ধনা সভায় তিনি বলেন, রাজনৈতিক কারণে বাংলা ভাগ হয়েছে, কিন্তু বাঙালির শিক্ষা, সংস্কৃতি আর বাঙালিত্বকে কোনো শক্তিই কোনো দিন ভাগ করতে পারবে না; দুই বাংলার বাঙালি চিরকাল বাঙালিই থাকবে। *নিউইয়র্ক টাইমস*-এর সংবাদদাতা কালাহান ফজলুল হকের একটা সাক্ষাৎকার নেন এবং তাঁর প্রতিবেদনে ফজলুল হকের বক্তব্যে 'বিচ্ছিন্নতাবাদের' ইঙ্গিত দেন। এই সাক্ষাৎকার ছাপা হওয়ার পর রাজনৈতিক মহলে হইচই পড়ে যায়। গুজব ছড়িয়ে পড়ে, 'দেশদ্রোহী' ফজলুল হককে বরখাস্ত করে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন চালু করা হবে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য ফজলুল হক করাচি যান। সোহরাওয়ার্দীও কয়েকজন মন্ত্রীকে করাচিতে ডেকে পাঠান।[১৯] ফজলুল হকের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান, নান্না মিয়া, মোহন মিয়া ও আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী করাচি যান।[২০]

২৯ মে (১৯৫৪) ফজলুল হক, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান ও নান্না মিয়া করাচি থেকে রাতের প্লেনে রওনা হয়ে পরদিন ঢাকায় পৌঁছান।[২১] ৩০ মে বেলা তিনটায় শেখ মুজিব টেলিফোনে জানতে পারেন, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গণপরিষদে গৃহীত অস্থায়ী সংবিধানের ৯২(ক) ধারা প্রয়োগ করে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন জারি করেছে। কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা সচিব ইস্কান্দার মির্জাকে গভর্নর ও নিয়াজ মোহাম্মদ খানকে চিফ সেক্রেটারি নিয়োগ করা হয়েছে।[২২] সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করা হলো। শেখ মুজিবসহ পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের ৩৫ জন সদস্য এবং হাজারের ওপর লোক গ্রেপ্তার হন। এ কে ফজলুল হককে নিজের বাড়িতে অন্তরীণ করা হয়। পুলিশ যুক্তফ্রন্টের ৫৬ নম্বর সিমসন রোডের অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

৯২(ক) ধারা জারি করে প্রাদেশিক সরকার বাতিল করে দেওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে ৯২(ক)

ধারা প্রয়োগ করে সিন্ধুর আইনসভা বাতিল করা হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের শুরুতেই গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দিন পাঞ্জাবের প্রাদেশিক সরকার বাতিল করে গভর্নরের শাসন জারি করেছিলেন। কেন্দ্রে ও প্রদেশে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ও বিধিবিধানের তোয়াক্কা না করাটা ক্রমেই কেন্দ্রীয় সরকারের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।[২৩]

শেখ মুজিবের গ্রেপ্তারের কাহিনিটি বেশ মজার। তাঁর অনুপস্থিতিতে পুলিশ তাঁর বাড়িতে এসেছিল। তিনি তখন ফজলুল হক, আতাউর রহমান খান, নান্না মিয়া—সবার কাছে দৌড়াচ্ছেন এবং শেষে আওয়ামী লীগ অফিসে গিয়ে দরকারি কাগজপত্র সরিয়ে নেন। তারপর সরকারি গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রিকশায় চড়ে বাসায় ফেরেন। খাবার খেয়ে কাপড়-বিছানা প্রস্তুত করে তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইয়াহিয়া খান চৌধুরীকে ফোন করে বলেন, 'আমার বাড়িতে পুলিশ এসেছিল বোধ হয় আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য। আমি এখন ঘরেই আছি, গাড়ি পাঠিয়ে দেন।' এই পরিস্থিতিতে নেতাদের দোদুল্যমানতা ও কাপুরুষতা দেখে শেখ মুজিব বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হন। তাঁর অনুভূতি ছিল এ রকম :

> কী করা দরকার বা কী করতে হবে, এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করা উচিত হবে কি না, এ সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দ একদম চুপচাপ।
>
> একমাত্র আতাউর রহমান খান কয়েক দিন পরে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন। ৯২(ক) ধারা জারি হওয়ার কয়েক দিন পূর্বে মওলানা ভাসানী বিলেত গিয়েছেন। শহীদ সাহেব (সোহরাওয়ার্দী) অসুস্থ হয়ে জুরিখ হাসপাতালে, আমি তো কারাগারে বন্দী। নীতিহীন নেতা নিয়ে অগ্রসর হলে সাময়িকভাবে কিছু ফল পাওয়া যায়, কিন্তু সংগ্রামের সময় তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না। দেড় ডজন মন্ত্রীর মধ্যে আমিই একমাত্র কারাগারে বন্দী। যদি ৬ জুন সরকারের অন্যায় হুকুম অমান্য করে (হক সাহেব ছাড়া) অন্য মন্ত্রীরা গ্রেপ্তার হতেন, তাহলেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন শুরু হয়ে যেত। দুঃখের বিষয়, একটা লোকও প্রতিবাদ করল না।[২৪]

ফজলুল হক অন্তরীণ অবস্থায় ২৩ জুলাই (১৯৫৪) রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়ে একটি বিবৃতি দেন। ১১ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী জুরিখ থেকে করাচি ফিরে আসেন। তাঁর চেষ্টায় শেখ মুজিব ১৮ ডিসেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ছাড়া পান। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের বিরোধিতা সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দী ২০ ডিসেম্বর মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভায় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন।

যুক্তফ্রন্ট জোড়াতালি দিয়ে করা হয়েছিল। সাধারণ মানুষ যুক্তফ্রন্টের পেছনে এককাট্টা হলেও আওয়ামী মুসলিম লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির মধ্যে বৈরী সম্পর্কের কারণে যুক্তফ্রন্টের আয়ু ফুরিয়ে আসে।

আগে একটা সমঝোতা হয়েছিল যে কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দীকে কৃষক-শ্রমিক পার্টি সমর্থন দেবে এবং প্রদেশে আওয়ামী লীগ ফজলুল হককে সমর্থন দেবে। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ সোহরাওয়ার্দীকে বলেছিলেন, মোহাম্মদ আলীর সরকার একটা কেয়ারটেকার সরকার। শিগগিরই সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে। তবে এখন তাঁকে আইনমন্ত্রী হয়ে একটা সংবিধান দিতে হবে।[২৫] সোহরাওয়ার্দী নয় মাস মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৫ সালের আগস্টে তাঁকে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিতে হয়।[২৬]

দলের মধ্যে সোহরাওয়ার্দীর আচরণ ছিল একনায়কসুলভ। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির বর্ধিত সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি মোহাম্মদ আলীর অধীনে মন্ত্রী হয়েছিলেন। মন্ত্রী হওয়ার পর একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগ আবার কী? আমিই আওয়ামী লীগ।' সাংবাদিক আবার প্রশ্ন করেন, 'এটা কি আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোবিরোধী না?' জবাবে সোহরাওয়ার্দী বলেন, 'আমিই আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো।'[২৭]

১৯৫৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করতে করাচি যান। এ সময় ফজলুল হকও পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। লাহোরে একজন সাংবাদিককে তিনি বলেছিলেন, সোহরাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্টের কেউ নন, তিনিই (ফজলুল হক) নেতা। এটা শুনে শেখ মুজিব খুবই ক্ষুব্ধ হন। সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে পরামর্শ করে শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে আসেন। শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খান ও মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ যুক্তফ্রন্টের সংসদীয় দলের নেতা ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনাস্থা জানানোর উদ্যোগ নেন। ১৯৫৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক আইন পরিষদে শেখ মুজিব অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের অনেকেই এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিলেন। ক্ষুব্ধ হয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের ৩৫ জন পরিষদ সদস্য ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টিতে যোগ দেন। মানিক মিয়া ও আবুল মনসুর আহমদও অনাস্থা দেওয়ার বিরোধিতা করেছিলেন। দলের সভাপতি মওলানা ভাসানী তখন কলকাতায়। অনাস্থা দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৫) প্রাদেশিক আইন পরিষদের স্পিকার ফজলুল হকের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবটি ভোটে দেন। ১১৯-১০৫ ভোটে প্রস্তাবটি খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী-ফজলুল হক দ্বন্দ্বের কারণে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়। কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি ও গণতন্ত্রী দল ফজলুল হকের সঙ্গে থাকে। আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের ২০ জন পরিষদ সদস্যের একটি গ্রুপ ফজলুল হকের

নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টে থেকে যায়। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের বৃহত্তর অংশটি প্রাদেশিক পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে সংগঠিত হয়।[২৮]

যুক্তফ্রন্ট ভাঙার পেছনে শেখ মুজিবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে ফজলুল হক মনে করতেন। ১৯৫৪ সালে গোপালগঞ্জে নির্বাচনী লড়াইয়ের কথা স্মরণ করে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর সহকর্মী বি ডি হাবীবুল্লাহর নিচের উদ্ধৃতিতে এই আক্ষেপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

> যখন দুর্ধর্ষ ওয়াহিদুজ্জামানের সঙ্গে আওয়ামী দলের সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান দুরন্ত ভোট সংগ্রামে লিপ্ত, তখন বাঁশবাড়ীর সভায় শেরেবাংলা বললেন, 'আওয়ামী-কৃষক-নেজামে সব এক। মুজিবুর রহমানকে ভোট দিলেও আমি পাব।' আর মুজিবুর রহমানই যুক্তফ্রন্ট ভেঙে চৌচির করে দিয়েছিল।[২৯]

যুক্তফ্রন্ট ও শেরেবাংলা ফজলুল হক সম্পর্কে আওয়ামী লীগের মনোভাব পরিষ্কার বোঝা যায় ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া বার্ষিক রিপোর্টে। যুক্তফ্রন্টের ইতিহাস এবং এ সম্পর্কে আওয়ামী লীগের তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন :

> ...পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রিত্বের গদিকে নিষ্কণ্টক করবার জন্যে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের তদানীন্তন সদস্য জনাব ফজলুল হককে পূর্ব বাংলা সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেলের চাকরি দিয়ে তাহার পরিষদ সদস্য পদের ইস্তেফাপত্র গ্রহণ করা হলো। তারপর হতেই জনাব ফজলুল হক সুদীর্ঘকাল মুসলিম লীগ কর্তৃক নিযুক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবে অত্যাচারী মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক প্রতিটি অত্যাচার ও অন্যায়কে সমর্থন দিতে গিয়ে আমাদের আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের প্রতি অন্যায় গ্রেফতারাদেশ হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পস মামলায় ন্যায় ও আইনত বলে প্রমাণ করবার কোশেশ করেছেন। এরূপে পরোক্ষভাবে তিনি নির্বাচনের পূর্বে তাহার পদত্যাগ পর্যন্ত জুলুম শাহীর প্রতিটি কার্যকে আইনের গণ্ডীর ভিতর দিয়ে সমর্থন জুগিয়েছেন। যখন মুসলিম লীগের সরকার গণদাবির চাপে পূর্ববঙ্গ আইন সভার নির্বাচন ঘোষণা করলো, তখন তিনি অ্যাডভোকেট জেনারেলের চাকরি ছেড়ে রাতারাতি দেশপ্রেমিক বনে, তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে শুরু করলেন। সরলপ্রাণ জনসাধারণ হক সাহেবের এই রাজনৈতিক চাতুর্যপূর্ণ বিবৃতি দেখে ও শুনে কিছুটা বিভ্রান্ত হলো। ফল দাঁড়ালো এই যে তিনি যেখানেই সভা করতেন, সেখানেই বিপুল জনসমাবেশ হতো। এর কারণস্বরূপ এ কথা বলা যায় যে, সুদীর্ঘ এগারো বছর পরে তিনি যখন রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হলেন এবং সস্তা জনপ্রিয় বুলি আওড়াতে শুরু করলেন, তখন জনসাধারণ ভেবে নিল যে তিনি তাঁর এই জীবন সায়াহ্নে

জনগণের খেদমত করতে করতে জীবনের বাকি কটি দিন বোধ হয় কাটিয়ে দিতে চান। হক সাহেবের সস্তা জনপ্রিয় উক্তিসমূহের জন্যে তাঁকে সর্ববৃহৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে করে জনগণ হক-ভাসানীর মিলন দাবি জানালো।...

...নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়ার ব্যাপারে যে কিভাবে টাকার ছড়াছড়ি হয়েছিল সে ঘৃণ্য ও কুৎসিত ইতিহাস আমি আলোচনা করতে লজ্জাবোধ করছি।...জনাব হক যখন বরিশাল জেলায় নির্বাচনী প্রচার উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকা সফর করছিলেন, তখন তদানীন্তন পাকিস্তান মুসলিম লীগ সভাপতি ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মি. মোহাম্মদ আলীর গোপন আমন্ত্রণ পেয়ে বরিশাল জেলার নির্বাচনী সফরসূচি বাতিল করে তিনি রাজধানী ঢাকার বুকে ফিরে এলেন এবং মি. মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন যে, জনাব হক উত্তরবঙ্গে কোনো নির্বাচনী প্রচার চালাবেন না এবং হক সাহেবের দলের যে কয়জন লোক নির্বাচনে জয়ী হবে তাদের নিয়ে জনাব হক মুসলিম লীগের বিজয়ী প্রার্থীদের সাথে মিলিতভাবে পূর্ব বাংলায় কোয়ালিশন সরকার কায়েম করবেন। জনাব হকের এই ঘৃণ্য গোপন চুক্তির কথা প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের মুখপত্র দৈনিক *ডন* কাগজের মারফতে আপনারা অনেকেই হয়তো জানতে পেরেছেন।...জনাব হক এগারো বছর পর্যন্ত জনগণের সঙ্গে থেকে দূরে থাকার ফলে এ কথা ভাবতে পারেননি যে যুক্তফ্রন্ট পার্টি এইরূপ ঐতিহাসিক বিজয়ের অধিকারী হবে, এবং তিনি তা ভাবতে পারেননি বলেই মি. মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে এরূপ এক গোপন আঁতাত করতে পেরেছিলেন।...

সব চাইতে বেশি মূল্য দিতে হলো আওয়ামী লীগকে। আওয়ামী লীগের প্রায় বারশত কর্মী ও নেতা এবং প্রায় তিরিশজন সদস্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলো।...এই সময়ে জনতা জনাব হকের নেতৃত্বের প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়েছিল, কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে...তিনি সবকিছু ভুলে গিয়ে মি. মোহাম্মদ আলীর প্রেরিত দূতের মারফতে এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ব্যক্তি স্বার্থপরতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে...সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণের ললাটে কলঙ্ক লেপন করে রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ করলেন।...[৩০]

১৯৫৫ সালের ২৮ মে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ গণপরিষদ অধ্যাদেশ জারি করেন। এই আদেশের বলে পাকিস্তানের দুই অংশ থেকে ৪০ জন করে মোট ৮০ জন সদস্য রাখার বিধান করা হয়। ৩১ মে পাঞ্জাবের মারিতে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের ভোটে কেন্দ্রীয় গণপরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হন। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সংরক্ষিত ৪০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের আতাউর রহমান খান-শেখ মুজিব গ্রুপের ১৩ জন, আবদুস সালাম খান গ্রুপের ২ জন, কৃষক-শ্রমিক পার্টির ১০ জন, নেজামে ইসলাম পার্টির ২ জন ও গণতন্ত্রী দলের ২ জন নির্বাচিত হন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে কেন্দ্রীয় গণপরিষদে

মনোনীতি কমিউনিস্ট পার্টির একমাত্র সদস্য ছিলেন সরদার ফজলুল করিম। তিনি আওয়ামী লীগের টিকিটে পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী মুসলিম লীগ থেকে এবং ফজলুর রহমান স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। অমুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসনের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেস ৪টি, তফসিলি ফেডারেশন ৩টি এবং ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি ২টি আসন পায়।[৩১]

১৯৫৫ সালের ২ জুন গভীর রাতে পূর্ব বাংলা থেকে ৯২(ক) ধারা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া হয়। ৬ জুন ফজলুল হকের নির্দেশে কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে প্রাদেশিক সরকার গঠিত হয়। ৮ জুন সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে সোহরাওয়ার্দী বলেন, 'আওয়ামী মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলায় শেরেবাংলা সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করবে এবং এই সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলবে। শেরেবাংলা এক মুখে অনেক কথা বলছেন।' ৫ আগস্ট স্পিকার পদে কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবদুল হাকিম আওয়ামী মুসলিম লীগের মশিউর রহমানকে (যশোর) ১৭০-৯২ ভোটে হারিয়ে দেন। ডেপুটি স্পিকার পদে আওয়ামী লীগের বেগম বদরুন্নেসাকে ১৭১-৯৯ ভোটে হারান যুক্তফ্রন্টের শাহেদ আলী পাটোয়ারী।[৩২]

কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোর খসড়া তৈরি করা, যার ভিত্তিতে সংবিধান তৈরি হবে। একটি সংবিধানের জন্য সোহরাওয়ার্দী যেকোনো ধরনের আপস করতে রাজি ছিলেন। অনেক বিতর্কিত বিষয়ে দর-কষাকষির পর একটা পাঁচ দফা নীতিমালার ব্যাপারে গণপরিষদে ঐকমত্য হয়। এই পাঁচটি নীতি ছিল :

১) পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি ইউনিট করা;
২) দেশের দুই অংশের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন;
৩) দুই অংশের মধ্যে সব বিষয়ে সমতা, যেমন : বৈদেশিক সাহায্য, চাকরি, উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ;
৪) যুক্ত নির্বাচন-পদ্ধতি;
৫) বাংলা ও উর্দু দুটোকেই রাষ্ট্রভাষা করা।

পূর্ব বাংলা দেশের ৫৬ শতাংশ মানুষের আবাসভূমি হওয়া সত্ত্বেও সমতার নীতিটি মেনে নেওয়ার ব্যাপারে অনেকেরই আপত্তি ছিল। সোহরাওয়ার্দী পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের তাঁদের আন্তরিকতা দেখানোর একটা সুযোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫৫ সালের জুলাইয়ের মাঝামাঝি সব দলের নেতারা এই নীতিমালার ব্যাপারে সম্মতি দেন। পূর্ব বাংলার পক্ষে আতাউর রহমান খান ও আবুল মনসুর আহমদ সই দেন। ফজলুল হকও পরে স্বাক্ষর করেছিলেন।[৩৩]

সিন্ধু, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানকে এক করে পশ্চিম পাকিস্তান নাম দিয়ে একটি প্রদেশ এবং পূর্ব বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান নাম দিয়ে আরেকটি প্রদেশ হবে বলে আলোচনা চলছিল। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লোভে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের আস্থা লাভের জন্য সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলার স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে 'সংখ্যাসাম্য' নীতি চাপিয়ে দিয়েছিলেন বলে সমালোচিত হন। সমতার নীতি ও পশ্চিম পাকিস্তানকে এক ইউনিট হিসেবে গণ্য করার বিষয়টা শেখ মুজিবের পছন্দ হয়নি। পূর্ব বাংলা নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান রাখার ব্যাপারেও তাঁর আপত্তি ছিল। ১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদে দেওয়া ভাষণে স্পিকারের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন :

> মহোদয়, আপনি দেখবেন যে 'পূর্ব বাংলা' নামের বদলে তারা 'পূর্ব পাকিস্তান' বসাতে চায়। আমরা কতবার দাবি জানিয়েছি যে এটা হবে বাংলা। বাংলার একটা ইতিহাস আছে, এর নিজস্ব ঐতিহ্য আছে। জনগণের সঙ্গে আলোচনা করেই কেবল এটা বদলানো যায়। যদি আপনারা এটা পরিবর্তন করতে চান, তাহলে আমরা বাংলায় ফিরে যাব এবং মানুষকে বলব তারা এটা গ্রহণ করবে কি না।[৩৪]

শেখ মুজিবের কথায় স্ববিরোধিতা লক্ষ করা যায়। একদিকে তিনি 'পূর্ব বাংলা' নামটি প্রদেশের জন্য বহাল রাখতে চাচ্ছেন, অন্যদিকে তাঁর দল জন্ম থেকেই 'পূর্ব পাকিস্তান' নামটি ব্যবহার করে আসছে। আওয়ামী লীগের নামের আগে পূর্ব পাকিস্তানের বদলে পূর্ব বাংলা রাখা নিয়ে তেমন কোনো জোরালো বক্তব্য কেউ কখনো দিয়েছিলেন বলে জানা যায় না।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে নিত্যনতুন নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছিল। অসুস্থতার অজুহাতে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদকে ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে ছুটিতে যেতে বাধ্য করা হয়। ভারপ্রাপ্ত গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব নেন ইস্কান্দার মির্জা। ছুটিতে থাকা অবস্থাতেই গোলাম মোহাম্মদের মৃত্যু হয়। ইস্কান্দার মির্জা পাকাপাকিভাবে ক্ষমতায় বসে যান। তিনি মোহাম্মদ আলীকে সরিয়ে পাঞ্জাবের চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। এর আগে সোহরাওয়ার্দীকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে। মির্জা কথা রাখেননি। এ ব্যাপারে জেনারেল আইয়ুব খানের হাত ছিল। রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ নেওয়ার জন্য সোহরাওয়ার্দী আইয়ুব খানের কোপানলে পড়েছিলেন। এ ছাড়াও একটি কারণ ছিল। মির্জা গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই এ কে ফজলুল হক ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'মির্জা একজন বাঙালি, যদিও তাঁর গায়ে রাজরক্ত।' মির্জা মুর্শিদাবাদের নবাব মীর জাফরের বংশধর ছিলেন। যেহেতু তিনি বাঙালি, তাই

প্রধানমন্ত্রী হতে হবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। এই বিবেচনায় চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে নিয়োগ দেওয়া হলো। ফজলুল হক মির্জাকে দেওয়া বাঙালিত্বের প্রত্যয়নপত্রের জন্য পুরস্কৃত হলেন। মির্জা তাঁকে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন।[৩৫]

১৯৫৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের গণপরিষদে এক ইউনিট আইন পাস হয়। ফলে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান—এই চারটি প্রদেশ একীভূত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান নামে একটি প্রদেশ তৈরি হয়। সরকারি গেজেট অনুযায়ী 'পশ্চিম পাকিস্তান' প্রদেশের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৪ অক্টোবর (১৯৫৫)।[৩৬]

পূর্ব বাংলা আনুষ্ঠানিকভাবে হলো পূর্ব পাকিস্তান। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর এই প্রদেশের নেতারা দুটো কাজ করলেন। প্রথমত তাঁরা পশ্চিমের বিচ্ছিন্ন চারটি প্রদেশকে একীভূত করে তাকে প্রবল প্রতিপক্ষ হওয়ার সুযোগ করে দিলেন। দ্বিতীয়ত, সংখ্যাসাম্য নীতি মেনে নিয়ে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের মৌলিক উপাদানটি বিসর্জন দিলেন। এটা হলো গাছের ডালে বসে নিজের হাতেই ডালটা কেটে দেওয়া। বাঙালির স্বার্থবিরোধী এই অপকর্মটি হলো সোহরাওয়ার্দীর উৎসাহে ও সমর্থনে। এ জন্য বাঙালিকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে।

ভাঙাগড়া

মওলানা ভাসানী ১৯৫৪ সালে সুইডেনের স্টকহোমে একটি শান্তি সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পর বেশ কিছুদিন লন্ডনে ছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, দেশে ফিরলে তাঁকে হয়রানি করা হবে, এমনকি তাঁকে মেরে ফেলা হতে পারে। ১৯৫৫ সালের ৫ জানুয়ারি তিনি কলকাতায় পৌঁছে টাওয়ার হোটেলে ওঠেন। সেখান থেকে তিনি দলের কাউন্সিল ডেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাগাদা দিতে থাকেন। এর মধ্যে অন্যতম বিষয় ছিল আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িক দলে রূপান্তরিত করা। তাঁর মনে হয়েছিল, কাউন্সিল সভা ডাকা নিয়ে টালবাহানা হচ্ছে। ১৫ এপ্রিল (১৯৫৫) দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানকে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি বিষয়টি উল্লেখ করেন। চিঠিটি নিচে উদ্ধৃত করা হলো :

টাওয়ার হোটেল
কলকাতা
১৫.৪.৫৫
প্রিয় মজিবর রহমান,

আমার দোয়া, ছালাম সকলে গ্রহণ করিও। আগামী ১১ই, ১২ই জুন ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা ডাকিবে। আমি ইনশা আল্লাহ ১০ই জুন ঢাকায় পৌঁছিব। এই সময়ের মধ্যে সমস্ত জেলা মহকুমায় ইউনিয়ন সমিতি গঠনের কাজ শেষ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। কোন অবস্থাতেই উক্ত তারিখ পিছান না হয়। সরকার আমার উপর যে ভাবই পোষণ করুক না কেন আমি আল্লাহ ভরসা করিয়া উক্ত তারিখে দেশে উপস্থিত হইবই হইব। সভার এজেন্ডা থাকিবে

১) নতুন কর্মকর্তা নির্বাচন
২) আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়ীক করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৩) ২১ দফা দাবী কার্যকরী করিবার উপায় নির্ধারণ
৪) বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি
৫) বিবিধ

শেখ মুজিবকে লেখা মওলানা ভাসানীর চিঠি, ১৫ এপ্রিল ১৯৫৫। সূত্র : আহাদ

যদি আরও দফা দেওয়া সাব্যস্ত মনে কর তাহা দিও। আওয়ামী লীগকে যদি বাঁচাইতে চাও এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থ আদায় করিতে চাও তাহা হইলে কালবিলম্ব না করিয়া আমার নির্দেশ মোতাবেক মিটিং ডাকিতে কোন প্রকার ত্রুটি করিও না। আমি তোমাকে এবং আতাউর রহমান সাহেব ও অন্যান্য সকল ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বারদের পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থের জন্য আমার নির্দেশ মানিতে অনুরোধ জানাইতেছি। অন্যথায় আওয়ামী লীগ ধ্বংস হইবে। পূ. পাক আওয়ামী লীগ ধ্বংস হইলে আর নূতন কোন সংগঠন গড়া

মোটেই সম্ভব হইবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ শহীদ সাহেবের পকেটেই আছে কোনো কাজকর্ম নাই ভবিষ্যতেও কিছু আশা নাই। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগই এ রকম প্রতিষ্ঠান ছিল, যাহা দ্বারা শহীদ সাহেবের ইজ্জত এবং গোটা পাকিস্তানের ইজ্জত রক্ষা হইত। বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে যদি তোমরা কাউন্সিলের মিটিং উক্ত তারিখে না ডাক তাহা হইলে আমি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়া নিজেই মিটিং ডাকিতে বাধ্য হইব।

খোদা হাফেজ।

মো. আবদুল হামিদ খান ভাসানী।[১]

সোহরাওয়ার্দীর চেষ্টায় পাকিস্তান সরকার ভাসানীর ওপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার পর ভাসানী ২৫ এপ্রিল (১৯৫৫) ঢাকায় আসেন।[২]

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের সূচনা হয় ১৯৫৪ সালের পাকিস্তান-মার্কিন সামরিক সহযোগিতা চুক্তির মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ভীষণ। ১৯ মে (১৯৫৪) করাচিতে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাফরুল্লাহ খান এবং যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স কেনেথ ইমারসন দুই দেশের মধ্যে 'মিউচুয়াল ডিফেন্স এগ্রিমেন্ট' নামে একটি সামরিক সহযোগিতা চুক্তি সই করেন।[৩] এই চুক্তির আওতায় মার্কিন বিমানবাহিনী পেশোয়ার শহরের চার মাইল দক্ষিণে বাদাবের নামক স্থানে একটা গোপন ঘাঁটি বানানো শুরু করে। এই ঘাঁটি থেকে মার্কিন গোয়েন্দা বিমান সোভিয়েত ইউনিয়নের পরমাণু কর্মসূচির ওপর নজরদারি করত। এই ঘাঁটিতে কোনো পাকিস্তানির প্রবেশাধিকার ছিল না।[৪]

৮ সেপ্টেম্বর (১৯৫৪) ম্যানিলায় এক সম্মেলনে পাকিস্তান, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সাউথ-ইস্ট এশিয়া ট্রিটি অর্গানাইজেশন (SEATO) গঠন করে। এটা ছিল একটি বহুপক্ষীয় সামরিক চুক্তি। ১৯৫৫ সালের ১ জুলাই বাগদাদে পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন (CENTO) নামে আরেকটি সামরিক জোট গঠন করে। প্রথমে এর নাম ছিল 'বাগদাদ প্যাক্ট'। পরে ইরাকে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ব্রিগেডিয়ার আবদাল করিম কাসেম রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে বাগদাদ চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলে এই চুক্তির নাম CENTO করা হয় এবং জোটের সদর দপ্তর বাগদাদ থেকে আঙ্কারায় নিয়ে যাওয়া হয়। এসব চুক্তি ও জোটে যোগ দিয়ে পাকিস্তান তার জোটনিরপেক্ষ চরিত্র হারায় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক রণকৌশলের ছাতার তলায় আশ্রয় নেয়।[৫]

১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর ঢাকার সদরঘাটে রূপমহল সিনেমা হলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ কাউন্সিলে দুটো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। দলের নাম থেকে

'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' রাখা হয়। 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়ার ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দীর প্রবল আপত্তি ছিল। কিন্তু মওলানা ভাসানী দলকে অসাম্প্রদায়িক করার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর গোঁড়া সমর্থক বলে পরিচিত শেখ মুজিবের জন্য ব্যাপারটা ছিল খুবই বিব্রতকর। অনেক আলাপ-আলোচনার পর সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে, ২২ অক্টোবর, সোহরাওয়ার্দী তাঁর আপত্তি তুলে নেন। শেখ মুজিব এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে অলি আহাদ লিখেছিলেন, 'কোনো রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী মতান্তর ও মনান্তর নিরসনে শেখ মুজিবুর রহমানই ছিলেন একমাত্র সেতুবন্ধ।'[৬] দলের বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করার সময় এ প্রসঙ্গে দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন :

> এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিরাজমান পরিস্থিতির প্রয়োজনে যখন আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়, তখন আমাদের সংগঠনটিকে একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠনের রূপ দিতে হয়েছিল। পাকিস্তানি জনগণের ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে মুসলিম লীগ ইসলামকে তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে স্বীয় ভূমিকা পালন অব্যাহত রাখে। এ ছাড়া মুসলিম লীগ যে বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে, তা থেকে জনগণ তখনো সম্পূর্ণরূপে নিজেদের মুক্ত করতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে যদিও আমাদের সংগঠনটিকে ধর্মনিরপেক্ষতার রূপ দেওয়া সম্ভব ছিল, তথাপি তা মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাবকে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হতো।[৭]

দলের নামটি অসাম্প্রদায়িক করার ব্যাপারে সবাই একমত ছিলেন না। এ ব্যাপারে ভাসানী সবার মতামত জানতে চান। উপস্থিত কাউন্সিলররা দুহাত তুলে স্লোগান দিয়ে প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। তখন রংপুরের আহমদ আলী মোক্তার ও খুলনার জনৈক কর্মী চেঁচিয়ে বলেছিলেন, 'আমরা মুসলিম কাটা আওয়ামী লীগে থাকব না।'[৮]

সম্মেলনে মওলানা ভাসানী ২১ দফা বাস্তবায়নে ব্যর্থতার জন্য কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের লেজুড়বৃত্তির অভিযোগ আনেন। তিনি পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্র সামরিক সহযোগিতা চুক্তিরও সমালোচনা করেন। এ ব্যাপারে তিনি দলীয় সমর্থন প্রায় পুরোপুরি পেয়েছিলেন। কাউন্সিল অধিবেশনে এ সম্পর্কে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাবে বলা হয় :

> পাকিস্তান সরকার গত কয়েক বছর পাকিস্তান-মার্কিন সামরিক চুক্তি, বাগদাদ চুক্তি, সিয়াটো চুক্তি প্রভৃতি এমন সকল চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে, যে সকল চুক্তির দ্বারা দেশের সার্বভৌমত্ব এবং দেশের অর্থনৈতিক, ব্যবসাগত ও বাণিজ্যিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হইয়াছে।[৯]

এই কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আবারও নির্বাচিত হন। অন্যান্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তিরা হলেন আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ ও খয়রাত হোসেন (সহসভাপতি), অলি আহাদ (সাংগঠনিক সম্পাদক), অধ্যাপক আবদুল হাই (প্রচার সম্পাদক), আবদুস সামাদ (শ্রম সম্পাদক), তাজউদ্দীন আহমদ (সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক), সেলিনা বানু (মহিলা সম্পাদক), মুহম্মদুল্লাহ (দপ্তর সম্পাদক) ও ইয়ার মোহাম্মদ খান (কোষাধ্যক্ষ)। কার্যনির্বাহী কমিটিতে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ২৫ জন সদস্যের মধ্যে ছিলেন জহুর আহমদ চৌধুরী, আবদুল আজিজ ও অধ্যাপক আসহাবউদ্দিন আহম্মদ (চট্টগ্রাম), আবদুল জব্বার খদ্দর (নোয়াখালী), আবদুল বারী (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া ও মাওলানা আলতাফ হোসেন (ময়মনসিংহ), হাতেম আলী খান (টাঙ্গাইল), আবদুল হামিদ চৌধুরী (ফরিদপুর), সৈয়দ আকবর আলী (সিরাজগঞ্জ), শেখ আবদুল আজিজ ও মোমিনউদ্দিন আহমদ (খুলনা), মশিউর রহমান (যশোর), সাদ আহমদ (কুষ্টিয়া), তহুর আহমদ চৌধুরী (রাজশাহী), কাজী গোলাম মাহবুব ও আমিনুল হক চৌধুরী (বরিশাল), ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও আমজাদ হোসেন (পাবনা), ডা. মজহার উদ্দিন আহমদ (রংপুর), রহিমউদ্দিন আহমদ (দিনাজপুর), আকবর হোসেন আখন্দ (বগুড়া), দবিরউদ্দিন আহমদ (নীলফামারী), পীর হাবিবুর রহমান (সিলেট) ও কামরুদ্দিন আহ্মদ (ঢাকা)।[১০] পুরোনো কমিটি থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবদুস সালাম খান। অন্যদিকে তাজউদ্দীন আহমদ প্রথমবারের মতো নির্বাহী কমিটিতে জায়গা পেলেন।

পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদের তৈরি খসড়া সংবিধান পূর্ব বাংলার মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। সংবিধানে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও যুক্ত নির্বাচনের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ১৯৫৬ সালের ১৬ মার্চ 'দাবি দিবস' পালনের ঘোষণা দেয়। পল্টন ময়দানে জনসভা ডাকা হয়। একই দিন মোহাজের নেতা মাওলানা রাগিব আহসান পল্টনে জনসভা ডাকেন। গোলমাল এড়ানোর জন্য শেখ মুজিব ও অলি আহাদ রাগিব আহসানের বাসায় যান এবং একটা সমঝোতা করেন। সমঝোতা অনুযায়ী রাগিব আহসান বিকেল চারটা পর্যন্ত সভা করবেন এবং এরপর আওয়ামী লীগের সভা হবে। কিন্তু সাড়ে চারটা বেজে যাওয়ার পরও রাগিব আহসানের সভা শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। এর পরের ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন অলি আহাদ :

> আমাদের অনুরোধে কর্ণপাত না করায় আওয়ামী লীগের কর্মী ও জনগণের ধৈর্যচ্যুতি দেখা দিল। সভামঞ্চে দাঁড়াইয়া আমাদের একনিষ্ঠ তরুণ কর্মী

মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম 'মাইক্রোফোন টেস্টিং' বলা মাত্র মোহাজের সমাবেশের একাংশ ক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে ও সভামঞ্চ তছনছ করিয়া ফেলে। লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়া যাইবার কিছুক্ষণের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াই হতভম্ব হইয়া পড়িলেন বটে, তবে ক্ষণিকের মধ্যেই স্বীয় কর্তব্য স্থির করিয়া নিজ হাতে একটি লাঠি ও আমার হাতে একটি লাঠি দিয়া রণক্ষেত্রের দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে রওয়ানা হইলেন। আমাদের সহকর্মীরা তখনো এদিক-ওদিক অর্থাৎ নিরাপদ দূরত্ব হইতে উঁকি-ঝুঁকি মারতেছিলেন। সভাস্থলে আমাদের পদার্পণমাত্র জনতা চতুর্দিক হইতে সভামঞ্চের দিকে ধাবিত হইলো এবং নিমেষের মধ্যে নিজেদের উদ্যোগে সভামঞ্চ পুনরায় নির্মাণ করিয়া ফেলিল।[১১]

এ ঘটনা থেকে শেখ মুজিবের চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তিনি ছিলেন উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন, অত্যন্ত সাহসী ও একরোখা। অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতি তাঁকে সামাল দিতে হতো।

পূর্ব পাকিস্তানের নেতা এ কে ফজলুল হক ও আতাউর রহমান খানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এ সময় গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ঢাকায় আসেন। তাঁর নজর কাড়ার জন্য এ দুই বাঙালি নেতার একটা লজ্জাজনক ভূমিকা দেখা যায়। গভর্নর জেনারেলকে ঢাকা বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে দুজনই হাজির হয়েছিলেন এবং তাঁরা ফুলের মালা হাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গভর্নর জেনারেল অবশ্য দুজনকেই পুরস্কৃত করেছিলেন। পরে ফজলুল হক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও গভর্নর হয়েছিলেন এবং অন্যজন হয়েছিলের মুখ্যমন্ত্রী।[১২]

১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানে নতুন সংবিধান চালু হলো। 'পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের' যাত্রা শুরু হলো। সংবিধানে উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হলেন ইস্কান্দার মির্জা। এর আগেই ৯ মার্চ (১৯৫৬) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফজলুল হককে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছিল। ২৩ মার্চ প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে গভর্নর হাউসে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হলো। আওয়ামী লীগ এই অনুষ্ঠান বয়কট করেছিল।[১৩]

নতুন সংবিধান চালু হওয়ার পর পূর্ব বাংলা আনুষ্ঠানিকভাবে হয়ে গেল পূর্ব পাকিস্তান। মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিলেন। এসবের মধ্যে ছিল একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটি ঘোষণা, ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতি রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার স্থাপন, রাজবন্দীদের মুক্তি, জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের লক্ষ্যে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া, বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা, বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন পয়লা বৈশাখ সরকারি ছুটি ঘোষণা ইত্যাদি।

এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র খাদ্যসংকট দেখা দেয়। ১৬ মে (১৯৫৬) ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে এক জনসভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, 'দলের সভাপতি মওলানা ভাসানী দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে খাদ্য আমদানির জন্য টাকা বরাদ্দের দাবিতে অনশন ধর্মঘট করছেন। যদি তাঁর কিছু হয়, তাহলে বাংলায় আগুন জ্বলবে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারকে সে দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে।' ১৯-২০ মে (১৯৫৬) ঢাকার নবাবপুর রোডে মুকুল সিনেমা হলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় খাদ্যসংকট মোকাবিলায় 'সর্বদলীয় খাদ্য আন্দোলন কমিটি' গঠনের প্রস্তাব উঠলে শেখ মুজিবের বিরোধিতার কারণে তা নাকচ হয়ে যায়। তাঁর বক্তব্য ছিল :

> কোনো অবস্থাতেই আওয়ামী লীগ খাদ্যসংকট কেন, কোনো সংকটেই সর্বদলীয় জোট গঠন করে সংগ্রামে যাবে না। আওয়ামী লীগ একা চলবে। অবশ্যই আদর্শ ও নীতির ক্ষেত্রে জোট বাঁধা চলে। কিন্তু মৌলিক নীতিগত পার্থক্য থাকলে জোট গঠন বরং দলের জন্য অভিশাপ ডেকে আনে। যুক্তফ্রন্ট গঠন করে আমরা চরম অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।[১৪]

এই কাউন্সিল সভায় পাকিস্তান-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল এবং সিয়াটো ও সেন্টো থেকে পাকিস্তানের সদস্যপদ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব নেওয়া হয়। সোহরাওয়ার্দী এই প্রস্তাবের এতটাই বিরোধী ছিলেন যে প্রস্তাব উত্থাপনকারীদের ডেকে নিয়ে তিনি বকুনি দিয়েছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তানে সরকার বদলের পালা চলছিল। আওয়ামী লীগ ফজলুল হকের আশীর্বাদপুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা দেওয়ার তোড়জোড় করে। আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের ভগ্নাংশ থেকে অনেক সদস্য আওয়ামী লীগে যোগ দেন। ৩০ আগস্ট (১৯৫৬) আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। ৬ সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের নেতা আতাউর রহমান খান মুখ্যমন্ত্রী হন এবং মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রিসভায় আবুল মনসুর আহমদ ও শেখ মুজিবুর রহমানও ছিলেন। এটাও ছিল একটা জোট সরকার। আওয়ামী লীগ ছাড়াও গণতন্ত্রী দল, কফিলউদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে কৃষক-শ্রমিক পার্টির একটি উপদল, জাতীয় কংগ্রেস ও ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি (ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রুপ) জোট সরকারের অংশীদার ছিল।

ঢাকায় মন্ত্রিসভা গঠন করেই মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ২১ দফার অঙ্গীকার অনুযায়ী 'জননিরাপত্তা আইন' বাতিল করেন এবং বিনা বিচারে আটক সব রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তির আদেশ দেন। ৮ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) তিনি

মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে উপস্থিত থেকে মুক্তি পাওয়া ৫৯ জন রাজবন্দীকে স্বাগত জানান।[১৫]

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পদত্যাগ করলে ১২ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) ইস্কান্দার মির্জার সঙ্গে এক গোপন সমঝোতায় আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করে। মির্জার পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা রিপাবলিকান পার্টির সমর্থনে মাত্র ১৩ জন সদস্য নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।[১৬]

আওয়ামী লীগ এত দিন ছিল বিরোধী দল। সরকার গঠন করে দলটি নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। সরকার ও দল যে এক বিষয় নয়, এটা অনেকে বুঝতে চাননি। কখনো কখনো সরকার দলের ওপর খবরদারি করে, আবার কখনো-বা দল সরকারের ওপর। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে এই বাস্তবতার মুখোমুখি হলো। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের অভিজ্ঞতা ছিল এ রকম :

> মন্ত্রিত্ব গঠনের কয় দিন পর মওলানা ভাসানী ঢাকায় এসে আমাকে তলব করলেন। টেস্ট রিলিফের কাজে মজুরদের যে হারে মজুরি দেওয়া হচ্ছে, তা অত্যন্ত অসংগত। সরকারি কর্মচারীদের বলেছিলেন বাড়িয়ে দিতে, তারা কথা শোনে না।
>
> বললাম, তারা পারে না। অসুবিধাও আছে। নীতি সম্পূর্ণ বদলাতে হবে। আইনও বদলাতে হবে।
>
> বদলান। কিন্তু এর বিরুদ্ধে এত দিন বক্তৃতা করেছেন, তীব্র নিন্দা করেছেন সরকারের। আর আপনার সরকারের বেলায় চুপ করে বসে আছেন।
>
> বললাম, জনাব, আমি এসব বক্তৃতা করিনি। অসম্ভব কথা বলা আমার অভ্যাস নয়। সরকারের নিন্দা করেছি, সমালোচনা করেছি, যা আমি ক্ষমতা পেলেও করতে পারব না, তা কাউকে করার তাগিদ দিইনি। আপনারা ওসব বলছেন। কাজেই আমারও তার দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে।
>
> বললেন, এখন দরকারবোধে আইনের বিধান বদলান।
>
> এর কয়েক দিন পর ছোট্ট একটা চিঠি পেলাম মওলানা সাহেবের। লিখেছেন, পত্রপাঠ অমুক জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে অপসারণ করিবেন, নতুবা পদত্যাগ করিব। কোনো সরকারের আমলে কর্মচারী আমাকে এমন অপমান করে নাই, যাহা আপনার কর্মচারী করিয়াছে।
>
> তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কী?
>
> তিনি চমকে গেলেন বলে মনে হলো। বললেন, 'কিছুই জানি না। আমার কিছুতেই মনে পড়ছে না, কোথায় তাঁকে আমি অপমান করেছি।'
>
> কয়েক দিন পর মওলানা ঢাকায় এলেন। জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছিল? বললেন, আমি টেলিগ্রাম করেছিলাম, তার ওপর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লিখেছেন, মওলানা নিশ্চয়ই আইনের বিধান জানেন না।

আমার আদেশই ঠিক।

হতে পারে, আপনি আইনের বিধান জানেন না।

সব আইনের মালিক আপনারা। সবাই আইনজ্ঞ। এরপর দেখব, যাতে আইন জানা লোক পরিষদ সদস্য হয়ে না আসতে পারে।[১৭]

প্রশাসন সম্পর্কে আতাউর রহমান খানের অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না। এখানে তাঁর একটি পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করা হলো :

আমলাতন্ত্রের দম্ভ অসাধারণ—পদ, ক্ষমতা ও যোগ্যতার। যে যে বিভাগে কাজ করে, সে একটা মূর্তিমান বিশেষজ্ঞ—এক্সপার্ট। তার মতামত অলঙ্ঘনীয়। অথচ দেখা গেছে উচ্চাঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা অক্ষম। কিন্তু তা মানতে রাজি নয়।

যাহোক, একটা কিছু টাইপ করে গুছিয়ে নম্বর দিয়ে লিখে আনলেই জনগণের যারা প্রতিনিধি, তারা স্বীকার করে নেবে। তারা চোঙা ফুঁকে অকারণে জিন্দাবাদ সংগ্রহ করে করে মন্ত্রী হয়ে বসেছে, আসলে কিছু জানা নেই। কাজেই মুরব্বিয়ানা করা চলে।[১৮]

মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের ওজারতির তিক্ত অভিজ্ঞতার এখানেই শেষ নয়। প্রায় প্রতিদিনই নিত্যনতুন আবদার আর আপদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকে। তার আরেকটি অভিজ্ঞতা এ রকম :

এক জেলার আওয়ামী লীগের সভাপতি এলেন বিশেষ কয়টি অভিযোগ নিয়ে।

থানার দারোগা এক ডাকাতি মামলায় ইচ্ছামতো তদন্ত করেছে। তিনি যে পরামর্শ দিলেন, দারোগা তা শুনল না। বললাম, তার কাজে আপনি হাত দিতে গেলেন কেন? তার কাজে ত্রুটি বা অবহেলা দেখলে তার ওপরওয়ালার কাছে অভিযোগ করবেন। তা না করে আপনি গেলেন থানায়?

যাব না? তাহলে আর পরিষদের সদস্য হয়ে লাভ কী? এটা ইস্তফা দিয়ে দিই?

এর কিছুদিন আগে এরই দস্তখত করা প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সভার একটি প্রস্তাবের নকল আমার হাতে পড়ে।

অতঃপর সরকারের বিভিন্ন বিভাগে যেসব পদ খালি হবে, তা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের দ্বারা পূরণ করা হোক। প্রস্তাব।[১৯]

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান শুধু দলই নিয়ন্ত্রণ করতেন না, সরকারেও তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। আতাউর রহমান খান দলের সিনিয়র সহসভাপতি এবং সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হলেও শেখ মুজিব তাঁকে খুব একটা মেনে নিতে পারেননি। একটি ঘটনার বর্ণনা দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

পূর্ব পাকিস্তানে পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল ছিলেন এ এইচ এম শামসুদ্দোহা। মুসলিম লীগ সরকারের সময়ই তিনি ওই পদে বহাল হন। তখন

তিনি বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি নির্মম আচরণ করতেন বলে অভিযোগ ছিল। প্রদেশে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পরপরই শেখ মুজিব সিদ্ধান্ত নিলেন, শামসুদ্দোহাকে সরাতে হবে। কিন্তু বিষয়টা মুখ্যমন্ত্রীর এখতিয়ারে। পরে একদল সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ করার সময় শেখ মুজিব বর্ণনা করেছিলেন, তিনি কীভাবে শামসুদ্দোহাকে সরিয়েছিলেন। উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তানের (এপিপি) প্রতিনিধি আমানউল্লাহ এবং ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সির (এনা) সম্পাদক হাসান সাঈদ। শেখ মুজিব যা বলেছিলেন :

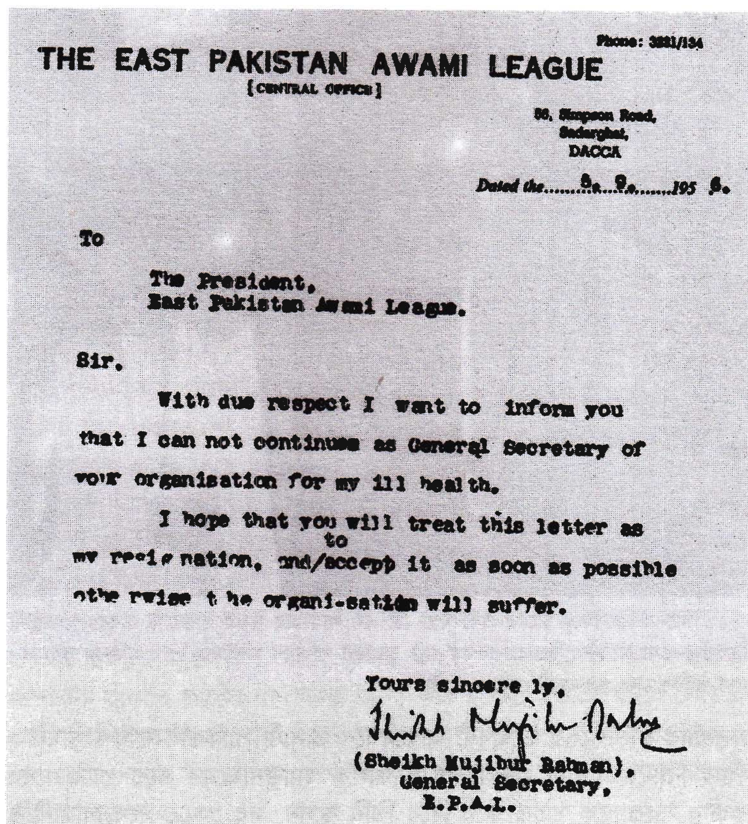
> আতাউর রহমান কি ডিসিশন নিতে পারে? আমি তার কামরায় ঢুইকাই চেয়ারগুলা সরাইয়া নিতে বললাম। আতাউর রহমান সাহেবরে কইলাম, যা কওয়ার আমি কব, আপনে চুপ থাকবেন। দোহারে ডাকলাম। সে আইস্যা দেহে ঘরে কোনো চেয়ার নাই। সে বুঝতে পারছে। ঝানু অফিসার ছিল তো। দাঁড়াইয়া একটা স্যালুট দিল। আগে তো কইত মজিবর। এহন স্যালুট দিয়া স্যার কইল। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকল। আমি কইলাম, দোহা সাহেব, এইহানে তো অনেক দিন আমাদের খেদমত করলেন, এহন কয় দিন করাচি গিয়া থাহেন। ওইহানে আপনার অনেক আপনজন আছে না? দোহা আতাউর রহমানের দিকে চাইয়া কইল, স্যার কী বলেন? আমি কইলাম, আমি যা কইছি, এইডা উনারই কথা। তারপর কড়া কইরা কইলাম, যান। দোহা মন খারাপ কইরা চইলা গেল।[২০]

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একই সঙ্গে মন্ত্রিসভা এবং দলীয় পদে থাকার বিধান ছিল না। শেখ মুজিবুর রহমান দলের সাধারণ সম্পাদকের পদ ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সাংগঠনিক কিছু বিষয়ে মতভেদ দেখা দেওয়ায় তিনি মন্ত্রিসভা গঠনের এক দিন আগে সভাপতি মওলানা ভাসানীকে একটি চিঠি দেন। চিঠিতে তিনি লেখেন, 'অসুস্থতার কারণে আমার পক্ষে আপনার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয়। আশা করি, এই চিঠিটি আপনি আমার পদত্যাগপত্র হিসেবে বিবেচনা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রহণ করবেন, তা না হলে সংগঠনের ক্ষতি হবে।'[২১] তাঁর এই 'পদত্যাগ' কার্যকর হয়নি। শেখ মুজিব আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভায় যোগ দেন এবং বিভিন্ন সময়ে বাণিজ্য, শিক্ষা, শ্রম ও দুর্নীতি দমন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

সোহরাওয়ার্দী তাঁর মার্কিনঘেঁষা নীতি সত্ত্বেও কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে চীন সফর করেন। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা সফর করেন। তাঁর সম্মানে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ একটি সংবর্ধনা সভার

আয়োজন করেছিল। দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান চৌ এন লাইকে স্বাগত জানিয়ে একটি মানপত্র পাঠ করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে দলের মধ্যে সমালোচনা হচ্ছিল। মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলের কাগমারীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা ডাকেন। ১৯৫৭ সালের ৭-৮ ফেব্রুয়ারি সভার তারিখ ঠিক করা হয়। সম্মেলনের আগের দিন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা বসে। মওলানা ভাসানীর অনুরোধে সোহরাওয়ার্দী নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় অলি আহাদ সিয়াটো ও বাগদাদ চুক্তি থেকে পাকিস্তানের সদস্যপদ প্রত্যাহার করার প্রস্তাব তুললে কেউ তাঁকে সমর্থন করেননি। ৭



Phone: 3821/134

THE EAST PAKISTAN AWAMI LEAGUE
[CENTRAL OFFICE]

56, Simpson Road,
Sadarghat,
DACCA

Dated the......8..9......195 6.

To

The President,
East Pakistan Awami League.

Sir,

With due respect I want to inform you that I can not continue as General Secretary of your organisation for my ill health.

I hope that you will treat this letter as my resignation, and/accept it as soon as possible to otherwise the organi-sation will suffer.

Yours sincerely,
Sheikh Mujibur Rahman
(Sheikh Mujibur Rahman),
General Secretary,
E.P.A.L.

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে শেখ মুজিবের চিঠি, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬। সূত্র : আহাদ



১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর সফর উপলক্ষে ঢাকায় আওয়ামী লীগের দেওয়া সংবর্ধনা সভায় মানপত্র পাঠ করছেন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। বাঁয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী

ফেব্রুয়ারি কাউন্সিলের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাসানী পাকিস্তান-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে বক্তব্য দেন। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, সব ক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্যনীতি কার্যকর না হলে পূর্ব পাকিস্তান 'আসসালামু আলাইকুম' বলবে। এর অর্থ হলো, পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে না।

৯ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৭) মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে কাগমারীতে আফ্রো-এশীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ড. কুদরত-ই-খুদা, ড. এস হেদায়েত উল্লাহ, ড. ওসমান গণি, ড. শামসুদ্দিন আহমদ, ড. নুরুল হুদা, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক এ বি এ হালিম (করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য), ড. মাহমুদ হোসেন, কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, ভারতের শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবির, লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ কুমার সান্যাল, সুফিয়া ওয়াদিয়া প্রমুখ যোগ দেন। সম্মেলন উপলক্ষে টাঙ্গাইল থেকে কাগমারী পর্যন্ত রাস্তায় কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মাও সেতুং, স্ট্যালিন, ইস্কান্দার মির্জাসহ অনেকের নামে তোরণ তৈরি করা হয়। এসব কাজে প্রচুর টাকা খরচ হয়েছিল। সম্মেলনের অর্থ কমিটির দায়িত্বে ছিলেন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার বন্ধু ও বিশিষ্ট শিল্পপতি সদরি ইস্পাহানী। প্রেসিডেন্ট মির্জার ধনাঢ্য বন্ধুরা খরচের একটা অংশ জোগান দিয়ে থাকতে পারেন। পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে বিবাদ হলে তার সুফল তিনি (মির্জা) পাবেন, এটা অনুমান করা যায়। মির্জার আসল লক্ষ্য ছিল প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে কোণঠাসা করা। ভাসানী যে মির্জার হাতের পুতুলে পরিণত হচ্ছেন, এই সন্দেহ তখন অমূলক ছিল না।[২২]

কাগমারী সম্মেলনটি এমন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যখন সোহরাওয়ার্দী জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে 'কাশ্মীর' নিয়ে আলোচনার জন্য জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধিকে একটি বিশেষ অধিবেশন আয়োজন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেসব দেশের সরকার সোহরাওয়ার্দীর বিদেশনীতির সঙ্গে একমত নয়, ভাসানী বেছে বেছে তাদের এই সম্মেলনে দাওয়াত দিয়েছিলেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন, যদিও তাঁরা সম্মেলনে যোগ দেননি।[২৩]

কাগমারী সম্মেলনে শেখ মুজিবকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য অলি আহাদের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ চেষ্টা করেছিল। তাদের প্রকাশ্য যুক্তি ছিল, শেখ মুজিব একই সঙ্গে মন্ত্রী ও দলের সাধারণ সম্পাদক থাকতে পারেন না। তাঁরা আশা করেছিলেন, হয়তো মন্ত্রীর লোভনীয় পদটি তিনি ছাড়বেন না; বরং দলের সাধারণ সম্পাদকের পদটিই ছেড়ে দেবেন। সে ক্ষেত্রে দলের সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক হওয়া সহজ হবে।

১৯৫৭ সালের ১৮ মার্চ অলি আহাদ ভাসানীর সঙ্গে টাঙ্গাইলে দেখা করেন। রাতে ভাসানী তাঁর হাতে একটি পদত্যাগপত্র দিয়ে সেটি *দৈনিক সংবাদ*-এর

সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর কাছে পৌঁছে দিতে বলেন। পদত্যাগপত্রটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> জনাব পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি সাহেব, ঢাকা
>
> আরজ এই যে, আমার শরীর ক্রমেই খারাপ হইতেছে এবং কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এইবার খুলিতে হইবে, তদুপরি আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার লিডার সদস্যদের কাছে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব ২১ দফা ওয়াদা অনুযায়ী জুয়া, ঘোড়দৌড়, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি হারামি কাজ বন্ধ করতে, সামাজিক ও ধর্মীয় বিবাহ বন্ধনের ওপর ট্যাক্স ধার্য করা জনমত অনুযায়ী বাতিল করিতে আবেদন জানাইয়া ব্যর্থ হইয়াছি। ভয়াবহ খাদ্য সঙ্কটেরও কোনো প্রতিকার দেখিতেছি না। ২১ দফা দাবি ও অন্যান্য দফা যাহাতে অর্থ ব্যয় খুব কমই হবে তাহাও কার্যকরী করার নমুনা না দেখিয়া আমি আওয়ামী লীগের সভাপতি পদ হইতে পদত্যাগ করিলাম। আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।
>
> ইতি
>
> স্বা : মো : আবদুল হামিদ খান ভাসানী
>
> কাগমারী ১৮-৩-৫৭[২৪]

শেখ মুজিবের ধারণা হলো, অলি আহাদ দলের মধ্যে কোন্দলের চেষ্টা করছেন। ভাসানীর পদত্যাগপত্র সাধারণ সম্পাদকের কাছে না দিয়ে কেন জহুর হোসেন চৌধুরীর কাছে দেওয়া হলো, এই প্রশ্নও উঠল। আওয়ামী লীগের ৫৬ সিমসন রোডের অফিসে ৩০ মার্চ (১৯৫৭) কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভায় দলীয় শৃঙ্খলা ভাঙার অভিযোগে অলি আহাদকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। সভায় কমিটির ৩৭ জন সদস্যের মধ্যে ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন। ৯ জন সদস্য বহিষ্কারের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইয়ার মোহাম্মদ খান (কোষাধ্যক্ষ), আবদুল হাই (প্রচার সম্পাদক), আবদুস সামাদ (শ্রম সম্পাদক), সেলিনা বানু (মহিলা সম্পাদক), দবিরউদ্দিন আহমদ (সভাপতি, রংপুর জেলা আওয়ামী লীগ), হাতেম আলী খান, অধ্যাপক আসহাবউদ্দিন আহমদ এবং আকবর হোসেন আখন্দ (সভাপতি, বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগ)। ৫ এপ্রিল নির্বাহী কমিটির সভায় মওলানা ভাসানীকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ জানানো হয়। সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত ভাসানী পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করবেন না বলে জানিয়ে দেন। ৩১ মে শেখ মুজিব মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং ১৩-১৪ জুন আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা ডাকেন। প্রথমে ঢাকার পিকচার প্যালেসে (পরবর্তী নাম শাবিস্তান) এবং পরে গুলিস্তান সিনেমা হলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সোহরাওয়ার্দী সরকারের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে বিতর্ক হয়।[২৫]

সম্মেলনে উপস্থিত কাউন্সিলররা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতি অনুমোদন করেন। ভাসানী আবার ভোটাভুটি দাবি করেন। দ্বিতীয়বার ভোট নেওয়া হলে সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে আরও বেশি ভোট পড়ে। তিনি ৮০০ ভোট পান। ভাসানীর পক্ষে মাত্র ৩৫টি ভোট পড়ে। আওয়ামী লীগের কোনো সম্মেলনে এটাই ছিল ভাসানীর শেষ উপস্থিতি।[২৬]

যে নয়জন সদস্য এর আগে অলি আহাদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা পদত্যাগ করেন। তাঁদের জায়গায় নতুন নয়জনকে নির্বাহী কমিটিতে নেওয়া হয়। তাঁরা হলেন জসিমউদ্দিন আহমদ (সিলেট), আমজাদ হোসেন (পাবনা), মুজিবর রহমান (রাজশাহী), দেওয়ান মহিউদ্দিন আহমদ (বগুড়া), রওশন আলী (যশোর), শামসুল হক (ঢাকা), আজিজ আহমদ (নোয়াখালী) ও মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ। কমিটির বিভিন্ন পদে কিছু রদবদল হয়। আবদুল হামিদ চৌধুরীকে সাংগঠনিক সম্পাদক, জহুর আহমদ চৌধুরীকে শ্রম সম্পাদক, হাফেজ হাবিবুর রহমানকে প্রচার সম্পাদক এবং মেহেরুন্নেসা খাতুনকে মহিলা সম্পাদক করা হয়। মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হন। ১৪ জুন আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দানে একটি জনসভা করে। সভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা দেন, পূর্ব পাকিস্তানকে শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছে।[২৭]

১৭ জুন (১৯৫৭) এক ঘোষণায় মওলানা ভাসানী ২৫-২৬ জুলাই ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মিসম্মেলন আয়োজনের কর্মসূচি দেন। ২৫ জুলাই ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল গাফফার খান, পাঞ্জাবের মিয়া ইফতেখারউদ্দিন আহমদ, সিন্ধুর জি এম সৈয়দ, বেলুচিস্তানের আবদুস সামাদ আচকজাই এবং পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানী অংশ নেন। সম্মেলন পণ্ড করার জন্য আওয়ামী লীগ ভাড়াটে গুন্ডা ব্যবহার করে বলে অভিযোগ ছিল। সম্মেলনে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি ও মাহমুদুল হক ওসমানীকে সাধারণ সম্পাদক করে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে মওলানা ভাসানী ও মাহমুদ আলী। খান আবদুল গাফফার খান ও মাহমুদ আলী কাসুরী পশ্চিম পাকিস্তান ন্যাপের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের ২৯ জন সদস্য ন্যাপে যোগ দেন এবং প্রাদেশিক সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন।[২৮]

সম্মেলনের পর ন্যাপ পল্টন ময়দানে একটি জনসভা করে। সভায় বহিরাগত কিছু লোক গোলমাল বাধানোর চেষ্টা চালায়। তারা সভামঞ্চে ইট-পাটকেল ছুড়ে মারে। এক দল ভেঙে অন্য দল করলে নতুন দলের লোকদের হয়রানি করা এ দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য।[২৯]

রাজনীতিতে আদর্শের কথা বড় গলায় বললেও ক্ষমতার ব্যাপারটা বরাবর উহ্যই থেকে যায়। নানা ধরনের ইহজাগতিক প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে। যুক্তফ্রন্টের প্রধান দুই শরিক আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির (কেএসপি) মধ্যে তাই শুরু থেকেই টানাপোড়েন ছিল। ওপরে ওপরে ঐক্যের একটা পলেস্তারা থাকলেও ভেতরের গাঁথুনিটা মজবুত ছিল না। ফলে সমীকরণটা হোঁচট খেত বারবার। আওয়ামী লীগে ভাঙন ধরলে কৃষক-শ্রমিক পার্টি আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে সরকারে যোগ দিতে চেয়েছিল। কেএসপির কয়েকজন নেতা এ জন্য সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সোহরাওয়ার্দী রাজি হন। কৃষক-শ্রমিক পার্টির সঙ্গে জোট করার ব্যাপারে শেখ মুজিবের ঘোরতর আপত্তি ছিল।[৩০] বিষয়টি কেএসপি নেতা বি ডি হাবীবুল্লাহর ছেলে আমানউল্লাহর নজর এড়ায়নি। তিনি একটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং বাকিটা শুনেছিলেন তাঁর বাবার কাছে। আমানউল্লাহ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> এটা ইন্টারেস্টিং, ইনভলভিং সোহরাওয়ার্দী অ্যান্ড ফজলুল হক, অ্যান্ড মাই ফাদার। অন্য আরও ছিল। শেরেবাংলা তখন গভর্নর। তখন সোহরাওয়ার্দীর দিক থেকে একটা প্রস্তাব এল যে, আমাদের মধ্যে যে ডিফারেন্সেস, এটা আমরা সর্ট আউট করে ফেলব। লেট আস ডিসকাস। এইদিক থেকে একটা আগ্রহ ছিল, পাওয়ারে যাবে। এদের সবার তো ক্ষমতার লিপ্সা! আমার বাবা হতে আরম্ভ করে সবাই। আদর্শবাদ, ওই কিনা, কমিউনিস্ট লিডার মণি সিং, ওইসব না। এরা কেউ মণি সিং ছিল না। একটা প্রস্তাব এল। সোহরাওয়ার্দী সাহেব বললেন, আমি তো এই স্টেজে ঢাকা আসতে পারতেছি না। সুতরাং তোমাদের একটা ডেলিগেশন পাঠাও। আমরা আলোচনা করি। লেট আস ট্রাই টু সর্ট আউট আওয়ার ডিফারেন্সেস অ্যান্ড ইউনাইট।
>
> শেরেবাংলা তখন বেশ বুড়ো। কিন্তু মাথায় বুদ্ধি...! আমার বাবা, মোহন মিয়া, নান্না মিয়া কেএসপি লিডাররা গভর্নর হাউসে পরামর্শ করতে গেল বিফোর লিভিং ফর করাচি। আমার বাবার সঙ্গে আমিও গেলাম, আউট অব কিউরিয়সিটি। আমি কথাবার্তা শুনেছি। শেরেবাংলা সাধারণত কথা বলতেন বরিশালের কথ্য ভাষায়। বললেন, 'হোনো, সোরোয়ার্দীরে তোমরা চেনো না। আমি চিনি। তারে দেখছি। ধুরন্ধর, এক্কেরে ধুরন্ধর। অর লগে কথা কইতে গেলে সাবধানে কবা। কী করবা তোমরা?' তারপর কয়টা পরামর্শ দিলেন, এই এই স্ট্র্যাটেজি। 'কথা বলবা, কথার মাঝামাঝি জায়গায় তোমরা বলবা যে,

আমরা একটু চিন্তা কইরা দেহি স্যার। কইয়া সময় নেবা। ওই সময় আমারে টেলিফোন করবা। আমি কইয়া দিমু কী করতে অইবে।'

এই তো ফার্স্ট পার্ট গেল। সেকেন্ড পার্টটা ফ্রাসট্রেটিং। এইটা সোহরাওয়ার্দীর ট্যাকটিকসও হইতে পারে। অথবা ন্যাচারালও হইতে পারে। মারাত্মক ইতিহাস এইটা। ওনারা তো গেলেন। টপ লিডার যারা, পাঁচ-ছয়জন বোধহয়, ইনক্লুডিং মাই ফাদার। সমারসেট হাউসে থাকে তখন সোহরাওয়ার্দী। ওইখানে মিটিং হবে। কেএসপির নেতৃত্ব দেন সম্ভবত আবু হোসেন সরকার। সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শেখ সাহেবও ছিলেন। আওয়ামী লীগের অন্য লিডাররাও ছিলেন। কিন্তু শেখ সাহেব বেশ ডমিন্যান্ট, অ্যাজ আ স্ট্রং সাপোর্টার অব সোহরাওয়ার্দী। আলোচনা মোটামুটি সাকসেসফুল। মানে আ কাইন্ড অব এগ্রিমেন্ট ওয়াজ রিচ্ড। সোহরাওয়ার্দী বললেন, এই এগ্রিমেন্টের ভিত্তিতে একটা ড্রাফট করা হোক। কেএসপির লোকেরা ড্রাফট তৈরি করছে। এইটা নিয়া আবার মিটিং করছে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে। সোহরাওয়ার্দী শেখ সাহেবকে বললেন, 'মুজিব দেখো তো?' শেখ সাহেব পড়লেন। তারপর ভাঁজ কইরা দুই হাতে ছিঁড়া ফেইলা দিলেন। সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'আই অ্যাম সরি। তবে আর একবার চেষ্টা করতে তো কোনো দোষ নাই।' এরপর কেএসপির লোকেরা কয়, 'হালার পো হালা...' ওই ধরনের রিঅ্যাকশন আর কি...! লাভের মধ্যে এইটা হইল, আসার সময় আমার বাবা করাচি থিকা কিছু ফ্রুটস নিয়া আসছিল, শুকনা বেদানা। বরিশালে গেলেন। ফল ভাইঙ্গা দেহি, অধিকাংশই খারাপ।[৩১]

কৃষক-শ্রমিক পার্টিকে নিয়ে সোহরাওয়ার্দী তাঁর ক্ষমতার ভিত মজবুত করতে চেয়েছিলেন। এটা তাঁকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে বাড়তি সুবিধা দিত। ওই সময় রিপাবলিকান পার্টি ন্যাপের সঙ্গে একজোট হয়ে পররাষ্ট্রনীতি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিটের সমালোচনা শুরু করে দেয়। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা জানতেন, সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী থাকলে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন হবেই। পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মধ্যে যতই দলাদলি থাকুক না কেন, তারা কেউই একটা সাধারণ নির্বাচনের মুখোমুখি হতে চায়নি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের ভরাডুবি দেখে তাদের মনে হয়েছিল, জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন হলে তাদের জন্য এটা হবে আত্মহত্যার শামিল।[৩২]

মির্জা পাকিস্তানের সাংবিধানিক অগ্রযাত্রা রুখে দেওয়ার মতলব আঁটছিলেন। তিনি একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন। তাঁর ইঙ্গিতে রিপাবলিকান পার্টি সোহরাওয়ার্দী সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। সোহরাওয়ার্দী ১১ অক্টোবর (১৯৫৭) পদত্যাগ করেন। তাঁর মন্ত্রিসভা ১৩ মাস টিকেছিল।

পদত্যাগের আগে জুন মাসে (১৯৫৭) সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তান চা-বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছিলেন। শেখ মুজিব ১৯৫৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন।[৩৩] মন্ত্রীর পদ ছেড়ে দেওয়ার পর দলের সাধারণ সম্পাদকের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর একটা নিয়মিত আয়ের দরকার ছিল। এই চাকরির সুবাদে সমস্যার একটা আশু সমাধান হয়। এ সময় তাঁর সঙ্গে পাকিস্তানের ধনী পরিবারগুলোর অন্যতম ইউসুফ হারুনের যোগাযোগ হয়। তাঁরা দুজনই পাকিস্তান গণপরিষদের (পরে নাম হয় জাতীয় পরিষদ) সদস্য ছিলেন। ইউসুফ হারুন পরে তাঁর মালিকানাধীন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ঢাকা অফিসে শেখ মুজিবকে ম্যানেজার পদে বহাল করেন। বেতন মাসে দুই হাজার টাকা। ইউসুফ হারুন শেখ মুজিবের মধ্যে ভবিষ্যৎ রাজনীতির অনেক সম্ভাবনা দেখেছিলেন।[৩৪]

আওয়ামী লীগে ভাঙন এবং কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার পতনের ফলে ক্ষমতার পালাবদল চলে দ্রুত লয়ে। প্রেসিডেন্ট মির্জা মুসলিম লীগ নেতা ইসমাইল ইব্রাহিম চুন্দ্রিগড়কে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। চুন্দ্রিগড় দুই মাস টিকে ছিলেন। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে রিপাবলিকান পার্টির নেতা মালিক ফিরোজ খান নুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পূর্ব পাকিস্তানে তখন চলছে ভাঙাগড়ার খেলা।

১৯৫৮ সালের মার্চে প্রাদেশিক আইন পরিষদের ১৯৫৮-৫৯ সালের খসড়া বাজেট উপস্থাপন করা হয়। মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও ন্যাপের সদস্যরা অতিরিক্ত কর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এককাট্টা হন। তাঁদের সুরে সুর মেলান উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর আওয়ামী লীগের ১১ জন সদস্য। গভর্নর ফজলুল হক ৩১ মার্চ আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করে কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভা গঠন করার সুযোগ করে দেন। এতে সোহরাওয়ার্দী খুবই মনঃক্ষুণ্ন হন। ওই রাতে তিনি প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুনকে টেলিফোনে হুমকি দিয়ে বলেন, যদি আধা ঘণ্টার মধ্যে গভর্নর ফজলুল হক ও আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করা না হয়, তাহলে আওয়ামী লীগ নুন সরকারের ওপর থেকে সমর্থন তুলে নেবে। এই হুমকিতে কাজ হলো। ফজলুল হক চার ঘণ্টার মধ্য বরখাস্ত হলেন। তাঁর জায়গায় পূর্ব পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি হামিদ আলীকে অস্থায়ী গভর্নর নিযুক্ত করা হলো। ৩১ মার্চ রাতে ১২ ঘণ্টার মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার বিদায় নিলেন। ১ এপ্রিল আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভা পুনর্বহাল হলো। কিন্তু সংকট চলতেই থাকল। ১৮ জুন একটা প্রস্তাব পরিষদে পাস হলো না। ১৯ জুন একটি 'কাটমোশনে' হেরে যাওয়ার ফলে আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভার পতন হলো। ইতিমধ্যে হামিদ আলীর জায়গায় সুলতান উদ্দিন আহমদ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর

হয়েছেন। তিনি আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে বলেন। এ মন্ত্রিসভার আয়ু ছিল তিন দিন। ২১ জুন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমান অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাবটি ১৫৬-১৪২ ভোটে পাস হয়। ২৩ জুন আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করেন। পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্টের শাসন জারি হলো। দুই মাস পর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা ঘোষণা দিলেন ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হবে। ২৫ আগস্ট (১৯৫৮) আতাউর রহমান খান আবার মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

প্রাদেশিক পরিষদের স্পিকার আবদুল হাকিমের ওপর আওয়ামী লীগের আস্থা ছিল না। ১৯৫৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর পরিষদের অধিবেশনে তুমুল হট্টগোল হয়। স্পিকার অধিবেশন ছেড়ে চলে যান। জাতীয় কংগ্রেস সদস্য পিটার পল গোমেজ স্পিকার আবদুল হাকিমকে বদ্ধ উন্মাদ বলে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা ভোটে পাস হয়। ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী পরদিন ২৩ সেপ্টেম্বর বিকেল চারটায় অধিবেশন আবার বসবে বলে ঘোষণা দিলে পরিষদকক্ষে মারামারি বেধে যায়।[৩৫]

শাহেদ আলী কৃষক-শ্রমিক পার্টির সদস্য ছিলেন। হঠাৎ একদিন দল বদল করে তিনি আওয়ামী লীগের কোয়ালিশনে যোগ দেন। বিরোধী দলগুলোর চোখে তিনি তাই হয়তো বিশ্বাসঘাতক পরিগণিত হয়েছিলেন এবং তাদের ক্রোধের লক্ষ্য হয়েছিলেন।[৩৬]

আজিজুল হক শাজাহান ছিলেন এ কে ফজলুল হকের ব্যক্তিগত সহকারী। আইন পরিষদের সভা চলাকালে তিনি গভর্নরের গ্যালারিতে উপস্থিত থেকে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর বর্ণনা থেকে এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

> ...সর্বজনাব আবদুস সালাম খান, খন্দকার মোশতাক আহমদ, হাশিম উদ্দিন আহম্মদ, খালেক নেওয়াজ প্রমুখ ১৪ জন সংসদ সদস্য সরকারি দল থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে। ট্রেজারি বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে অর্থবিল পাস করা অসম্ভব হেতু সরকার চালু রাখা ও সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে অপারগ হওয়ায় ক্ষমতাসীন দল সংসদ অধিবেশনের পূর্বের রাত্রে বাদশাহ গুন্ডার নেতৃত্বে ঢাকার কিছু গুন্ডাকে 'আর্মস গার্ড' নাম দিয়ে লালবাগ থানা থেকে পুলিশের খাকি পোশাক পরিয়ে সাইকেলের চেইন হাতে দিয়ে বিরোধী দলের সদস্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দেয়...। তৎকালীন পুলিশ বিভাগের প্রধান জনাব মোহাম্মদ ইসমাইলের নেতৃত্বে সংসদ ভবনের মাঝে পুলিশ ঢুকিয়ে দেয়। গুন্ডাদের সাইকেলের চেইনের আঘাতে মোহন মিয়ার পিঠের চামড়াসহ পাঞ্জাবি ছিঁড়ে রক্ত বের হতে থাকে। আবদুল লতিফ বিশ্বাসকে উপুড় করে তার পিঠের ওপর চড়াও হয়। নান্না মিয়া, মোহন মিয়া, লতিফ বিশ্বাস, পীর দুদু মিয়া, হাশিম উদ্দিন আহম্মদ প্রমুখকে মেরে বেহুঁশ করে

ফেলা হয়। আহত হন এম এ মতিন, শহীদুল্লাহ, খালেক নেওয়াজ, বি ডি হাবীবুল্লাহ, মিয়া হাফিজসহ বিরোধীদলীয় বহু সংসদ সদস্য...। চট্টগ্রাম থেকে কংগ্রেসের সংসদ সদস্য দেশপ্রিয় জে এম সেনগুপ্তের স্ত্রী নেলী সেনগুপ্তকে বারান্দায় এনে মেরে ফুলের বাগানের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। একমাত্র *ইত্তেফাক* বাদে অন্য সব পত্রিকার ক্যামেরাগুলো পিটিয়ে ভেঙে ফেলা হয়।...

এ সময় ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর কন্যার বিয়ের প্রস্তুতি চলছিল...। তিনি শাসক দলের (আওয়ামী লীগ) পক্ষে কাজ করবেন বলে চাপ দেওয়া হলো।...

পরের দিন সংসদ শুরু হয়। অধিবেশন শুরু হলে শাহেদ আলী স্পিকারের আসনে উপবিষ্ট হলেন। চারদিক থেকে ছি ছি ওঠে, তাঁকে আসন ত্যাগ করতে বলা হয়। তিনি বসে থাকেন। শুরু হয় লড়াই, শুরু হয় তাণ্ডব ঘটনা।...স্পিকার আবদুল হাকিমকে তাঁর কক্ষে আবদ্ধ করে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। গন্ডগোলের একপর্যায়ে সংসদ সদস্য কোরবান আলী একটা চেয়ারের হাতল ভেঙে সেই হাতলটি মোহন মিয়ার দিকে নিক্ষেপ করেন। ওটা ছুটে আসতে দেখে মোহন মিয়া মাটিতে বসে পড়েন। হাতলটি সোজা এসে বসে থাকা স্পিকারের নাকে লেগে ছিটকিয়ে নিচে পড়ে যায়। আহত অবস্থায় শাহেদ আলী টেবিলে মাথা নিচু করে থাকেন। রক্তক্ষরণ চলতে থাকে, কক্ষে গন্ডগোল চলতে থাকে। একপর্যায়ে শাহেদ আলী অজ্ঞান হয়ে চেয়ার থেকে পড়ে যান। তখন তাঁকে ধরাধরি করে গাড়িতে করে মেডিকেল কলেজে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে আসা হয়, কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা দেন। বলেন, বহুমূত্র রোগী, অনেক রক্তক্ষরণ ও বিলম্বে আনা মৃত্যুর কারণ...।[৩৭]

আজিজুল হক শাজাহানের বিবরণটি একটু একপেশে। আওয়ামী লীগ ও কেএসপি উভয় দলের সদস্যরা মারামারিতে যোগ দিয়েছিলেন। বি ডি হাবীবুল্লাহ ছিলেন কেএসপির এমপি। অন্যদিকে তাঁর ছোট ভাই এস ডব্লিউ লকিতুল্লাহ ছিলেন আওয়ামী লীগের। দুজনই আহত হন।[৩৮]

ঢাকা জেলার কালিয়াকৈরের সংসদ সদস্য শামসুল হক বাদী হয়ে ঢাকার দক্ষিণ মহকুমা হাকিমের আদালতে ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মোহন মিয়া, আবদুল লতিফ বিশ্বাস, নান্না মিয়া, বি ডি হাবীবুল্লাহ, পীর দুদু মিয়া, আবদুল মতিন (পাবনা), শহীদুল্লাহ (মনোহরদী), আবদুল আলীম চৌধুরী, সৈয়দ মোস্তাগাউসুল হক (খুলনা), মিয়া আবদুল হাফিজ (রংপুর), আবু হোসেন সরকার, মাহমুদুন্নবী চৌধুরী (চট্টগ্রাম), আশরাফউদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী ও গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী (কার্তিকপুর)। পরে তাঁরা জামিনে ছাড়া পান।[৩৯]

এদিকে করাচিতে শুরু হয় অন্য খেলা। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুনকে আওয়ামী লীগের কয়েকজনকে মন্ত্রিসভায় নিতে বলেন।

সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী না রাখায় আওয়ামী লীগের নেতারা প্রথমে মন্ত্রিত্ব নিতে রাজি হননি। সোহরাওয়ার্দী পরে প্রেসিডেন্ট মির্জার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান, জহিরউদ্দিন, নুরুর রহমান, দিলদার আহমদ, আদেলউদ্দিন আহমদ, আব্দুর রহমান খান এবং আওয়ামী লীগের সমর্থক কংগ্রেসের পিটার পল গোমেজ মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। কৃষক-শ্রমিক পার্টির হামিদুল হক চৌধুরী ফিরোজ খান নুনকে সমর্থন করলে তাঁকে অর্থমন্ত্রী করা হয়। আমজাদ আলীকে আগেই অর্থমন্ত্রী করা হয়েছিল। এ নিয়ে সমস্যা হলো। ফিরোজ খান নুন ৭ অক্টোবর (১৯৫৮) মন্ত্রিসভা পুনর্বিন্যাস করলেন। আওয়ামী লীগ সদস্যদের কয়েকটা গুরুত্বহীন মন্ত্রণালয় দেওয়া হলো। এর প্রতিবাদে তাঁরা মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন।[৪০] রাতে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সামরিক আইন জারি করেন। সাঙ্গ হলো সংসদীয় গণতন্ত্রের পিচ্ছিল পথে হাঁটাহাঁটি, এক দশকের চড়াই-উতরাই।

সামরিক শাসন হঠাৎ করে আসেনি। এর পরিকল্পনা চলছিল অনেক দিন ধরেই। সামরিক আইন জারির বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র আগে থেকেই জানত। প্রেসিডেন্ট মির্জা অভ্যুত্থানের চার দিন আগেই মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস ল্যাংলিকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন এবং সামরিক সরকার গঠিত হলে যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশের স্বীকৃতি যাতে নতুন করে না চাইতে হয়, এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা চেয়েছিলেন। ৪ অক্টোবর রাত দুটোয় রাষ্ট্রদূত ল্যাংলি 'নাইট অ্যাকশন' নামে ওয়াশিংটনে একটা বার্তা পাঠিয়েছিলেন। বার্তাটি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে পৌঁছে সকাল ৬.৪২ মিনিটে। বার্তায় ল্যাংলি লিখেছিলেন :

> মির্জা সম্ভবত এক সপ্তাহের মধ্যেই সর্বময় ক্ষমতা নিয়ে নেবেন এবং সামরিক আইন জারি করবেন। সংবিধান স্থগিত করা হবে এবং নতুন সংবিধানের জন্য একটা কমিশন গঠন করা হবে। ১৫ ফেব্রুয়ারির (১৯৫৯) নির্বাচন হবে না। জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক আইন প্রশাসক হবেন। সঙ্গে থাকবেন পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর সহকারী জেনারেল ওমরাও খান। এ দুজন এবং সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল মুসা, তাঁরাই হলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি যাঁরা প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনাটা জানেন।[৪১]

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খান যখন দেশের দখল নিচ্ছেন, শেখ মুজিব তখন আকাশে, প্লেনে ঢাকার পথে। কী ঘটে গেল, তিনি জানতেও পারলেন না। ৮ নভেম্বর সকালে ঢাকায় পৌঁছে খবরের কাগজ পড়ে তিনি জানতে পারলেন, দেশে সামরিক শাসন জারি হয়েছে। তিনি গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য তৈরি হলেন।[৪২]



১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে জারি হয় সামরিক শাসন। ডান থেকে আইয়ুব খান ও ইস্কান্দার মির্জা

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতাদের কেউ কেউ পরবর্তী সময়ে তারকাখ্যাতি পেয়েছেন, আবার কেউ কেউ থেকে গেছেন আড়ালে। যাঁর শ্রম, মেধা, বিত্ত ও ত্যাগের ওপর ভিত্তি করে দলটি দাঁড়াতে পেরেছিল, তিনি হলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ ইয়ার মোহাম্মদ খান। তাঁকে নিয়ে খুব একটা লেখালেখি হয়নি। ওই সময়ের বিচ্ছিন্ন কিছু স্মৃতি বর্ণনা করেছেন তাঁর স্ত্রী বেগম জাহানারা খান, যা দিয়ে ইতিহাসের একটা পর্বের মালা গাঁথা যায় :

> বুড়া মানুষ (মওলানা ভাসানী), খুব খারাপ লাগত, বাসায় আসত। আমিও থাকতে কইলাম। রাজনীতিও করি না, এগো সেবা করছি আর কি। পাকিস্তানি লিডাররা আসত। মাহমুদ আলী কাসুরী, মাহমুদুল হক ওসমানী, অনেকেই আসত ভাসানী সায়েবের কাছে। উনি আবার আমারে ডাকত, 'মা, এদিকে আয়।' পরিচয় করাইলেন। হক সায়েবকে, সোহরাওয়ার্দী সায়েবকে, তাঁদের সবাইকে দেখছি আর কি।
>
> অফিস (আওয়ামী লীগ অফিস) একতলায় ছিল, আমি তিনতলায়। দোতলা ভাড়া ছিল। ওই যে, মুজিবর রহমান খান, *আজাদ*-এর এডিটর ছিলেন, তিনি ভাড়া থাকতেন।
>
> শেখ সাহেব তো একতালা থেইক্যাই বলত, আজকে আমরা চারজন, পাঁচজন। বড় বড় কড়াই ভইরা তরকারি থাকত। বুয়ারে খালি কইতাম ভাত

বসা। সব খাইত, হইচই করত। অনেক বছর তো ছিল ওই রকম। শামসুল হকও আইত, জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। আফিয়ার (শামসুল হকের স্ত্রী) সাথে তো আমার আলাদাভাবে পরিচয়, বার্মায়। আমরা বার্মায় ছিলাম। পরে একসঙ্গে ঢাকায় ইডেন কলেজে পড়ছি।

তারপর একদিন শেখ সাহেব এল। কয়, 'এহন কী করি, ওরা (শেখ মুজিবের পরিবার) চইলা আসছে।' চইলা আসছে তো কী করি মানে? লেখাপড়া করবে না ওরা? দেশে পইড়া থাকব সারা জীবন? বাসা করেন, বাসা কইরা রাখেন। পড়াশোনা তো করাইবেন।

নাজিরাবাজারে (ইয়ার মোহাম্মদ খান) বাসা ভাড়া কইরা ওদের রাখল। কিছুদিন পর আবার এল। শেখ সাবের ওয়ারেন্ট বাইর হইছে। তো ওয়ারেন্ট বাইর হইছে, ধরা দেন, চুরি-ডাকাতি তো করেন নাই। তার পরে গেল, ধরা দিল। বউরে কইল, 'তুমি দেশে চইলা যাও। তুমি কী করবা?' তার পরে শেখ সাবের বউ আসছে। কয়, 'আমারে একটু দেখা করান।' তারপর তো পারমিশন নিয়া দেখা করাইতে নিয়া গেল, জেলগেটে। গেছে পরেই (ইয়ার মোহাম্মদ খানকে) ভেতরে ঢুকাইল। উনি কয়, 'মুজিবরে দেখতে আসছি।' ঢুকাইব তো ওরা বুঝে নাই, ওয়ারেন্ট দেখাইয়া ঢুকাইয়া দিল। থাকল। শেখ সাবের বউ কাইন্দা-টাইন্দা অস্থির। দেখাই করল না। সে মনে করছে, তার সাথে (ইয়ার মোহাম্মদ খান) গেছে দেইখা ধরছে। আসলে যে ওয়ারেন্ট ছিল আগে উনি এইডা বুঝে নাই। বাসায় আইসা কান্না বেচারির। অনেক বুঝাইয়া তার পরে ঠিক করলাম। তারপর তো দুজন (শেখ মুজিব ও ইয়ার মোহাম্মদ খান) থাকল নয় মাস জেলখানায়। আর শেখ সাবের বউ নাজিরাবাজারের বাসায়। আমি আর আমার দুই দেবর রোজ সন্ধ্যার পরে যাইতাম। দেখাশোনা করতাম। তারপর তো বাইর হইল, নয় মাস পরে।

ইত্তেফাক-এর কথা কইবা না। এই মানিক মিয়া, কত নামীদামি মানুষ! একদিন ভাসানী সায়েব আইসা কয় যে, 'মা, আমি যে একটা কাম করলাম, তুই তো রাগ করবি।' কী করছেন রাগ করব আমি? কয়, 'রোজ দেখি একটা সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা পরা লোক বইসা থাকে। ফ্লোরে বসে সবাই। পার্টি অফিস, নওয়াবপুরে। আমি (ভাসানী) ডাইকা জিজ্ঞাস করলাম, তুমি কে, কোত্থেকে আসছ? তখন কইল, আমি বরিশালের, ছোটখাটো পত্রিকায় লেখালেখি করি। তখন সে কয় কি, আমি তো একটা পত্রিকা বাইর করছি, *ইত্তেফাক*, সাপ্তাহিক, পারবা চালাইতে? কইল যে হ্যাঁ চেষ্টা করুম। তারে বাসায় নিয়া আইছি।' তারপরে নিয়া আইল। নিচের ঘরে থাকে। লুঙ্গি পরা, খড়ম পায়ে দিয়া সকালে উঠানে ঘুরত। ওই গাফফার ছিল কাজের ছেলেটা। ওরে কইত, 'গাফফার, চাইর আনার মুড়ি আর এক কাপ চা আইন্যা দে।' মানিক মিয়া আনাইয়া খাইত। তখন *ইত্তেফাক* সাপ্তাহিক। ভাসানী হইল প্রতিষ্ঠাতা আর আমার সাহেব হইল

প্রিন্টার পাবলিশার। হাটখোলা থিকা ছাপা হইত, প্যারামাউন্ট প্রেস। কেমনে যে কী করল মানিক মিয়া, বুঝলাম না। নিজের নামে কইরা ফেলল। সবাই কইল কেইস করেন। কয়, 'আমি তো ছোটলোক হই নাই। কেইস কইরা আবার আমি নিব? দরকার নাই আমার।'

আর রোজ রাতে আমার ডিউটি ছিল, সন্ধ্যার পরে আমি আর আমার দুই দেবর মিলে তিনজন যাইতাম। খবর নিতাম। একদিন গেলেই ওর (কামালের) মা কইত, 'আজকে একটু ইলিশ-পোলাও রান্ধি?' বলতাম রান্ধেন। খুব মজার রানত ইলিশ-পোলাও। খাইয়া-দাইয়া আসতাম।

আতাউর রহমান খান কোনো ফকিরের কাছে গেছে, পীরের কাছে। পীর দেখাইয়া আসার পর ইয়ার মোহাম্মদ খান জিজ্ঞেস করলেন, 'পীরের কাছে গেলেন যে, কী খবর?' আতাউর রহমান খান বললেন, 'পীর বলছে হীরা পইরা দেখতে, সম্ভাবনা আছে (মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার)।' তারপর (ইয়ার মোহাম্মদ খান) আঙুল থিকা আংটি খুইলা দিল। তখনকার প্লাটিনাম সেট করা আংটি, পাশে আটটা হীরা, মাঝখানে একটা বড় হীরা।[৪৩]

পাকিস্তানের প্রথম দশকের রাজনীতি ছিল নানান ঘটনাপ্রবাহে টালমাটাল। সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত ছিল দুর্বল এবং নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ানো নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেকের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এই প্রেক্ষাপটেই জারি হয় সামরিক শাসন।

উর্দিশাসন

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর রাত আটটায় প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সামরিক আইন জারি করে ফিরোজ খান নুনের মন্ত্রিসভা বাতিল করেন এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। পূর্ব পাকিস্তানে আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হন ঢাকাস্থ সেনাবাহিনীর ১৪ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল ওমরাও খান। ১১ অক্টোবর পুলিশের সাবেক ইন্সপেক্টর জেনারেল জাকির হোসেনকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

অনেক রাজনীতিবিদ গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কায় ছিলেন। শেখ মুজিব কয়েক দিনের জন্য গা-ঢাকা দেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর অনেক দিনের রাজনৈতিক সাথি তৎকালীন ন্যাপ নেতা মহিউদ্দিন আহমেদ চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন :

> আইয়ুবের সামরিক শাসন জারির সঙ্গে সঙ্গে আমরা শেখ মুজিবুর রহমানকে আত্মগোপনের পরামর্শ দিয়েছিলাম। কারণ, সামরিক সরকার শেখ সাহেবকে গ্রেপ্তার করতে দৃঢ়সংকল্প ছিল। আমরা একটা গাড়িতে চড়িয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু অন্য সঙ্গীদের সেখানে রেখে তিনি দেশের ভেতরে চলে এসেছিলেন। গ্রেপ্তার বরণের জন্য তিনি তৈরি হয়েই ছিলেন। তিনি হয়তো আত্মগোপনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন না।[১]

১০ অক্টোবর রাতে আবুল মনসুর আহমদকে দুর্নীতি দমন আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। একই অভিযোগে শেখ মুজিব ১২ অক্টোবর গ্রেপ্তার হন। মওলানা ভাসানীকে ১২ অক্টোবর গ্রেপ্তার করে ধানমন্ডির একটি সরকারি বাসায় অন্তরীণ করে রাখা হয়। ২০ অক্টোবর জেলে থাকা অবস্থায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে শেখ মুজিবকে নিরাপত্তাবন্দী হিসেবে দেখানো হয়। এই আইনে তিনি জামিন-অযোগ্য বলে বিবেচিত হন। নিম্ন আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে নয়টি মামলা হয়েছিল। আটটি মামলাই খারিজ হয়ে যায়। একটি মামলায় ঢাকার জেলা ও সেশন জজ আবদুল মওদুদ ১৯৬০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর দেওয়া রায়ে দুর্নীতির দায়ে শেখ মুজিবকে দুই বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ছয়

মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্টে আপিল করেন। তাঁর মামলা পরিচালনা করেছিলেন সোহরাওয়ার্দী। ১৯৬১ সালের ২১ জুন শেখ মুজিব হাইকোর্টের রায়ে ওই মামলা থেকে মুক্ত হন।[২]

জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করার পরপরই প্রেসিডেন্ট মির্জা বুঝতে পারলেন, ক্ষমতার চাবিটি তিনি অজান্তেই হাতছাড়া করে ফেলেছেন। ক্ষমতা এখন সেনাবাহিনীর হাতে এবং জেনারেল আইয়ুবের হাতে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ। মির্জার আর কিছু করার ছিল না। ২৭ অক্টোবর রাতে তাঁকে সরিয়ে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্টের গদি দখল করলেন। মির্জাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হলো।

আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ হয়নি। পাকিস্তানের জাতির পিতা প্রয়াত মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহ এক বিবৃতিতে বলেন, 'রাজনীতি থেকে মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার বিদায় পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছে। জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে নতুন যুগের সূচনা হলো।'[৩]

১৯৫৯ সালের ৭ আগস্ট প্রেসিডেন্ট আইয়ুব দুটো অধ্যাদেশ জারি করেন। একটি হলো 'পোডো' (PODO—পাবলিক অফিস ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার) এবং অন্যটি হলো 'এবডো' (EBDO—ইলেক্টিভ বডিজ ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার)। পোডো আইন প্রয়োগ করে অনেক সাবেক মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। এই আইনে বলা ছিল, কেউ যদি আদালতে দোষী প্রমাণিত হন, তাহলে এবডো আইনে তিনি ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।[৪] ১৯৫৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের ৪২ জন রাজনীতিবিদকে এবডোর মাধ্যমে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।

২৮ সেপ্টেম্বর (১৯৫৯) *ইত্তেফাক*-এর সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেপ্তার করে সামরিক আদালতে সাজা দেওয়া হয়। লেখালেখির ব্যাপারে ভবিষ্যতে সতর্ক থাকবেন—এই আশ্বাস দেওয়ার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।[৫]

দুর্নীতির মামলা দিয়ে হয়রানি করা হতে পারে এই আশঙ্কায় অনেক রাজনীতিবিদ এবডো মেনে নিয়ে রাজনীতি থেকে তখনকার মতো অবসরে চলে যান। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দিন ও মৌলভি তমিজুদ্দিন খান।[৬]

১৯৫৯ সালের ৭ ডিসেম্বর শেখ মুজিব জেল থেকে ছাড়া পান। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে দুর্নীতির একটি মামলা সচল থাকে। ১৯৬০ সালের ১৮ জুলাই সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে এবডো প্রয়োগ করা হয়।[৭]

সামরিক আইন জারির দুদিন পর ১০ অক্টোবর (১৯৫৮) এক সংবাদ সম্মেলনে আইয়ুব খান ঘোষণা করেছিলেন, জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তবে অন্য কোনো দেশের সংবিধানের নকল নয়, দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনায় এনে দেশজ একটি ব্যবস্থা উদ্ভাবনের মাধ্যমে।[৮]

১৯৫৯ সালের ৩০ এপ্রিল থেকে ১ মে করাচিতে এবং একই বছর ১২-১৩ জুন নাথিয়াগালিতে গভর্নরদের সম্মেলনে নতুন শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়। ২৬ অক্টোবর আইয়ুব খান নিজেই নিজেকে ফিল্ড মার্শাল হিসেবে পদোন্নতি দেন। 'বিপ্লবের' প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে ২৬ অক্টোবর তিনি 'বেসিক ডেমোক্রেসি' বা মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের ঘোষণা দেন। ইউনিয়ন বোর্ডকে ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং জেলা বোর্ডকে জেলা কাউন্সিল নাম দেওয়া হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬০ সালের ১১ জানুয়ারি। পাকিস্তানের দুই অংশ থেকে ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁদের মৌলিক গণতন্ত্রী বা বেসিক ডেমোক্র্যাট (সংক্ষেপে বিডি মেম্বার) নামে অভিহিত করা হলো। প্রতিটি ইউনিয়নে নির্বাচিত বিডি মেম্বাররা তাঁদের মধ্য থেকে একজন করে চেয়ারম্যান নির্বাচন করলেন। সমালোচকেরা বললেন, আইয়ুব খান ৮০ হাজার ফেরেশতা পয়দা করেছেন। ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি একটি গণভোটের আয়োজন করা হয়। ভোটারদের কাছে একটাই প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মদ আইয়ুব খান, হিলাল-ই-পাকিস্তান, হিলাল-ই-জুরত-এর ওপর আপনার কি আস্থা আছে? বিডি মেম্বাররাই শুধু ভোটার। তাঁরা হ্যাঁ-না ভোট দিলেন। ৯৬ দশমিক ৬ শতাংশ বিডি মেম্বারের 'আস্থা ভোট' পেয়ে আইয়ুব খান ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন। পাকিস্তানের জন্য নতুন একটা সংবিধান তৈরির লক্ষ্যে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে একটি সংবিধান কমিশন গঠন করেন। কমিশন ১৯৬১ সালের ৬ মে প্রেসিডেন্টের কাছে রিপোর্ট জমা দেয়।[৯]

মৌলভি তমিজুদ্দিন খান পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের সহসভাপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থার ঘোর বিরোধী। আইয়ুব খানের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে তাঁর খোলামেলা কথা হয়। আইয়ুব খানের বর্ণনায় বিষয়টি উঠে এসেছে :

> আইয়ুব : আপনার আপত্তিটা কোথায়?
>
> তমিজ : মুসলিম ইতিহাস এবং আমাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় সব সময় এক ব্যক্তির শাসন দেখেছি। আমার ভয় হয় পাছে আমরা ওই অবস্থায় ফিরে যাই, যদিও আমরা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র পেয়েছি।

আইয়ুব : যদি এটা মুসলমানদের রক্তের মধ্যেই থাকে, কীভাবে এ থেকে বেরিয়ে আসবেন? আপনি কি একজন একনায়ক এবং একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের মধ্যে পার্থক্য দেখেন না? যুক্তরাষ্ট্রে কি প্রেসিডেন্ট নেই এবং যুক্তরাষ্ট্র কি গণতান্ত্রিক নয়? আপনি কেমন করে সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে বলেন, যেখানে মুসলিম লীগ ছাড়া দশ-পনেরোটা রাজনৈতিক দলের কোনোটারই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচি নেই?

তমিজ : শুধু দুটো দল থাকবে এমন একটা আইন আমরা করতে পারি।

আইয়ুব : তমিজুদ্দিন সাহেব, আইন করে যদি মানুষের বিবেক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাহলে সব মুসলমানকে এক গোত্রে নিয়ে আসেন না কেন? মুসলমানদের মধ্যে ৭২টা ফেরকা আছে, যদিও সবাই কোরআন থেকে প্রেরণা খোঁজে। আইনের কৌশল দিয়ে মানুষের বিবেক নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

তমিজ : তবুও আমি সংসদীয় সরকারব্যবস্থা চাই।

কথাবার্তা বলার জন্য আমি যাঁদের দাওয়াত দিয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে নুরুল আমিনও ছিলেন। তিনি ছিলেন চুপচাপ। আমার মনে হয় তিনি এই বিতর্ক থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৌলভি তমিজুদ্দিন কথা বলছিলেন আন্তরিক বিশ্বাস থেকেই, যদিও তা ছিল অবাস্তব। আমি তাঁর সাহসের প্রশংসা করি।...

আসল কথা হলো, সংসদীয় ব্যবস্থা কার্যকর হয় যদি সুসংগঠিত দল থাকে, অল্পসংখ্যক দল এবং যাদের আছে সুনির্দিষ্ট আর্থসামাজিক কর্মসূচি।...একটা দায়িত্বশীল সরকার জনমতের স্বেচ্ছাচারের কাছে বন্দী থাকতে পারে না।

আপনাকে থাকতে হবে জনগণের সামনে এবং জনগণকে আপনার নির্দেশিত পথে পরিচালনা করতে হবে। আমার লক্ষ্য হলো জনগণের ঐক্য এবং দেশের উন্নয়ন। এসব লক্ষ্য হাসিল করার জন্য দরকার একটা স্থিতিশীল ও প্রতিনিধিত্বশীল সরকার, প্রশাসনের ধারাবাহিকতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সুচিন্তিত কর্মসূচি। ধর্ম ও আদর্শের প্রয়োজনীয় নীতিগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে জাতিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে দ্রুত নিয়ে যেতে হবে।

ইতিহাসের ক্ষতগুলো সারিয়ে ফেলার কথা বলা সহজ। বাস্তবে এটা নিয়ে কাজ করা কঠিন। আপনি কেমন করে সংসদীয় ব্যবস্থার কথা বলেন, যখন আপনার দেশে বড় জোতদাররা হাজার হাজার ভোটকে প্রভাবিত করে? যখন দশ-পনেরোটা রাজনৈতিক দল কোনো কর্মসূচি ছাড়াই কথা বলে, তখন কীভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র কিংবা স্থিতিশীলতা আসবে? কীভাবে আপনি সংসদীয় গণতন্ত্র চালু রাখবেন, যেখানে পীর-ফকিররা মানুষকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে? আমরা যেখানে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর্যায়ে পৌছাতে পারিনি, সেখানে কেমন করে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকবে?

প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্য সবচেয়ে সহজ হলো ইংরেজ, মার্কিন কিংবা রুশদের কিছু পাঠ্যবই হাতে নিয়ে বলা যে, তারা এভাবে এটা করেছে এবং আমরা তাদের অনুসরণ করব না কেন। মোদ্দা কথা হলো, এটা কি কার্যকর হবে? মানুষ কি এটা মন থেকে মেনে নেবে? তারা কি এটাকে নিজেদের মনে করবে? যদি না করে, তাহলে আমাদের সব চেষ্টা বিফলে যাবে।[১০]

১৯৬২ সালের ২৪ জানুয়ারি ঢাকায় আতাউর রহমান খানের বাসায় এক গোপন বৈঠকে সোহরাওয়ার্দী, মানিক মিয়া, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ ও শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক শাসন ও খসড়া সংবিধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। ঢাকা থেকে করাচি ফিরে যাওয়ার পর ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল হয়। ছাত্র আন্দোলনের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। আন্দোলন ঢাকার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি মানিক মিয়া, আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, কোরবান আলী, কফিলউদ্দিন চৌধুরী, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, শেখ ফজলুল হক মণি, বদরুল হক বাচ্চু, কে এম ওবায়দুর রহমান, গাউস কুতুবউদ্দিন, আবদুর রশীদসহ অনেকেই গ্রেপ্তার হন।[১১]

আইয়ুব খানের প্রথম মন্ত্রিসভায় মনজুর কাদের ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী। তাঁরা দুজনই ছিলেন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পক্ষে। মনজুর কাদের প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে বোঝাতে পেরেছিলেন যে 'জনমত' হচ্ছে একটা বিপজ্জনক মিথ এবং একে উৎসাহ দেওয়া ঠিক হবে না। আইয়ুব খান প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা—শুধু এই তিনটি বিষয়ের দেখভাল করবে। কিন্তু ভুট্টো চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সর্বময় ক্ষমতা দিতে। তিনি প্রদেশে কোনো আইনসভাও রাখতে চাননি। তার যুক্তি ছিল, প্রাদেশিক সরকার হবে প্রেসিডেন্টের 'প্রতিনিধি' এবং প্রেসিডেন্টের হাতে সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে।[১২]

সামরিক সরকারের আইনমন্ত্রী বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের একজন গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। খসড়া সংবিধানের ওপর তিনি ১৯৬১ সালের ৫ মে প্রেসিডেন্টের কাছে লিখিতভাবে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর মন্তব্য ছিল, একসঙ্গে থাকার ইচ্ছার ওপর জাতীয় সংহতি নির্ভর করে। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, ভীতি এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা দরকার। তিনি প্রদেশগুলোকে

আলাদা অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করার দাবি জানান। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে বলেন :

১) কেন্দ্রীয় সরকার শুধু দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, আন্তপ্রদেশ যোগাযোগ ও মুদ্রা—এ কয়টি বিষয় দেখবে। বাকি সব বিষয় প্রাদেশিক সরকারের আওতাধীন থাকবে।
২) সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হবে এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদ গঠন করতে হবে। প্রাদেশিক গভর্নরকে ওই প্রদেশের অধিবাসী হতে হবে।
৩) প্রদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রাদেশিক বিষয়গুলো নিয়ে প্রদেশের জন্য আলাদা সংবিধান হতে পারে।
৪) জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নিজ নিজ বাজেট তৈরি করবে।
৫) অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় রেখে কেন্দ্রে ও প্রদেশে আইনসভায় ১০০ জনের বেশি সদস্য থাকার দরকার নেই।
৬) কেন্দ্রীয় সরকারের খরচের উৎস নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের খরচের ন্যায্য অংশ প্রদেশগুলো পাবে।
৭) দুই প্রদেশ থেকে পালাক্রমে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ পূরণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় দুই প্রদেশের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে।
৮) জাতীয় পরিষদের স্থায়ী ঠিকানা হবে ঢাকা, যা হবে দ্বিতীয় রাজধানী।
৯) কেন্দ্রীয় সরকারের সব চাকরিতে সমতা আনতে হবে।
১০) জরুরি অবস্থায় বা আক্রান্ত হলে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ নিয়ে প্রেসিডেন্ট প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।
১১) প্রেসিডেন্ট ও গভর্নরের অপসারণের (ইমপিচ) ব্যবস্থা থাকতে হবে।
১২) প্রয়োজনে সংবিধান মাঝেমধ্যে সংশোধনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।[১৩]

গভর্নর লে. জেনারেল আজম খানের সঙ্গে বিচারপতি ইব্রাহিমের সখ্য ছিল। আজম খান পূর্ব পাকিস্তানের দাবিদাওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। বিচারপতি ইব্রাহিমের ৪ ও ৯ মার্চের (১৯৬২) ডায়েরি থেকে জানা যায় :

> গভর্নর আজমের সঙ্গে প্রায় সাড়ে নয়টায় সাক্ষাৎ হলো।...আমি বললাম, আমার রিঅ্যাকশন পরিষ্কার। এই কনস্টিটিউশন পাকিস্তানকে মরণ আঘাত দিয়েছে।...প্রেসিডেন্ট সেদিন আমাকে রিজাইন না দিতে অনুরোধ করায় দিই নাই। কিন্তু এখন কী করি? আমার আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছা করছে না। আজম বলল, 'এ কে খানের সঙ্গে বুঝে দেখুন। হাফিজুর রহমানের সঙ্গে বুঝে দেখুন। (তাঁরা দুজন তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী)। আমি পশ্চিম পাকিস্তান যাচ্ছি, সেখানকার অবস্থা দেখে এসে পরে বলব।' হঠাৎ আজম জিজ্ঞাসা করল, 'জিওসি ওয়াসিউদ্দিন সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?' আমি বললাম, তাঁর বাবাকে (খাজা শাহাবুদ্দীন) চিনি, কিন্তু ওয়াসিউদ্দিন সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা নেই।

আজমের কথায় বুঝলাম ওয়াসিউদ্দিন জুলুম করে আন্দোলন থামানোর পক্ষপাতী এবং এ বিষয়ে আজমের সঙ্গে তার মতানৈক্য হয়েছে।...

আজমের কাছে শুনলাম, জাকির হোসেন মোসলেম হলের (সলিমুল্লাহ মুসলিম হল) ছাত্রদের জন্য ৫০০ মশারি নিয়ে আসছে। ঘুষ! কিন্তু ঘুষে কুলাবে কি?...

আজ (৯ মার্চ) এ কে খান করাচি যাওয়ার পথে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি বললেন, 'ইলেকশনে দাঁড়াব।' অল্প দিনে এত পরিবর্তন! আমি বললাম, আপনি না বলেছিলেন কনস্টিটিউশন প্রবর্তন করার পর আমার সঙ্গে রিজাইন দেবেন? তখন আর জবাব নেই—চুপ।[১৪]

বিচারপতি ইব্রাহিম ১৯৬২ সালের ১১ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। ২০ এপ্রিল আজম খান পদত্যাগপত্র জমা দেন।[১৫]

১৯৬২ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানে নতুন সংবিধান চালু করা হয়। সেই সঙ্গে চালু হয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা। নতুন সংবিধান অনুযায়ী ৮০ হাজার বিডি মেম্বারের ভোটে ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদ এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়। জাতীয় পরিষদের আসন ছিল ১৫০টি। এ ছাড়া মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত ছয়টি আসন ছিল। এই আসনের অর্ধেক ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্দলীয় ভিত্তিতে।[১৬]

জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ৮ জুন (১৯৬২)। ওই দিন সামরিক আইন তুলে নেওয়া হয়। প্রথম অধিবেশনে ফরিদপুরের মৌলভী তমিজুদ্দিন খান স্পিকার নির্বাচিত হন।

১৯৬২ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচন নির্দলীয় ভিত্তিতে হলেও আওয়ামী লীগের ১২ জন এই পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে নির্দলীয় আরেকজন আওয়ামী লীগে যোগ দেন। আওয়ামী লীগের সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এ এইচ এম কামারুজ্জামান (রাজশাহী), সোহরাব হোসেন (যশোর), এম আর সিদ্দিকী (চট্টগ্রাম) ও মিজানুর রহমান চৌধুরী (কুমিল্লা)।[১৭]

৬ জুন (১৯৬২) শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে ছাড়া পান। আইয়ুব খানের দেওয়া সংবিধান গ্রহণযোগ্য নয়, এ ঘোষণা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নয়জন রাজনৈতিক নেতা ১৯৬২ সালের ২৪ জুন একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে সই দেন মুসলিম লীগের নুরুল আমিন ও মোহন মিয়া, আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান, কৃষক-শ্রমিক পার্টির হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া) ও পীর মোহসেনউদ্দিন (দুদু মিয়া) এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মাহমুদ আলী।[১৮] বিবৃতিতে বলা হয়:

...স্থায়ী ও সহজে কার্যক্ষম শাসনতন্ত্রই জাতীয় সংহতি ও স্থায়িত্বের পূর্বশর্ত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সত্যিকার গণপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক প্রণীত না হইলে কোনো শাসনতন্ত্রই টেকসই হইতে পারে না।...

রাজনৈতিক দলই হইল প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের প্রাণবায়ু।...রাজনৈতিক দলবর্জিত পরিষদ ও স্বার্থ শিকার ব্যতীত অন্য কোনো দায়িত্ববোধ সদস্যদের প্রভাবিত করিতে পারে না।...এমতাবস্থায় দেশে রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠার পথে যা কিছু অন্তরায়, উহার অবসান ঘটাইতে হইবে।...[১৯]

১৯৬২ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে বিনা বিচারে আটক অনেক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯ আগস্ট সোহরাওয়ার্দী জেল থেকে ছাড়া পান। তিনি নয়জন নেতার বিবৃতিকে সমর্থন করেন। মওলানা ভাসানী অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি পান ৩ নভেম্বর।

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের পরপরই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের একটি কনভেনশন ডাকেন। কনভেনশনে যোগ দেওয়া অধিকাংশ লোকই ছিলেন মুসলিম লীগের। ৪ সেপ্টেম্বর (১৯৬২) অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে আইয়ুব খান মুসলিম লীগ পুনরুজ্জীবিত করেন। সভাপতি হন চৌধুরী খালেকুজ্জামান। পরে অবশ্য আইয়ুব খান নিজেই সভাপতির পদটি নিয়ে নেন। এর পর থেকে মুসলিম লীগের এই অংশটি 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' নামে পরিচিত হয়। মুসলিম লীগের যাঁরা এই কনভেনশনে যোগ দেননি, তাঁরা ২৭ নভেম্বর (১৯৬২) একটি কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ পুনর্গঠন করেন। এর সভাপতি হন খাজা নাজিমুদ্দিন। মুসলিম লীগের এই অংশটি 'কাউন্সিল মুসলিম লীগ' নামে পরিচিত হয়।

১৯৬১ সালের শেষ দিকে *ইত্তেফাক* পত্রিকার সম্পাদক মানিক মিয়ার উদ্যোগে শেখ মুজিবের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির যোগাযোগ হয়। আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করার ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টিতে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকবার বৈঠক হয়। এসব বৈঠকে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে মণি সিংহ ও খোকা রায় অংশ নেন। মণি সিংহ ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলার জন্য শেখ মুজিবকে অনুরোধ করেছিলেন।[২০]

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল এবং ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতার ব্যাপারে তাঁরা আন্তরিক ছিলেন। ছাত্রলীগের সঙ্গে যৌথভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মোহাম্মদ ফরহাদ অনুঘটকের কাজ করেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের দেখভাল করতেন।[২১]

১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর পাকিস্তানের শিক্ষাসচিব এস এম শরীফের নেতৃত্বে ১০ জন শিক্ষাবিদকে সদস্য করে সরকার একটি জাতীয় শিক্ষানীতি

তৈরির ঘোষণা দেয়। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে শরীফ কমিশন প্রেসিডেন্টের কাছে তার রিপোর্ট জমা দেয়। পাকিস্তানের সংহতির কথা মাথায় রেখে এই রিপোর্টে একটা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়। সামরিক আইন উঠে যাওয়ার পর শরীফ কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র আন্দোলন হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন যৌথভাবে এই আন্দোলন করে। তারা ১৭ সেপ্টেম্বর (১৯৬২) হরতাল ডাকে। ওই দিন ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের গুলিতে বাবুল ও মোস্তফা ঘটনাস্থলেই নিহত এবং ওয়াজিউল্লাহ নামে একজন আহত হন। ওয়াজিউল্লাহ পরদিন মারা যান।[২২] তিন দিনের মাথায় সরকার শরীফ কমিশনের রিপোর্টের বাস্তবায়ন স্থগিত ঘোষণা করে।[২৩]

শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দুই বছরের স্নাতক পাস কোর্স তিন বছরের করার প্রস্তাব ছিল। ছাত্রদের বিরোধিতার ফলে কমিশনের রিপোর্ট আর কার্যকর করা হয়নি। ইতিমধ্যে যাঁরা স্নাতক পাস কোর্সে তৃতীয় বর্ষে উঠেছিলেন, তাঁদের বিনা পরীক্ষায় স্নাতক-উত্তীর্ণ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। এর ফল হয় মারাত্মক। পরীক্ষা না দিয়ে 'অটোপ্রমোশন' পাওয়া এসব ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্র পরে নানা অসুবিধায় পড়েছিলেন। আন্দোলন যে সব সময় যৌক্তিক ছিল,



১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে ঢাকার পল্টন ময়দানে ছাত্রসংগঠনগুলোর জনসভা। বক্তৃতা করছেন ছাত্রলীগের সভাপতি শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন। সামনের সারিতে বসা, বাঁ থেকে কাজী জাফর আহমদ ও আবুল হাসনাত, দ্বিতীয় সারিতে সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক। পেছনে দাঁড়ানো সিরাজুল আলম খান

তা বলা যাবে না। তবে এই আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্রনেতারা আইয়ুববিরোধী বৃহত্তর রাজনৈতিক জোয়ার তৈরির একটা সুযোগ পেয়ে যান।

বিরোধীদলীয় নেতাদের উপলব্ধি হলো, একটা দলহীন ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চ তৈরি করা দরকার। এ প্রক্রিয়ায় শামিল হলো আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী। তারা একসঙ্গে বসে ৪ অক্টোবর (১৯৬২) ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) তৈরি করল।

২৮ অক্টোবর (১৯৬২) কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী আবদুল মোনায়েম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। মোনায়েম খান ১৯৬৩ সালে স্বাধীনচেতা অধ্যাপক ড. মাহমুদ হোসেনকে সরিয়ে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ওসমান গণিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেন। ড. ওসমান গণি মোনায়েম খানের অনুগত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষককে নিয়ে সরকারপন্থী একটি চক্র গড়ে তোলেন। এই চক্রের সদস্য ছিলেন গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আজিজ, রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মফিজুল্লাহ, গণিতের শিক্ষক ও ঢাকা হলের (পরে শহীদুল্লাহ হল) প্রভোস্ট ড. মুশফিকুর রহমান এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী। গতিক সুবিধের নয় দেখে মতিন চৌধুরী আণবিক শক্তি কমিশনে একটি কাজ জুটিয়ে করাচি চলে যান এবং আইয়ুব সরকারের পতনের পর ভোল পাল্টে ফেলেন।[২৪]

আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ শেষ করা। ১৯৫৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরে আতাউর রহমান খান মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে শহীদ মিনারের পরিকল্পনা ও নকশা তৈরির জন্য স্থপতি হামিদুর রহমানকে দায়িত্ব দেন। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লে. জেনারেল আজম খান শহীদ মিনার তৈরির ব্যবস্থা করেন। ১৯৬৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষাশহীদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম এই শহীদ মিনার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।[২৫]

ত্রিপুরা মিশন

পাকিস্তান রাষ্ট্রটি অনেক বাঙালিই মেনে নেননি। কথাটি মুখ ফুটে বলার মতো পরিস্থিতি ছিল না। পূর্ব বাংলা স্বাধীন করার জন্য শেখ মুজিব যে কত বেপরোয়া ছিলেন, তার একটা বিবরণ পাওয়া যায় ছাত্রলীগের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের ডাকাবুকো নেতা শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেনের কাছ থেকে। প্রসঙ্গ একটি প্রচারপত্র। শাহ্ মোয়াজ্জেমের ভাষ্য উদ্ধৃত করা হলো :

> উনি (মুজিব) নিজে লিফলেট ড্রাফট করছেন। 'পূর্ববঙ্গ মুক্তি ফ্রন্ট' নাম দিয়া সাইকেলে প্যাডেল কইরা প্রেসে গিয়া নিজেই ছাপছেন। আমাকে একটা সাইকেল প্রেজেন্ট করছিলেন। উনি আমাকে ডাকলেন। আমি ওই সাইকেল চালিয়েই গেলাম। উনি বললেন, 'তোর বিশ্বস্ত লোক নিয়া এগুলি ডিস্ট্রিবিউট করবি।' তখন মার্শাল ল, ধরা পড়লে...। আমি নিজে, ওবায়েদকে নিলাম, সিরাজকে নিলাম, মণিকে নিলাম, আর ফরিদপুরের আনিস, ছাত্রলীগ করত। পাঁচজনকে নিয়া টিম করলাম। রাত বারোটার পর আমরা বেরোতাম। ধরা পড়লে স্ট্রেট ফাঁসি। কিন্তু নেতার নির্দেশে আমরা এটা করছি। চাদর গায়ে দিয়া সাইকেল নিয়া বিভিন্ন অ্যাম্বেসির গেটের সামনে ফালায়া দিয়া সাইকেল চালায়া চইলা আসতাম। দিস উই ডিড। এবং উনারই নির্দেশে।
>
> এখন অনেকেই স্বাধীনতার কথা নানাভাবে মনের মাধুরী মিশাইয়া বলে। বাট দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট। বাংলাদেশপন্থী কেউ ছিল না, আমরাই ছিলাম। শেখ সাহেবের অনুসারীরাই ছিলাম। আমাদের বলত ওরা (কমিউনিস্টরা) ইললিটারেট গ্র্যাজুয়েটের শিষ্য।[১]

১৯৬১ সালের শেষের দিকে আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে কয়েকটি গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভাগুলোয় আওয়ামী লীগের পক্ষে শেখ মুজিব ও মানিক মিয়া এবং কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে মণি সিংহ ও খোকা রায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথম বৈঠকেই তাঁরা আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে একমত হন। এসব বৈঠক সম্পর্কে খোকা রায় বলেছেন :

> ...শেখ মুজিবুর রহমান বারবার বলেছিলেন যে পাঞ্জাবের 'বিগ বিজনেস' যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করছিল ও দাবিয়ে রাখছিল, তাতে 'ওদের সাথে আমাদের

থাকা চলবে না। তাই এখন থেকেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে; আন্দোলনের প্রোগ্রামে ওই দাবি রাখতে হবে', ইত্যাদি।

তখন আমরা (আমি ও মণিদা) শেখ মুজিবকে বুঝিয়েছিলাম যে কমিউনিস্ট পার্টি নীতিগতভাবে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবি সমর্থন করে, কিন্তু সে দাবি নিয়ে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পরিস্থিতি তখনো ছিল না।

'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দাবি নিয়ে ওই সব আলোচনায় পরের বৈঠকে শেখ মুজিব আমাদের বলেছিলেন, 'ভাই, এবার আপনাদের কথা মেনে নিলাম। আমাদের নেতাও (অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দী সাহেব) আপনাদের বক্তব্য সমর্থন করেন। তাই এখনকার মতো সেটা মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার কথাটা থাকল।'[২]

'স্বাধীন পূর্ববঙ্গ' নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আলোচনা ছিল। ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে পার্টির প্রথম কংগ্রেসে গৃহীত 'কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট ও প্রস্তাবাবলি'তে বিষয়টির উল্লেখ আছে। স্বাধীন পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট থেকে এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

১৯৫৯-৬১ সালে স্বায়ত্তশাসন দাবির অঙ্গ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট হিসেবে গণ্য করা এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলাইয়া একটি 'কনফেডারেশনের' দাবি উত্থাপিত হইয়াছিল। এমনকি 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের' একটি চিন্তাও ১৯৫৯ সাল হইতে এখানকার বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত মহলে দেখা যাইতেছিল।...

এই অবস্থায়, স্বাধীন পূর্ববঙ্গ দাবি সম্পর্কে পার্টির আশু করণীয় এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামো ভবিষ্যতে কী রূপ গ্রহণ করিতে পারে তাহা বিচার করিয়া পার্টির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির এক বৈঠক হইয়াছিল। ওই বৈঠকের 'স্বাধীন পূর্ববঙ্গ' দাবি সম্পর্কে আশু করণীয় বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি একটি 'রাজনৈতিক চিঠি' (১৪ জুলাই ১৯৬২) পার্টির ভিতর প্রচার করিয়াছিল। সে রাজনৈতিক চিঠিতে ধর্মীয় ভিত্তিতে গঠিত বহুজাতিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের জাতি সমস্যা সমাধানের পথ হিসেবে 'পাকিস্তানের অধিকার' প্রতিষ্ঠা 'আমাদের মূল লক্ষ্য' এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে 'এক ইউনিট বিলোপ ও ওখানকার বিভিন্ন জাতির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আমাদের বর্তমান দাবি' প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়া 'স্বাধীন পূর্ববঙ্গ' দাবি সম্পর্কে বলা হয়েছিল, 'এই দাবির মধ্যে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটি নিহিত রহিয়াছে' এবং 'ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া উঠা আমরা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলিয়া মনে করি না। কিন্তু, বর্তমানে যেভাবে..."স্বাধীন পূর্ব বাংলার" দাবি উঠিতেছে তাহা রাজনৈতিক দিক হইতে যুক্তিসংগত ও সমর্থনযোগ্য নয়। তাহা ছাড়া, বর্তমানে এইরূপ দাবি উত্থাপন করা আমরা অপরিপক্ব ও অসময়োচিত মনে করি।...

'পূর্ব বাংলার জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের প্রধান শক্তি হইবে এখানকার শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতি মানুষরা।' কিন্তু এই 'ব্যাপক জনসাধারণ স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কথা চিন্তা করেন না।' 'এই পরিস্থিতিতে "স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের" দাবি একটি হঠকারী দাবি।' তাই, 'বর্তমানে আমরা পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করিব।'

কিন্তু, 'যাহারা "স্বাধীন পূর্ব বাংলা" দাবি উত্থাপন করিবেন আমরা তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকিব। আমাদের খেয়াল রাখিতে হইবে যে এই দাবির মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ রহিয়াছে, যদিও বর্তমান অবস্থায় এই দাবি হঠকারী, আমরা এই কথা তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিব।...

'...পাকিস্তানের বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামো স্থায়ী হওয়ার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা যত বৃদ্ধি পাইবে এবং জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আন্দোলন যত জোরদার হইবে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শগত ভিত্তিও তত দুর্বল হইয়া পড়িবে। এই অবস্থায়, বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি বিশেষত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মতো দুটি পৃথক অঞ্চল নিয়া একটি মাত্র রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং, ভবিষ্যতে পাকিস্তান রাষ্ট্র একাধিক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িতে পারে (জেলা ইউনিটগুলির নিকট প্রেরিত কেন্দ্রীয় কমিটির দলিল, ২৮ আগস্ট ১৯৬২)।'[৩]

শেখ মুজিব তখনকার মতো চুপচাপ থাকাই ভালো মনে করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা তাঁর মাথায় থেকে গেল। এ নিয়ে দলের মধ্যে কথাবার্তা বলার মতো অনুকূল পরিবেশ ছিল না। সম্ভবত দলে তিনি আস্থাভাজন এমন কাউকে পাননি, যাঁর সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার বিষয়টি নিয়ে মন খুলে কথা বলা যায়। এবার তিনি অন্য রকম একটা উদ্যোগ নিলেন। এটাকে উদ্যোগ না বলে 'অভিযান' বলাই ভালো। প্রথাগত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে গিয়ে এ ধরনের একটি পরিকল্পনা এর আগে এ দেশে আর হয়নি।

পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার নিজস্ব চিন্তাভাবনা ছিল শেখ মুজিবের। এ জন্য তিনি ভারতের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন মনে করেছিলেন। ভারত সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য তিনি গোপনে আগরতলায় গিয়েছিলেন। তাঁর এ গোপন মিশন এতই রোমাঞ্চকর ছিল যে তা যেকোনো গোয়েন্দা কাহিনিকেও হার মানায়। এ গোপন মিশন সম্পর্কে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা রেজা আলীর বক্তব্য শোনা যাক :

মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আমার পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১ বা ২ তারিখের দিকে উনি আমাকে ডেকে বলেছিলেন, 'তুই আমার সঙ্গে একখানে যাবি।' যত দূর মনে পড়ে, ৩ তারিখেই রওনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোথায় যাব, আমাকে এ ব্যাপারে আগে থেকে কিছুই বলা

হয়নি। যাওয়ার আগের মুহূর্তে আমাকে তিনি বলেছিলেন একটা ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট ঠিক করতে। তখনকার দিনে কুপে হতো। দুজন থাকতে পারত। নারায়ণগঞ্জ থেকে দুজন কুপেতে উঠবে। এই অ্যাডভেঞ্চারমূলক কাজে তখন আমি মর্তুজাকেও জড়িয়েছিলাম। আমি গাড়িতে করে তাঁকে নিয়ে যাই টঙ্গী স্টেশনে। গাড়ি চালিয়েছিল অন্য দুজন। স্টেশনের পেছন দিকে তখন অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আমরা দাঁড়িয়ে। নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা দুজন নেমে গিয়েছিল। আমি আর মুজিব ভাই ট্রেনে উঠে পড়ি। আমার দায়িত্ব ছিল মুজিব ভাইকে নিয়ে সিলেটের ট্রেনে উঠে যাওয়া। উনি তখনো বলেননি কোথায় নামবেন। সারা রাত আমরা ট্রেনে বসে ছিলাম। রাত তিন-চারটার দিকে গাড়ি যখন শ্রীমঙ্গলে এসে থামল, তখন তিনি বললেন, 'তুই দরজাটা খুলে একটু দাঁড়া।' দরজা খুলেই দেখি প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন মোয়াজ্জেম আহমদ চৌধুরী। উনি ওখানে থাকবেন, সেটা আমি জানতাম না। তিনি সম্পর্কে আমার মামা হন, তো তাঁর হাওলায় মুজিব ভাইকে দিয়ে আমি সিলেটে চলে গেলাম। তখন আমার সন্দেহ হয়েছিল, কেন ওখানে যাচ্ছিলেন উনি। আমাকে যেহেতু কিছু বলেননি, সে জন্য আমি জিজ্ঞেসও করিনি কখনো। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে এটা তাঁর ইন্ডিয়ায় যাওয়ার একটা উদ্যোগের অংশ। শুধু ফরহাদ ভাইকে বিশ্বাস করে বলেছিলাম যে মুজিব ভাই তাঁকে একটা জায়গায় আমাকে নিয়ে যেতে বলেছিলেন।[৪]

শেখ মুজিবের এই রেল ভ্রমণের কোনো রেকর্ড রেলওয়ে বিভাগের কাছে ছিল না। ছাত্র ইউনিয়নের নেতা গোলাম মর্তুজা ও তাঁর সঙ্গীর নামে কেনা টিকিটে তিনি এবং রেজা আলী রেলে চড়েছিলেন। গোপনীয়তার ব্যাপারটিতে কোনো ফাঁক ছিল না। উল্লেখ্য, মোয়াজ্জেম আহমদ চৌধুরী কনভেনশন মুসলিম লীগ করতেন। তিনি ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, শেখ মুজিবের একটা নিজস্ব নেটওয়ার্ক ছিল। এর সঙ্গে দলের কোনো সম্পর্ক ছিল না। পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও গোপনীয়তার অঙ্গীকারের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল এই নেটওয়ার্ক।

১৯৬২ সালের মাঝামাঝি শেখ মুজিবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে দেশে আর সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। তাঁর মনে হলো, আইয়ুব খান অনেক বছর ক্ষমতা আঁকড়ে থাকবেন। এ জন্যই তিনি মোনায়েম খানের মতো একজন বশংবদকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর বানিয়েছেন। তখন থেকেই শেখ মুজিব স্বাধীনতার কথা চিন্তা করছিলেন। শেখ মুজিবের জীবনীকার এস এ করিমের (বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্রসচিব) বিবরণ থেকে জানা যায়, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিরাজমান তিক্ত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভারতের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তিনি ভারতের কাছ থেকে একটা

রেডিও ট্রান্সমিটার পেতে চাইছিলেন, যাতে করে সীমান্তের কাছে ভারতের মাটিতে এটা ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রচার চালিয়ে যাওয়া যায়। এ লক্ষ্যে মুজিব ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে নাসের নামের একজন বিশ্বস্ত লোককে ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের একজন কর্মকর্তার কাছে পাঠান। ওই কর্মকর্তা গোয়েন্দাকাজে নিয়োজিত ছিলেন। গোয়েন্দা নজরদারি থাকায় মুজিবের পক্ষে ওই কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব ছিল না। ঠিক হয়, আগরতলায় একজন পদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে মুজিবের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হবে। তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি, বিশেষ করে শিল্পপতি সাইদুল হাসান তাঁকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। ১৯৬২ সালের শেষ দিকে সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়।[৫]

২৭ জানুয়ারি (১৯৬৩) শেখ মুজিব চারজন সঙ্গীকে নিয়ে টঙ্গী স্টেশন থেকে রাতের ট্রেনে সিলেটের উদ্দেশে রওনা হন। ভোর চারটার দিকে তিনি শ্রীমঙ্গলে পৌঁছান। দুজন সিলেটের দিকে চলে যায়, বাকি দুজনকে নিয়ে মুজিব ট্রেন থেকে নামেন এবং ডিনস্টোন চা-বাগানে এসে উপস্থিত হন। ফিনলে কোম্পানির এ বাগানের সহকারী ব্যবস্থাপক কায়েস চৌধুরী তাঁদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করেন। একটা ল্যান্ডরোভার গাড়িতে চড়ে তাঁরা আহমদুল কবিরের মধুপুর চা-বাগানে এসে উপস্থিত হন। সেখান থেকে বাগানের এক কুলি সরদার পথ দেখিয়ে তাঁদের ত্রিপুরা সীমান্তে নিয়ে যায়। ভোর হওয়ার একটু আগে তাঁরা সীমান্তে পৌঁছান। তখন যথেষ্ট শীত পড়েছে, চারদিক কুয়াশায় ঢাকা, বন্য শূকরের উপদ্রব ছিল আশপাশের জঙ্গলে। কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই তাঁরা পৌঁছাতে সক্ষম হন। তাঁরা সীমান্তবর্তী খোয়াই মহকুমার সরকারি কর্মকর্তাদের হাতে পড়েন। ওখানকার এসডিও মুজিবের এ মিশন সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তিনি আগরতলায় মুখ্য সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মুখ্য সচিব তাঁদের সীমান্তের ওপারে ফেরত পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বাদ সাধেন।[৬] মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ ১৯৯১ সালে লেখক-প্রকাশক মফিদুল হকের সঙ্গে আলাপচারিতায় ঘটনাটি এভাবে লিখে দিয়েছিলেন :

> ১৯৬৩ ইং আমার ভাই এমএলএ শ্রী উমেশ লাল সিং সমভিব্যাহারে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ১০ জন ত্রিপুরার পালম জেলার খোয়াই মহকুমা দিয়া আমার আগরতলার বাংলোয় রাত ১২ ঘটিকায় আগমন করেন। প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর আমার বাংলো বাড়ি হইতে মাইল দেড়েক দূরে ভগ্নি হেমাঙ্গিনী দেবীর বাড়িতে শেখ সাহেব আসেন। সেখানেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর মুজিবুর ভাইয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে দেখা করি। আমার সঙ্গে ছিলেন শ্রী শ্রীরমন চিফ সেক্রেটারি। তাঁকে (শ্রীরমনকে) বিদেশসচিব শ্রীভাণ্ডারিয়ার রুমে রাখিয়া প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি। তিনি মুজিবুর রহমানকে ত্রিপুরায় থাকিয়া প্রচার করিতে সম্মত হন নাই। কারণ, চীনের সঙ্গে লড়াইয়ের পর এত বড় ঝুঁকি

নিতে রাজি হন নাই। তাই ১৫ দিন থাকার পর তিনি ত্রিপুরা ত্যাগ করেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।[৭]

রেজা আলীর বর্ণনা এবং এস এ করিমের বিবরণে সময় ও তারিখের ফারাক লক্ষ করা যায়। এতে মনে হয়, তিনি দুবার ত্রিপুরা গিয়েছিলেন। প্রথমবার ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৬৩ সালে জানুয়ারির শেষে। শেখ মুজিব ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে গ্রেপ্তার হয়ে প্রায় চার মাস জেলে আটক ছিলেন। সুতরাং ওই সময় তাঁর ত্রিপুরা যাওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি একবারই ত্রিপুরা গিয়েছিলেন এবং তা ১৯৬৩ সালে। রেজা আলীর বর্ণনায় তারিখ বিভ্রাট হতে পারে। শেখ মুজিব সেবার সোনামুড়া হয়ে কুমিল্লা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ঢাকায় পৌঁছান। ফেরার সময় কোনো প্রস্তুতি বা আয়োজন তাঁর ছিল না। ফিরে আসার পথ ছিল খুব কষ্টের। তাঁর পা ফুলে গিয়েছিল। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।[৮]

ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করার যে উদ্যোগ শেখ মুজিব নিয়েছিলেন, তার একটা বিস্ময়কর বিবরণ পাওয়া যায় ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় উপহাইকমিশনের পলিটিক্যাল অফিসার শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জির কাছ থেকে। ব্যানার্জি পুরান ঢাকার 'চক্রবর্তী ভিলা'য় থাকতেন। পাশের বাড়িতেই ছিল দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর অফিস। ১৯৬২ সালের ২৪ মার্চ মাঝরাতে *ইত্তেফাক*-এর সম্পাদক মানিক মিয়া একটি ছেলেকে পাঠিয়ে তাঁকে *ইত্তেফাক* অফিসে ডেকে নিয়ে আসেন। মানিক মিয়ার সঙ্গে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এটাই তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ। প্রায় দুঘণ্টা ধরে তাঁরা কথাবার্তা বলেন। ব্যানার্জি দেখলেন, একপর্যায়ে শেখ মুজিব ও মানিক মিয়ার কথার ধরন বদলে গেল। তাঁরা কিছু একটা বলতে বা দেখাতে চাইছেন। ব্যানার্জি জানতে চাইলেন, তাঁরা উচ্চ পর্যায়ের কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো বার্তা পৌঁছাতে চাচ্ছেন কি না। মুজিব মুখ খুললেন। বললেন, এই বৈঠক ডাকার উদ্দেশ্য হলো, তাঁরা ব্যানার্জির মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা গোপনীয় চিঠি পাঠাতে চান। মুজিব চিঠিটা ব্যানার্জির হাতে দিলেন। তাঁর মধ্যে তাড়াহুড়ো ছিল। ব্যানার্জি বললেন, চিঠিটা পাঠানোর আগে দূতাবাসের দুজন কর্মকর্তাকে সেটা দেখাতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে যখন চিঠিটা যাবে, তখন তার অনুলিপি পৌঁছে যাবে দিল্লিতে পররাষ্ট্রসচিব ও গোয়েন্দা ব্যুরোর পরিচালকের কাছে। একটু ইতস্তত করে তিনি দূতাবাসের দুই কর্মকর্তার নাম বললেন। একজন হলেন উপহাইকমিশনার সূর্য কুমার চৌধুরী এবং অন্যজন হলেন পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর স্টেশন চিফ কর্নেল এস সি ঘোষ। তাঁরা চিঠির ব্যাপারটি গোপন রাখার অঙ্গীকার করলেন।[৯]

গোপনীয় চিঠিটা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে ব্যক্তিগতভাবে সম্বোধন করে লেখা। চিঠিতে ছোট একটা ভূমিকার পর সরাসরি একটা কর্মপরিকল্পনার উল্লেখ করা হয়েছিল। মুজিব নিজেই বললেন, তিনি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সূচনা করতে চান। তিনি লন্ডনে গিয়ে সেখান থেকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনা করবেন। মানিক মিয়া ঢাকায় থাকবেন এবং *ইত্তেফাক*-এ লেখনীর মাধ্যমে প্রচারকাজ চালাবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চের মধ্যে মুজিব লন্ডনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে প্রবাসী সরকার গঠন করবেন। চিঠির শেষ প্যারায় নৈতিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক সমর্থন ও সাজসরঞ্জাম চেয়ে নেহরুকে অনুরোধ জানানো হয়। এ বিষয়ে আলাপ করার জন্য মুজিব প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গোপনে দেখা করতে ইচ্ছুক।[১০]

চিঠি পাঠানো হলো। ভারত তখন চীনের সঙ্গে যুদ্ধে বিপর্যস্ত। নেহরু তাঁর জ্যেষ্ঠ নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের বৈঠক ডেকে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। তাঁরা কেউ তখন দিল্লিতে ছিলেন না, কেউ কেউ ছিলেন দেশের বাইরে। দিল্লি থেকে খবর পাঠানো হলো, মুজিবের প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনায় আছে, তবে তাঁকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। মুজিব ভাবলেন, ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের আমলাদের কারণেই দেরি হচ্ছে। ধৈর্য হারিয়ে তিনি কৌশল পাল্টালেন। গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে তিনি আগরতলায় যান। ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী শচীন সিংয়ের সঙ্গে তাঁর কয়েক দফা বৈঠক হয়। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান। তবে এ কথা বলতে ভুললেন না যে তিনি ইতিমধ্যে ঢাকায় ভারতের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন।[১১]

আগরতলায় কিছু সময় অপেক্ষা করার পর দিল্লি থেকে জবাব এল। দেরি হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মুজিবকে পরামর্শ দেন, এর পর থেকে যেন ঢাকায় ভারতের দূতাবাসের মাধ্যমেই যোগাযোগ করা হয়, আগরতলার মাধ্যমে নয়। আগরতলাতেই মুজিবকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাঁকে সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং তা ঢাকা ভারতীয় মিশনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।[১২]

শেখ মুজিবের আগরতলা মিশন সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার, এমনকি তাঁর দলের সহকর্মীরাও ছিলেন সম্পূর্ণ অন্ধকারে। ১৯৬৩ সালের পর তিনি আর আগরতলা গিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। ভারতের সাহায্য নিয়ে পূর্ব বাংলা স্বাধীন করার রাজনৈতিক কৌশল তিনি সম্ভবত পরিবর্তন করেছিলেন।

পুনর্জন্ম

রাজনৈতিক দলগুলো মাঝেমধ্যে এমন কিছু কাজ করে, যার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল ১৯৬৩ সালে। আইয়ুবি শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য ১৯৬২ সালে যখন এনডিএফ তৈরি করা হয়, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এই প্রক্রিয়ার অংশীদার ছিল। এ সময় ন্যাপের কয়েকজন নেতা একটি উদ্যোগ নেন। লাহোরে পশ্চিম পাকিস্তান ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ আলী কাসুরীর বাসায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সামরিক সচিব ব্রিগেডিয়ার পীরজাদার সঙ্গে ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মহিউদ্দিন আহমেদ ও আহমদুল কবীরের একটা গোপন বৈঠক হয়। এ বৈঠকের সূত্র ধরেই ১৯৬৩ সালের ২ জুন রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সঙ্গে মওলানা ভাসানীর দেখা ও কথা হয়। জাতীয় পরিষদে ন্যাপের সদস্য মশিউর রহমান আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়েন। আইয়ুব-ভাসানী সমীকরণ পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানে বিরোধী দলের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এ সাক্ষাতের পরপরই ৩০ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর (১৯৬৩) ঢাকায় ন্যাপের কার্যকরী কমিটির সভায় মাহমুদ আলী কাসুরী এনডিএফ থেকে বেরিয়ে এসে ন্যাপ পুনরুজ্জীবনের পক্ষে প্রস্তাব দেন। সেপ্টেম্বরের শেষে সরকারি একটি প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে মওলানা ভাসানী পিকিংয়ে (বেইজিং) যান এবং ১ অক্টোবর চীনের প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান দেখেন। প্রতিনিধিদলে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন জাতীয় পরিষদের সদস্য মশিউর রহমান ও আখতারউদ্দিন আহম্মদ, ড. জাভেদ ইকবাল, ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা খাজা মোহাম্মদ কায়সার ও জেনারেল হাবিবুল্লাহ।[১]

চীনে মওলানা ভাসানীকে অনেক খাতিরযত্ন করা হয়। তিনি বেইজিংয়ে একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যান। পরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাও সেতুংয়ের সঙ্গে ভাসানীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়। ওই সাক্ষাতের সময় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত


১৯৬৩ সালে ভাসানী-আইয়ুব একান্ত বৈঠক, যা বদলে দিয়েছিল বিরোধী দলের রাজনীতি

জেনারেল এন এ এম রাজা উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে ওই সাক্ষাতের বিবরণ শুনেছিলেন পাকিস্তানি লেখক তারিক আলী। তারিক আলীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভাসানী তথ্যটি নিশ্চিত করেন। তারিক আলীর বর্ণনায় জানা যায় :

> মাও ভাসানীকে বললেন, এ সময় পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক খুব নাজুক। তিনি বললেন, 'আপনারা আমাদের বন্ধু। এ সময় আপনারা যদি আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন, তাহলে তা রাশিয়া, আমেরিকা ও ভারতের হাতকেই মজবুত করবে। আপনাদের কাজে নাক গলানো আমাদের নীতির বাইরে। তবু আমরা আপনাদের ধীরে এবং সাবধানে চলার পরামর্শ দিচ্ছি। আপনাদের সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব মজবুত করার জন্য আমাদের একটা সুযোগ দিন।'[২]

চীন সফর করে দেশে ফিরে মওলানা ভাসানী আইয়ুব সরকারকে সমর্থন জানান। এ নিয়ে ন্যাপের ভেতরে রাশিয়া ও চীনপন্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়।

১৯৬৩ সালের শেষ দিকে আওয়ামী লীগ একটু নড়েচড়ে বসতে শুরু করে। এনডিএফকে যে নিষ্ক্রিয়তা গ্রাস করেছিল, তা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন কেউ কেউ। ১৯৬৩ সালের ২৫ আগস্ট সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ এক সংবাদ সম্মেলনে 'মতাদর্শ-নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক দলের এক যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার

লক্ষ্যে গণকনভেনশন' ডাকার জন্য জাতীয় নেতাদের প্রতি আহ্বান জানায়।[৩] নভেম্বরের মাঝামাঝি ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের এক কর্মিসম্মেলনে রাজনৈতিক দলগুলোর পুনরুজ্জীবনের পক্ষে মত দেওয়া হয়। এই সম্মেলনে পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরের দাবি জানানো হয়।[৪]

আওয়ামী লীগের অনেক জ্যেষ্ঠ নেতা দলের পুনরুজ্জীবন চাননি। ২০ নভেম্বর (১৯৬৩) আতাউর রহমান খান ও আবুল মনসুর আহমদ ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন :

> এনডিএফ প্রতিষ্ঠার মূলনীতি ছিল এই যে দেশে পরিপূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম না হওয়া অবধি রাজনৈতিক দলগুলো পুনরুজ্জীবিত না করা। আমাদের এ লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলো পুনরুজ্জীবিত না করার ব্যাপারে আমরা জনসাধারণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ রকম এক পরিস্থিতিতে কোনো অজুহাতে আমাদের সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কাজটি দেশের রাজনীতিতে এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করবে। কাজেই এ কাজ সম্ভব নয়।[৫]

এনডিএফের মতো অবয়বহীন একটা সংগঠনের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের আস্থা ছিল না। তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল সোজাসাপটা। এ বিষয়ে তিনি ১৭ মার্চ (১৯৬৩) পল্টন ময়দানে এক জনসভায় খোলামেলা বক্তব্য দিয়েছিলেন :

> ১০ মাস আগে, একই পল্টন ময়দানে নয়জন নেতার বৈঠকের পর আমরা গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আবেদন জানাই। আমরা সেই মতো প্রস্তাবও গ্রহণ করি, কিন্তু হুজুররা আমাদের কথায় কান দেননি—আমাদের সকল আবেদন ও দাবিদাওয়া উপেক্ষা করা হয়েছে। তাই শুধু বক্তৃতা ভাষণ শুনে ঘরে ফিরে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকলে কাজ হবে না। এ জন্য দরকার নিরবচ্ছিন্ন লড়াই...।[৬]

পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে শেখ মুজিবের কোনো রাখঢাক ছিল না। জাতীয় পরিষদের ফরিদপুরের একটি নির্বাচনী এলাকায় উপনির্বাচনের কাজে সফর করে ১৯৬৩ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন :

> পরিস্থিতির চাপে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানিরা বিশ্বাস করে যে তারা এখন এক উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। এই উপনিবেশের নাগপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হলে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হবে। সরকারযন্ত্রের পাঁচ স্তম্ভ : আমলাতন্ত্র, ফেডারেল রাজধানীর অবস্থান, পুঁজি গঠন, সশস্ত্র বাহিনী ও রাজনৈতিক সমতার কোনোটিতেই পূর্ব পাকিস্তানের অংশীদারি নেই। সমতা বলতে কেবল জাতীয় পরিষদের আসনসংখ্যায় সমান প্রতিনিধিত্বকেই বোঝায় না, বরং জাতি ও রাষ্ট্রের সব বিষয়ে সমতাকে বুঝিয়ে থাকে।[৭]

১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতের একটি হোটেলে সোহরাওয়ার্দী মারা যান। দুদিন পর তাঁর মৃতদেহ ঢাকায় এনে ফজলুল হকের কবরের পাশে দাফন

করা হয়। যত দিন বেঁচে ছিলেন, দুজনের মধ্যেকার সম্পর্কে অনেক টানাপোড়েন ছিল। মৃত্যুর পর তাঁরা প্রতিবেশী হলেন। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগে পুনরুজ্জীবনবাদীদের প্রধান বাধাটি সরে গেল।

ডিসেম্বরে (১৯৬৩) কাশ্মীরে হজরতবাল মসজিদে রাখা হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র কেশ চুরি যাওয়াকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধে। তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে ঢাকায়। আতাউর রহমান খান এই দাঙ্গাকে একতরফা হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন :

> এটা দাঙ্গা নয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তো বলাই চলে না। একতরফা ব্যাপার। এক সম্প্রদায়ের দুর্বল লোকের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে।...এতে না আছে শৌর্যবীর্য, না আছে পৌরুষ। আছে ঘৃণা কাপুরুষতা-লুটতরাজ করার প্রবৃত্তি। এক সম্প্রদায়ের লোক ধরে এনে হত্যা করা। বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া। কোনো প্রতিবাদ নেই, প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। এমনকি করুণা ভিক্ষারও অবকাশ নেই। বাজার থেকে মাছ কিনে এনে তাকে আঁশ বঁটিতে ফেলে টুকরা করার মতো।
>
> এক থানায় এক মৌলভি রীতিমতো অজু করে 'বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবর' বলে সারি দিয়ে শোয়ানো কয়েকজন মানুষকে কোরবানি দেয়।
>
> একে কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা চলে?
>
> হিংস্র পশুও এমন নির্মম ব্যবহার করতে পারে না।[৮]

ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটি দলকে পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।[৯]

৯ জানুয়ারি (১৯৬৪) একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ডাকেন। সভায় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগদলীয় সদস্যদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়। ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি শেখ মুজিবের বাসায় সভা হয়। সভার ব্যাপারে কোনো আগাম পরামর্শ না করার অজুহাতে আতাউর রহমান খান ও আবুল মনসুর আহমদ সভায় যোগ দেননি। ২৬ জানুয়ারি সিদ্ধান্ত হয়, পরবর্তী ছয় সপ্তাহের মধ্যে দলের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হবে। অধ্যাপক হাফেজ হাবিবুর রহমানকে আহ্বায়ক এবং ড. আলীম আল রাজী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, বেগম রোকেয়া আনোয়ার, আবদুর রহমান খান ও তাজউদ্দীন আহমদকে সদস্য করে দলের ম্যানিফেস্টো লেখার জন্য একটি উপকমিটি তৈরি করা হয়। সভায় স্থানীয় কমিটিগুলোকে সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করতে বলা হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলো ছিল :

ক) গণতান্ত্রিক সংসদীয় সংবিধান;

খ) সর্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকার;

গ) প্রত্যক্ষ নির্বাচন;
ঘ) পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জন্য স্বায়ত্তশাসন;
ঙ) পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যকার দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বি-অর্থনীতিব্যবস্থা গ্রহণ;
চ) পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করা;
ছ) চট্টগ্রামে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন;
জ) এবডো, রাজনৈতিক দলবিধি ও নিরাপত্তা আইন বাতিল;
ঝ) রাজবন্দীদের মুক্তি ও হুলিয়া প্রত্যাহার;
ঞ) পাটের ন্যূনতম বাজারদর নির্ধারণ;
ট) মূল্যস্ফীতি রোধ;
ঠ) জামায়াতে ইসলামীর নেতা ও কর্মীদের মুক্তি।[১০]

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকার গ্রিন রোডে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সাবেক আইনমন্ত্রী বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিমের আমবাগানে এক সমাবেশে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হয়। আতাউর রহমান খান ও আবুল মনসুর আহমদ দলের পুনরুজ্জীবনের বিপক্ষে থেকে যান। এ সময় ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীও পুনরুজ্জীবিত হয়। কৃষক-শ্রমিক পার্টি পুনরুজ্জীবিত হলো না। এর নেতা-কর্মীরা এনডিএফের নামে সাংগঠনিক কাজকর্ম চালু রাখেন।[১১]

মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হয়েছিলেন। শেখ মুজিব মানিক মিয়াকে সভাপতি হিসেবে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন, 'সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর একবার আমি নিজে তাঁকে আওয়ামী লীগের সভাপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম। মানিক ভাই হেসে বলেছিলেন, "সংগঠন আপনাদের, কলম আমার।" প্রত্যাখ্যানের কী অপূর্ব সুন্দর পদ্ধতি!'[১২]

শেখ মুজিব বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিমকেও আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেছিলেন। ১৯৬৪ সালের ২৮ জানুয়ারি বিচারপতি ইব্রাহিম তাঁর ডায়েরিতে লেখেন, 'শেখ মুজিব আমাকে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে নেতৃত্ব দিতে বলেছেন। তিনি তাৎক্ষণিক জবাব চাননি, তবে বিষয়টা ভেবে দেখতে বলেছেন এবং আবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তিনি *ইত্তেফাক*-এর সম্পাদক মানিক মিয়াকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।' ৬ ফেব্রুয়ারি সকালে শেখ মুজিব আবারও যোগাযোগ করে আওয়ামী লীগে যোগ দিতে চাপ দেন। বিচারপতি ইব্রাহিম দুসপ্তাহের সময় নেন।[১৩]

Tuesday 28 JANUARY 1964

14 Magh 12 Ramazan 15 Magh

Sheikh Mujibur Rahman called on to invite me to join and lead the Awami-League. He did not ask for an immediate answer but asked me to think over & he would call on again. He said Manik Mia Editor Ittefaq would also see me.

Thursday 6 FEBRUARY 1964

23 Magh 21 Ramazan 24 Magh

Sheikh Mujibur Rahman called in the morning. He pressed me to join the Awami League. I deferred my decision for a fortnight.

বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিমের ডায়েরি : আওয়ামী লীগের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য শেখ মুজিবের অনুরোধ ও বিচারপতি ইব্রাহিমের মন্তব্য। সূত্র : সুফিয়া আহমেদ

১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সব জেলায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা হয়। ২ মার্চ (১৯৬৪) এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা ডাকেন। সভা বসে ৬-৭ মার্চ ঢাকার হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণে। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান

সম্মেলন উদ্বোধন করেন। মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিচারপতি ইব্রাহিম উপস্থিত ছিলেন। মুসলিম লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। সম্মেলনে মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশকে সভাপতি এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে কার্যনির্বাহী কমিটির পুনর্বিন্যাস করা হয়।[১৪] সম্মেলনে ৯৪৪ জন কাউন্সিলর ও ডেলিগেট যোগ দিয়েছিলেন।[১৫] এনডিএফের খোলস ছেড়ে আওয়ামী লীগের নবযাত্রা শুরু হয়।

আওয়ামী লীগের পুনরুত্থানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শেখ মুজিব। দলের তরুণেরা তাঁর পক্ষে ছিলেন। প্রবীণ নেতাদের অনেকেই ছিলেন সনাতন ধারার সোহরাওয়ার্দীপন্থী। যেহেতু সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনের বিরোধী ছিলেন, তাই তাঁর মৃত্যুর পরও কেউ কেউ এনডিএফ ছেড়ে আসতে চাননি। শেখ মুজিবকে তাঁরা মনে করতেন 'উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ক্ষমতালোভী'। ১৯৬৪ সালের মার্চে ঢাকায় এনডিএফের প্রাদেশিক সম্মেলনে আবুল মনসুর আহমদ এক লিখিত ভাষণে বলেছিলেন :

> পার্টি যাঁরা রিভাইভ করিয়াছেন, তাঁরা দেখাইয়াছেন তাঁহাদের কাছে দেশের চেয়ে পার্টি বড়।...মার্শাল ল উঠামাত্র পার্টি করিবার প্রথম সুযোগেই আমরা নেতৃত্ব লইয়া কামড়াকামড়ি শুরু করিয়াছি। গাছে কাঁঠাল ধরিবার অনেক আগেই আমরা শুধু গোঁফে তেল দিতে নয়, একে অন্যের গোঁফ ধরিয়া টানাটানি শুরু করিয়াছি। মন্ত্রিত্ব ও নেতৃত্বের লোভে যারা একদিন শেরেবাংলার নেতৃত্বে গঠিত জনগণের যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে ১৯৫৪ সালের ঐতিহাসিক বিজয়কে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল, তাহারাই আজ তেমনি নেতৃত্বের লোভেই সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সংগঠিত এনডিএফকে ভেঙ্গে চুরমার করিয়া দিতেছে।[১৬]

একদিকে আইয়ুব খানের 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র', অন্যদিকে সিনিয়র নেতাদের রাজনীতিতে সক্রিয় না হওয়া, এর মধ্যেই শেখ মুজিব ছাত্রলীগকে সম্বল করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ছাত্রদের মধ্যেও ক্ষোভ বাড়ছিল। এ সময় ছাত্রদের একটা স্লোগান নিয়মিতই শোনা যেত 'আইয়ুবশাহি ধ্বংস হোক'।

জাতীয় পরিষদের শূন্য আসনে উপনির্বাচনের প্রস্তুতি চলছিল। ছাত্রসংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এ সময় কাজী জাফর আহমদ (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন), সিরাজুল আলম খান (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ), রেজাউল হক সরকার (পাকিস্তান ছাত্রশক্তি) ও আবদুল হালিম (জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন) উপনির্বাচন উপলক্ষে একটা যৌথ বিবৃতিতে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার এবং ছদ্ম সরকারি প্রার্থীদের বিরোধিতা করার জন্য বিডি মেম্বারদের প্রতি আহ্বান জানান।[১৭]

গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান ছিলেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের খুবই অনুগত ও আস্থাভাজন। তিনি ছাত্রদের তোপের মুখে পড়েন। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৬৪ সালের ২২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে। গভর্নরের এডিসি মেজর এস ডি জিলানীর বর্ণনা থেকে এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

> স্থান কার্জন হল, সময় সকাল ১০টা।...প্রধান গেটের সামনে কিছু ছাত্রের বিরূপ স্লোগানের ধ্বনি শোনা গেল। আমরা তাদের পাশ কাটিয়ে হলের পাশের কামরায় প্রবেশ করলাম। গভর্নর সেখানে কনভোকেশনের রেওয়াজ অনুযায়ী পোশাকাদি গাউন, টুপি ইত্যাদি পরে নিলেন। ছাত্রদের গতিবিধি, বিরূপ স্লোগান, ইত্যাদি দেখে-শুনে আমরা প্রমাদ গুনলাম। ভাইস চ্যান্সেলর ড. এম ও গনির চেহারা মলিন হয়ে উঠল। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি এম এ হক এগিয়ে এসে গভর্নরকে প্যান্ডেলে যেতে নিষেধ করলেন এবং অনুষ্ঠান বাতিল করার জন্য পরামর্শ দিলেন। শুনে গভর্নর মোনায়েম খান দারুণ গোস্যা ও উষ্মা প্রকাশ করলেন। ডিআইজিকে বললেন, 'আপনারা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না।'...
>
> এই বলে তিনি, ভাইস চ্যান্সেলর, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সমভিব্যাহারে প্যান্ডেলের দিকে রওনা হলেন। আমি এবং গভর্নরের মিলিটারি সেক্রেটারি কর্নেল এম আই করিম তাঁর পেছনে পেছনে চললাম। প্যান্ডেলে প্রবেশ করতেই বুঝতে পারলাম অবস্থা বেগতিক।...ছাত্ররা স্লোগান দিতে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ভাঙচুর শুরু করে দিল।...চ্যান্সেলর মোনায়েম খান দাঁড়িয়ে তাঁর লিখিত ভাষণ পড়তে শুরু করলেন। উত্তেজিত ছাত্ররা বাইরের দিক থেকে প্রধান দরজা দিয়ে প্যান্ডেলে ঢোকার জন্য হুড়-হাঙ্গামা শুরু করল। সশস্ত্র পুলিশ...একপর্যায়ে তারা লাঠিচার্জ করল এবং শেষ পর্যন্ত টিয়ার গ্যাস ছুড়তে বাধ্য হলো।...ড. এম ও গনি আমাকে ডেকে বললেন আমি যেন গভর্নরকে তাঁর ভাষণ সংক্ষেপ করতে বলি।
>
> আমি গভর্নরের কানের কাছে গিয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের কথাটি বলতেই তিনি আমাকে একরকম ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন এবং ভাষণের শেষ শব্দটি পর্যন্ত পড়ে তারপর বসলেন।...
>
> এ সময় আমাদের প্রধান কর্তব্য সাব্যস্ত হলো গভর্নরকে প্যান্ডেল থেকে নিরাপদে বের করে গভর্নর হাউসে পৌঁছে দেওয়া।...গভর্নর হাউসে পৌঁছেই মোনায়েম খান গোলযোগ সৃষ্টিকারী ছাত্রদের শাস্তি বিধানের জন্য কঠোর আদেশ জারি করলেন। সুতরাং, সেই রাতেই আন্দোলনের ঘাঁটি ইকবাল হল (বর্তমানে জহুরুল হক হল) ঘেরাও করা হলো।[১৮]

সমাবর্তনে গোলযোগ সৃষ্টি করার 'অপরাধে' অনেকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শেখ ফজলুল হক মণি ও আসমত আলী শিকদারের এমএ ডিগ্রি বাতিল করে দেয়। ছাত্রলীগের সভাপতি কে এম ওবায়দুর রহমান, ডাকসুর সহসভাপতি রাশেদ খান মেনন, এ কে

বদরুল হক ও সওগাতুল আলমকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঁচ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। হায়াত হোসেন, আনোয়ারুল হক চৌধুরী, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, আনোয়ার আলী হায়দার খান ও শহীদুল হক তিন বছরের জন্য বহিষ্কৃত হন। গিয়াসুদ্দিন আহমদ চৌধুরী, মনসুরউদ্দিন আহমদ, জাকি আহমদ, আবদুল করিম, সৈয়দ মতিউর রহমান, আবদুর রাজ্জাক মিয়া, সিরাজুল আলম খান, কাজী মোজাম্মেল ইসলাম, আতিকুর রহমান, হুমায়ুন কবীর, কামালউদ্দিন শিকদার ও ফেরদৌস আহমদ কোরেশীকে দুই বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়। ২০ জন ছাত্রকে নিজ নিজ অভিভাবকের কাছ থেকে ব্যক্তিগত সদাচরণের অঙ্গীকারনামাসহ চিঠি নিয়ে আসতে বলা হয়।[১৯] জাকি আহমদ ও আহমদ ফারুকের একটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ছাত্র বহিষ্কারের আদেশ বাতিল করে দিয়েছিলেন।[২০] অভিযুক্ত ছাত্রদের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন এস আর পাল।[২১]

১৯৬৪ সালের ৫ জুন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির এক জরুরি সভায় দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এগারো দফা দাবি উপস্থাপন করেন। অনেক আলোচনার পর প্রস্তাবগুলো গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলোর মাধ্যমে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের একটি ফর্মুলা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল। প্রস্তাবগুলো সংক্ষেপে ছিল :

১) 'ফেডারেশন অব পাকিস্তান' নামে সত্যিকার অর্থে ফেডারেল পদ্ধতি প্রণয়ন।
২) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্র কায়েম ও যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন।
৩) কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সামরিক বাহিনীসহ সকল সরকারি উচ্চপদে মেধা অনুসারে বাঙালিদের নিয়োগ।
৪) পাকিস্তানের উভয় অংশে বৃহৎ শিল্পকারখানা জাতীয়করণ।
৫) মোহাজেরদের জন্য সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রণয়ন।
৬) ফেডারেশনে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ সাধনে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি প্রণয়ন।
৭) পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন কায়েমের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক মুদ্রার ব্যবস্থাসহ পৃথক অর্থনীতি প্রণয়ন।
৮) পাকিস্তানের সকল প্রদেশের জন্য পৃথক বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি প্রণয়ন।
৯) বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব-নিকাশ ও আয়-ব্যয়ের পূর্ণ অধিকার প্রদেশের হাতে ন্যস্তকরণ।
১০) পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠাসহ দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে মিলিশিয়া বাহিনী গঠন।
১১) ছাত্রদের দাবিদাওয়াসহ শ্রমিক-কৃষকদের ন্যায্য দাবিসমূহ পূরণ।[২২]

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এগারো দফা দাবিনামাসহ খসড়া ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে। এই ম্যানিফেস্টোই পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের সব কর্মসূচি ও আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল। শেখ মুজিব ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতীক। লক্ষ্যের প্রতি আস্থা, একাগ্রতা, একরোখা মনোভাব, সাহস এবং মেরে-কেটে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাঁকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল। তাঁর সাহসের বর্ণনা দিতে গিয়ে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তানের (এপিপি) চিফ রিপোর্টার আমানউল্লাহ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন :

> শেখ মুজিবের মধ্যে একটা ডেয়ার ডেভিল ভাব ছিল, যা অন্য কোনো রাজনীতিবিদের মধ্যে ছিল না। একবার মুসলিম লীগের রাগিব আহসান একদল গুন্ডা নিয়ে পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের মিটিংয়ে হামলা করে। আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। উপস্থিত সবাই যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়। ওই সময় কারোরই থাকার কথা নয়। একটা ঢিল এসে আমার কবজিতে লাগল, একটু আঘাতও পেলাম। অবাক হয়ে দেখলাম, ডায়াসের ওপর শুধু একজন দাঁড়িয়ে আছে, শেখ মুজিব। হি ওয়াজ কারেজিয়াস।[২৩]

১৯৬৪ সালের ২১-২২ জুলাই ঢাকায় কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা নাজিমুদ্দিনের বাড়িতে বিরোধী দলের নেতাদের একটা সভা হয়। সভায় আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। সভায় পাঁচ দলের সমন্বয়ে 'কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি' (কপ) তৈরি হয়। কপের পক্ষ থেকে নয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে সকল স্তরে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত হয়। ঠিক হয়, আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কপের পক্ষ থেকে একজন প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া হবে। নয় দফার আট নম্বর দফায় 'ইসলামী মূলনীতি'র কথা বলা হয়। এই দফায় ছিল : 'কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী সত্যিকার ইসলামি সমাজব্যবস্থা ও শরিয়তের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান। এই পরিপ্রেক্ষিতে পারিবারিক আইন সংশোধন।'

আইয়ুব খান 'পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১' জারি করেছিলেন। এটা ছিল একটা যুগান্তকারী সংস্কারমূলক আইন, সমাজে যার প্রভাব ছিল ইতিবাচক। এই আইনের ফলে বহুবিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকারের প্রচলিত শরিয়াভিত্তিক আইনে মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়েছিল। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ ছিল এই আইনের পক্ষে। নতুন আইনকে তারা আধুনিক, প্রগতিশীল ও মানবিক বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। জামায়াতে ইসলামী ছিল এই আইনের বিরুদ্ধে। তাদের মতে, এটা ইসলামবিরোধী। রাজনৈতিক ঐক্যের স্বার্থে

আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ জামায়াতের দাবি 'বিষ গেলার মতো' স্বীকার করে নেয়।[২৪]

সরকার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করল। নির্বাচনী সূচি অনুযায়ী অক্টোবর-নভেম্বরে (১৯৬৪) হবে ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচন, ২ জানুয়ারি (১৯৬৫) প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, মার্চে জাতীয় এবং এপ্রিলে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচিত ৮০ হাজার 'মৌলিক গণতন্ত্রী' বা বিডি মেম্বারকে নিয়ে প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের জন্য গঠন করা হলো 'ইলেক্টোরাল কলেজ'। ঢাকায় এক সভায় সিদ্ধান্ত হলো, কপ ও এনডিএফ একসঙ্গে বিরোধী দল হিসেবে নির্বাচনে লড়বে।

আইয়ুব খানের ধারণা ছিল, বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে ঐকমত্যের প্রার্থী দিতে পারবে না। প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে অবশ্য একটু নাটক হয়েছিল। শেষমেশ কপের প্রার্থী ঠিক করা হলো ফাতেমা জিন্নাহকে। এই মনোনয়নের প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব কুদরতউল্লাহ শাহাবের বর্ণনায় :

> ...বিরোধী দলের পক্ষে প্রথম কাজ ছিল আইয়ুব খানের সমকক্ষ একজন প্রার্থী মনোনীত করা। দুটি নাম বিবেচনায় এল। একটি কায়েদে আজমের বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহ এবং দ্বিতীয়টি পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর আজম খান। আজম খান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সমান জনপ্রিয় ছিলেন।...পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো এ ব্যাপারে দারুণ এক চাল চাললেন।
>
> ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির একজন প্রভাবশালী নেতা জনাব মশিউর রহমানের (যাদু মিয়া) সঙ্গে ভুট্টোর ছিল গভীর সম্পর্ক। মওলানা ভাসানীর 'ডান হাত' বলে কথিত মশিউর রহমান ছিলেন তাঁর (ভুট্টোর) পানাহারের সঙ্গী। জাতীয় পর্যায়ে তেমন খ্যাতির অধিকারী না হলেও রাজনীতির বাজারে বেচা-কেনা কিংবা দর-কষাকষির কৌশল তিনি জানতেন। শোনা যায়, ভুট্টো তাঁকে পাঁচ লাখ টাকার বিনিময়ে কিনে ফেলেন। মশিউর রহমানের চাপে মওলানা ভাসানী সম্মিলিত বিরোধী দলের ওপর এই শর্ত আরোপ করলেন যে এমন কোনো ব্যক্তিকে বিরোধী দলের পক্ষে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মনোনীত করা যাবে না, যিনি কোনো না কোনোভাবে সামরিক সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। আজম খান একসময় সামরিক সরকারের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন। কাজেই মওলানা ভাসানীর শর্তের কারণে তাঁর নাম আপনাআপনি খারিজ হয়ে গেল।
>
> মশিউর রহমান ভুট্টোর জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেন। সম্মিলিত বিরোধী দল আইনবিশারদদের পরামর্শক্রমে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থিতার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করার গোপন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। কেননা, বেতনভুক্ত ফিল্ড মার্শাল হিসেবে তিনি আইনত কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। মশিউর রহমান আগেভাগে ভুট্টোর কাছে ওই তথ্য ফাঁস করে দিলেন। আইয়ুব খান বিরোধী দলের মামলা করার

আগেই ফিল্ড মার্শাল নিযুক্তির আইনগত দিক পেছনের তারিখ থেকে কার্যকারিতা দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিলেন।

...ব্যক্তিস্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। প্রথমে একজন বিখ্যাত পীর ঘোষণা করলেন, তিনি আধ্যাত্মিক শক্তি বলে জানতে পেরেছেন যে আল্লাহ তাআলা সম্মিলিত বিরোধী দলের ওপর সন্তুষ্ট নন। এরপর কয়েকজন আলেম ফতোয়া দিলেন, ইসলাম নারীর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সমর্থন করে না।[২৫]

জামায়াতে ইসলামীর পূর্ব পাকিস্তান শাখার আমির গোলাম আযমের বিবরণ থেকে জানা যায়, ফাতেমা জিন্নাহর নাম প্রস্তাব করেছিলেন মওলানা ভাসানী। জামায়াত ছাড়া সব দল এই প্রস্তাব সমর্থন করে। জামায়াত বৈঠক মুলতবির অনুরোধ জানিয়ে বলে, একজন মহিলাকে প্রার্থী করার ব্যাপারে শীর্ষস্থানীয় আলেমদের মতামত নেওয়ার জন্য এক দিন সময় দরকার। কপের একটি প্রতিনিধিদল ফাতেমা জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে তাঁর সম্মতি চান। ফাতেমা শর্ত দেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এক বছরের মাথায় আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে হবে। দেশকে স্বৈরশাসন থেকে গণতন্ত্রে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি এক বছর দায়িত্ব পালনে রাজি আছেন। জামায়াতের নেতারা পাকিস্তানের শীর্ষ আলেম মওলানা মুহাম্মদ শফির সঙ্গে দেখা করলে তিনি ব্যাখ্যা দেন, গণতন্ত্রে ফিরে আসার পথে একটা মধ্যবর্তী সরকারের নেতৃত্ব দিলে দেশে নারী নেতৃত্ব কায়েম হয়েছে, এটা বলা যাবে না। সুতরাং ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন দেওয়া যেতে পারে। জামায়াতের আমির মওলানা মওদুদী তখন কারাগারে। তাঁর মতামত নেওয়া হলো। মওদুদীর মন্তব্য ছিল, 'পুরুষ হওয়া ছাড়া আইয়ুব খানের আর কোনো গুণ নেই। আর মহিলা হওয়া ছাড়া ফাতেমা জিন্নাহর আর কোনো দোষ নেই।'[২৬]

ভোটারদের ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহার করে ভোট চাওয়ার ব্যাপারে বিরোধী দলও পিছপা হয়নি। আজম খান ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে প্রচারে নামলেন। তাঁর বক্তৃতায় ইসলামি জোশের কমতি ছিল না। বিভিন্ন সভায় আজম খান বক্তব্য দিতে দাঁড়িয়েছেন। উর্দুতে বলছেন :

ভাইসব, আল্লাহ হুকুম করলেন, আয় ফাতেমা খাড়া হো যাও। তিনি দাঁড়ালেন। আবার আল্লাহ হুকুম করলেন। আয় পাঁচ পার্টি, ইনকো তায়িদ করো—অর্থাৎ সমর্থন দাও। পাঁচ পার্টিও নেমে গেল সমর্থন দিতে। এখন আপনাদেরও ফরজ মিস ফাতেমাকে সমর্থন করা। সভাস্থ সকলে হাত তুলে সমর্থনের ওয়াদা করল। আজম খানও হাত তুলে বললেন, সোবহান আল্লাহ, ইয়ে ইনসান নেহি—ফেরেশতা হ্যায়। বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা যেমন রাসুলুল্লাহর

মদদের জন্য ফেরেশতা নাজেল করেছিলেন, এখনো এই যুদ্ধে তিনি লাখ লাখ ফেরেশতা পাঠিয়েছেন।[২৭]

নির্বাচনী প্রচারে আইয়ুব খানের কঠোর সমালোচনার জন্য ৭ নভেম্বর (১৯৬৪) শেখ মুজিবকে তাঁর বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তিনি জামিনে ছাড়া পান। নির্বাচন নিয়ে ফাতেমা জিন্নাহর সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনি ২২ নভেম্বর করাচি যান। ঢাকায় ফিরে আসার পর ৩ ডিসেম্বর জননিরাপত্তা আইনে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। পরে অবশ্য তিনি জামিনে ছাড়া পান।

১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আইয়ুব খান ও ফাতেমা জিন্নাহ ছাড়াও দুজন অখ্যাত প্রার্থী ছিলেন। নির্বাচনে আইয়ুব খান জয়ী হন। পরদিন দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর প্রধান সংবাদ শিরোনাম ছিল 'দশ কোটি মানুষের পরাজয়'।[২৮]

আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানে ৫৩.১২ শতাংশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৬৩.৩১ শতাংশ ভোট পান। ফাতেমা জিন্নাহ পান পূর্ব পাকিস্তানে ৪৬.৫০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২৬.০৭ শতাংশ ভোট। অন্য দুজন প্রার্থী কে এম কামাল ও মিয়া বশির আহমদ পান ১ শতাংশেরও কম ভোট। মোট ৭৮ হাজার ৮৯০ জন বিডি মেম্বার ভোট দেন। ৮১০টি ভোট বাতিল হয়েছিল।[২৯] ঢাকা, চট্টগ্রাম ও করাচি বিভাগে ফাতেমা জিন্নাহ আইয়ুব খানের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন।[৩০] কপের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও এই নির্বাচনে ন্যাপের মধ্যকার চীনপন্থী কমিউনিস্টরা ফাতেমা জিন্নাহকে সর্বাত্মক সমর্থন দেয়নি।[৩১]

যদি সরাসরি ভোটে নির্বাচন হতো, তাহলে ফাতেমা জিন্নাহ অনায়াসে জিততেন বলেই বাঙালিদের ধারণা। ফলে নির্বাচনব্যবস্থার ওপর বাঙালিরা একেবারেই আস্থা হারিয়ে ফেলে।[৩২]

ছয় দফা

১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ভেঙে ন্যাপ তৈরি হলে দলের অনেক ত্যাগী নেতা-কর্মী ন্যাপে চলে যান। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি হলে রাজনীতিবিদদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। শেখ মুজিব নানাভাবে হয়রানির শিকার হন। সামরিক শাসন উঠে যাওয়ার পর আওয়ামী লীগের অনেক প্রবীণ নেতা রাজনীতিতে সক্রিয় থাকেননি। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের ভার শেখ মুজিবকে প্রায় একাই বয়ে বেড়াতে হয়েছে। দলে বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ নেতার আকাল পড়েছিল। ওই সময় শেখ মুজিবের প্রধান অবলম্বন ছিল ছাত্রলীগের তরুণ নেতা-কর্মীরা। ওই সময় ছাত্রলীগ নেতা আবুল কালাম আজাদ (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক) দুটো পুস্তিকা লিখেছিলেন—*বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ* ও *পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য*।[১]

আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগকে তখন দারুণ অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছিল। শেখ মুজিবের আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে একটা চাকরি ছিল। সিরাজুল আলম খান ঢাকার কাছে কেরানীগঞ্জের আটি স্কুলে একটা কামরায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কোচিং করিয়ে কষ্টেসৃষ্টে টাকা জোগাড় করতেন।[২] কিন্তু এ দিয়ে ছাত্রলীগের টাকার চাহিদা মেটানো কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না। টাকার জন্য তাঁকে প্রায়ই যেতে হতো তাঁর নেতা শেখ মুজিবের কাছে। ওই সময় শেখ মুজিবের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং সরকার থেকে প্রচার করা হতো, শেখ মুজিব দুর্নীতি করে অনেক টাকা কামিয়েছেন। রাজনীতি দিয়ে মোকাবিলা করতে না পেরে তাঁর নামে নানান অপবাদ দেওয়া হতো।

শেখ মুজিব প্রচণ্ড পরিশ্রম, ত্যাগ ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ছাত্রলীগের তরুণেরাই ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি বিরাট একটা বোমা ফাটালেন—ছয় দফা।

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়া নিয়ে নানা রকম তথ্য পাওয়া যায়। কাশ্মীর নিয়ে দুই দেশের মধ্যে

উত্তেজনা ছিল। যুদ্ধ চলে ১৭ দিন। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের দূতিয়ালিতে তাসখন্দে পাকিস্তান-ভারত শীর্ষ বৈঠক শুরু হয় ১৯৬৬ সালের ৪ জানুয়ারি। ১০ জানুয়ারি একটা সমঝোতা চুক্তিতে সই দেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। তাসখন্দ চুক্তিতে ভারতের কাছে পাকিস্তানের স্বার্থ বিকিয়ে দেওয়া হয়েছে এই অভিযোগে পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব খান সমালোচিত হন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর ভূমিকা ছিল রহস্যময়। ভুট্টো পাকিস্তানকে যুদ্ধে নামিয়ে আইয়ুব খান ও সেনাবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করতে চেয়েছিলেন বলে আইয়ুব খানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথ্যসচিব আলতাফ গওহর ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় প্রেসিডেন্টের এডিসি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট (পরবর্তী সময়ে স্কোয়াড্রন লিডার ও রাষ্ট্রদূত) আরশাদ সামি খানের বিবরণ থেকে :

> দিল্লিতে পাকিস্তানের হাইকমিশনার মিয়া আরশাদ হোসেনের একটা একান্ত গোপনীয় টেলিগ্রাম সম্পর্কে গোয়েন্দা বিভাগ নিশ্চিত হয়েছে। গোয়েন্দা অনুসন্ধানে জানা গেছে, ওয়াঘা সীমান্ত দিয়ে ভারত লাহোর আক্রমণের পরিকল্পনা করছে, টেলিগ্রামটিতে এমন তথ্য ছিল। এটা পাঠানো হয়েছিল পররাষ্ট্রসচিব আজিজ আহমদের কাছে। তিনি টেলিগ্রামটি নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টোর সঙ্গে কথা বলেন। গোপনীয় টেলিগ্রামটি যেন কারও হাতে না পড়ে, এমনকি প্রেসিডেন্টের কাছেও, তার ব্যবস্থা হয়। তথ্যটি আগেভাগে জানা গেলে ভারতীয় বাহিনীর লাহোর আক্রমণের আকস্মিকতায় বিমূঢ় হতে হতো না। লাহোর রক্ষা পেয়েছিল, তবে অনেক প্রাণের বিনিময়ে। টেলিগ্রামটি গোপন করার কারণে লাহোর ভারতীয়দের দখলে চলে যেতে পারত। এটা সন্দেহাতীতভাবেই একটা বড় রকমের বেইমানি। প্রেসিডেন্ট দুজনের বিরুদ্ধেই আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি ভেবেছিলেন। তিনি আলতাফ গওহরকে বলেন, 'আমি বুঝি, ভুট্টো ও আজিজ আহমদ সম্ভবত কী চেয়েছিলেন। বিষয়টি কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, সে ব্যাপারে আমি তোমার পরামর্শ চাই।'[৩]

তাসখন্দ চুক্তি পর্যালোচনা করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদেরা ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে একটি জাতীয় সম্মেলন ডাকেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নসরুল্লাহ খান ঢাকায় এসে শেখ মুজিবুর রহমানকে এ সম্মেলনে যোগ দিতে বলেন। শেখ মুজিব যেতে চাননি। তিনি শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের কয়েকজনকে লাহোরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর সম্পাদক মানিক মিয়া শেখ মুজিবকে বললেন, 'মুজিবর মিয়া, যদি যেতেই হয়, আপনিই যান। আর আপনার মনে এতকাল যে কথাগুলো আছে, সেগুলো লিখে নিয়ে যান। ওরা শুনুক না শুনুক, এতে কাজ হবে।' শেখ মুজিব সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি

যাবেন।[৪] লাহোরে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন, তার একটা বিষয়সূচি বা 'টকিং পয়েন্ট' লিখে দেওয়ার জন্য তিনি বাঙালি সিএসপি কর্মকর্তা রুহুল কুদ্দুসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রুহুল কুদ্দুস সাত দফা কর্মসূচির একটা খসড়া তৈরি করে দেন। সাত নম্বর দফায় ছিল প্রদেশে নির্বাচিত গভর্নরের বিধান রাখতে হবে। আওয়ামী লীগ যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করত, তাই দফাটি কেটে বাদ দেওয়া হলো। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের সহযোগিতায় রুহুল কুদ্দুসের খসড়াটি পরিমার্জন করে ছয় দফায় আনা হয়।[৫]

ছয় দফার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ড. কামাল হোসেনের একটা ভাষ্য পাওয়া যায়। তাঁর মতে, মানিক মিয়া লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলনে যোগ দিতে শেখ মুজিবকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি শেখ মুজিবকে বলেছিলেন, তিনি যেন স্বায়ত্তশাসনের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেন। একপর্যায়ে অনেকের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হয় এবং এগুলোর তালিকা থেকেই ছয় দফা লেখা হয়। এর একটি ইংরেজি ভাষ্য তৈরি করা হয় লাহোরের সম্মেলনে উপস্থাপন করার জন্য। বাঙালি সিএসপি কর্মকর্তা রুহুল কুদ্দুস ইংরেজিতে খসড়াটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। মানিক মিয়া প্রথমে ছয় দফা প্রচার করতে চাননি। শেখ মুজিব *ইত্তেফাক*-এর বার্তা সম্পাদক সিরাজউদ্দিন হোসেনকে বলে যান, লাহোরে ছয় দফা আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করার পর তা যেন ভালোভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে সরকার ছয় দফার প্রচারে বাধা দিতে পারে।[৬]

৪ ফেব্রুয়ারি তাজউদ্দীন আহমদ ও নুরুল ইসলাম চৌধুরীকে নিয়ে শেখ মুজিব লাহোরের উদ্দেশে রওনা হলেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ২১ জন রাজনীতিবিদ এ সম্মেলনে যোগ দেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৬০০ জনের বেশি প্রতিনিধি লাহোর সম্মেলনে অংশ নেন।[৭]

৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৬) চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বাসায় কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ আফজালের সভাপতিত্বে সম্মেলন শুরু হয়। সাবজেক্ট কমিটির সভায় শেখ মুজিব একটি 'ছয় দফা' প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উপস্থিত অন্য সবার আপত্তির মুখে শেখ মুজিবের প্রস্তাব সম্মেলনের এজেন্ডায় রাখা হলো না। শেখ মুজিব ক্ষুব্ধ হয়ে সম্মেলন থেকে ওয়াকআউট করলেন। পরে সাংবাদিকদের কাছে তিনি ছয় দফার কথাগুলো তুলে ধরেন।[৮] ১০ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বললেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সঙ্গে আলোচনা না করে এই পর্যায়ে তাসখন্দ চুক্তি সম্বন্ধে তিনি কিছু বলবেন না। ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। ঢাকা বিমানবন্দরে উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে লাহোর সম্মেলনে সাবজেক্ট কমিটিতে দেওয়া

প্রস্তাবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, তাঁর দেওয়া ছয় দফা অন্তর্ভুক্ত করে আন্দোলনের জন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হলে তিনি তার সঙ্গে থাকবেন।[৯]

লাহোরে যাওয়ার আগে মতিঝিলে শেখ মুজিবের কর্মস্থল আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির যে ঘরে বসে তিনি ছয় দফার খসড়া নিয়ে কাজ করেছিলেন, সেখান থেকে তার একটা কপি সাংবাদিক আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর হাতে আসে। তিনি এটা ঢাকার সান্ধ্য দৈনিক *আওয়াজ*-এ ছাপিয়ে দেন।[১০] শেখ মুজিব তখন লাহোরে। ছয় দফা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানাবিধ পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য ছিল। শেখ মুজিবের কাজকর্মের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা আতাউর রহমান খান প্রসন্ন ছিলেন না। লাহোর সম্মেলনে শেখ মুজিবের ভূমিকার ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য ছিল নেতিবাচক। তাঁর মতে :

> অধিবেশন চলাকালে শেখ মুজিব হঠাৎ বোমা নিক্ষেপ করলেন—ছয় দফা। প্রস্তাব বা দাবির আকারে একটা রচনা নকল করে সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হলো। কোনো বক্তৃতা বা প্রস্তাব নেই, কোনো উপলক্ষ নেই, শুধু কাগজ বিতরণ। পরে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। জাতীয় কনফারেন্সে এই দাবি নিক্ষেপ করার কী অর্থ হতে পারে?[১১]

আতাউর রহমান খানের বক্তব্যের অর্থ হলো, ছয় দফায় যা-ই থাকুক না কেন এখন এটা বলার সময় নয়। ছয় দফা কেমন করে তৈরি হলো, এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> কিছুসংখ্যক চিন্তাশীল লোক দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থার কথা আলাপ-আলোচনা করেন। আমাদের ইঙ্গিত ও উৎসাহ পেয়ে তাঁরা একটা খসড়া দাবি প্রস্তুত করেন।...তাঁরা 'সাত দফা'র একটা খসড়া আমাদের দিলেন।...এই খসড়ার নকল বিরোধীদলীয় প্রত্যেক নেতাকেই দেওয়া হয়। শেখ মুজিবকেও দেওয়া হয়। খসড়া রচনার শেষ বা সপ্তম দফা আমরাও সমর্থন করিনি। শেখ মুজিব সেই দফা কেটে দিয়ে ছয় দফা তাঁরই প্রণীত বলে চালিয়ে দিলেন।...
>
> লাহোর কনফারেন্স বানচাল হয়ে গেল। নেতারা শেখ মুজিবকেই এর জন্য বিশেষভাবে দায়ী করেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, শেখ মুজিব সরকারের পক্ষ থেকে প্ররোচিত হয়ে এই কর্ম করেছেন। লাহোরে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে আইয়ুব খানের একান্ত বশংবদ এক কর্মচারী শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কী মন্ত্র তাঁর কানে ঢেলে দেয়, যার ফলেই শেখ মুজিব সব ওলটপালট করে দেন। তাঁরা এও বলেন যে আওয়ামী লীগের বিরাট বাহিনীর লাহোর যাতায়াতের ব্যয় সরকারের নির্দেশে কোনো একটি সংশ্লিষ্ট সংস্থা বহন করে। আল্লাহ্ আলিমুল গায়েব।[১২]

আতাউর রহমান খান যে ইঙ্গিত করেছেন তাতে মনে হতে পারে, ছয় দফা উত্থাপনে আইয়ুব খানের হাত আছে এবং আইয়ুবের তথ্যসচিব আলতাফ গওহরকে

দিয়ে তিনি এটি করিয়েছেন লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলনটি বানচাল করে দিতে। আইয়ুব খান হয়তো তাঁর সমালোচকদের ঐক্য ভেঙে দিয়ে তাঁদের নজর তাসখন্দ চুক্তির 'ভুল' থেকে সরিয়ে ছয় দফার দিকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন।[১৩]

ছয় দফা হঠাৎ করে আসমান থেকে পড়েনি। দীর্ঘদিন ধরে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি ও ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এর তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি হচ্ছিল। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবির ১৯ নম্বর দফায় ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে তৈরি হয়েছিল রাজনীতিবিদদের সঙ্গে অর্থনীতিবিদদের যুগলবন্দী, স্বাধিকারের দাবিতে যাঁরা এক মোহনায় মিলেছিলেন।

১৯৬৪ সালের ৫ জুন এগারো দফা দাবির ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের যে ম্যানিফেস্টো লেখা হয়, তাতে ছয় দফার কথাগুলো বলা হয়েছিল। সঙ্গে অন্যান্য দাবিও ছিল। ছয় দফা এসেছে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে। সময়ের সঙ্গে দাবিগুলো পরিমার্জিত হয়েছে। এর সঙ্গে সমান্তরালভাবে উঠে এসেছে 'দুই অর্থনীতি'র তত্ত্ব। পাকিস্তানের দুই অংশে যে দুটি অর্থনীতি বিরাজ করছে, এ ধারণা প্রথম তোলা হয় ১৯৫৬ সালে।

পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৫৬-১৯৬০) জন্য উন্নয়ন কৌশল তৈরির লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদেরা ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসের শেষের দিকে ঢাকায় একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। ১০ জন অর্থনীতিবিদ ওই সম্মেলনে পাকিস্তানের দুটি অংশের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি ও স্বাক্ষর করে ১৯৫৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান প্ল্যানিং কমিশনের কাছে পাঠান। সম্মেলনে অনুমোদিত এই প্রতিবেদনটি যৌথভাবে তৈরি করেছিলেন এম এন হুদা, মাজহারুল হক, আবদুর রাজ্জাক, নুরুল ইসলাম, আবদুস সাদেক, আবদুল্লাহ ফারুক, এ এন এম মাহমুদ, সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ হোসেন ও শফিকুর রহমান। ১৯৬১ সালের মে মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার দাওয়াত পান। এই দলে ছিলেন এম এন হুদা, এ এফ এ হুসেইন, আবদুল্লাহ ফারুক (মাজহারুল হকের অনুপস্থিতিতে) ও নুরুল ইসলাম। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনার পর তাঁদের বিশ্লেষণ, সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন নুরুল ইসলাম। দলের সবাই একমত হয়ে অনুমোদন করার পর প্রতিবেদনটি প্রেসিডেন্টের সচিবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিবেদনে সুপারিশ হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছিল, কেন্দ্রের হাতে স্রেফ তিনটি বিষয় থাকবে—প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি এবং দুই অংশের মধ্যে যোগাযোগের কয়েকটি দিক।[১৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক নুরুল ইসলাম ও রেহমান সোবহান কার্জন হলে ১৯৬১ সালের জুন মাসে 'দুই অর্থনীতি'র ওপর একটা সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন। সম্মেলনে পাকিস্তান প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চিফ হাবিবুর রহমান অংশ নিয়েছিলেন। সম্মেলনে নুরুল ইসলাম ও রেহমান সোবহান দুই অর্থনীতির ওপর আলোচনা করেন। পরদিন *পাকিস্তান অবজারভার*-এর পঞ্চম পাতার সংবাদ শিরোনাম ছিল 'রেহমান সোবহান সেইজ পাকিস্তান হ্যাজ টু ইকোনমিজ'। ওই দিনই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ঢাকা ছেড়ে চলে যান। যাওয়ার সময় কয়েকজন সাংবাদিক দুই অর্থনীতির ওপর তাঁর মন্তব্য জানতে চান। পরদিন *পাকিস্তান অবজারভার*-এর প্রথম পাতায় খবরটি ছাপা হয়েছিল এভাবে :

> 'আইয়ুব খান সেইজ পাকিস্তান হ্যাজ অনলি ওয়ান ইকোনমি'। পাকিস্তান প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান সৈয়দ হাসান রেডিওতে প্রচারিত এক ভাষণে আঞ্চলিক বৈষম্যকে বলেছিলেন 'ডেড হর্স' (মৃত ঘোড়া, অর্থাৎ এর অস্তিত্ব নেই) এবং বাঙালি অর্থনীতিবিদদের তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন, এরা 'বিদেশি শক্তির নিচুমানের গোলাম'। এর জবাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক আবু মাহমুদ, আনিসুর রহমান ও রেহমান সোবহান *ঢাকা টাইমস*-এ লিখেছিলেন, 'ডিসপ্যারিটি : ডেড হর্স অর আ লাইভ প্রবলেম' (বৈষম্য : মৃত ঘোড়া না জীবন্ত সমস্যা)। তাঁরা সৈয়দ হাসানের যুক্তি খণ্ডন করেছিলেন।[১৫]

১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সভা হওয়ার কথা ছিল। শেখ মুজিবের সন্দেহ ছিল, কার্যকরী কমিটি তাঁকে সমর্থন না-ও দিতে পারে। তবে আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের কর্মী এবং সাধারণ মানুষ যে তাঁকে সমর্থন জানাবে, এ ব্যাপারে তিনি আস্থাশীল ছিলেন। কার্যকরী কমিটিতে ছয় দফা উত্থাপনের ঝুঁকি তিনি ওই সময় নিতে চাননি। লাহোর রওনা দেওয়ার আগে কার্যকরী কমিটির বৈঠকটি স্থগিত করা হয়েছিল।

ছাত্রলীগের তরুণ নেতারা শেখ মুজিবের পাশে ছিলেন। লাহোরে ছয় দফা উপস্থাপনের আগে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির এক বর্ধিত সভায় একই ধরনের দাবিসংবলিত প্রস্তাব পাস হয়। 'পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য' শিরোনামে একটি নিবন্ধ ছাত্রলীগ পুস্তিকা আকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়। এর ভূমিকা লেখেন ছাত্রলীগের সভাপতি মাযহারুল হক বাকী ও সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক। ভূমিকায় বলা হয়, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঔপনিবেশিক সম্পর্কের ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য গ্রহণযোগ্য নয়।[১৬] সুতরাং বলা চলে, আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির বাইরে শেখ মুজিবের জন্য জমি নিশ্চিতভাবেই তৈরি হয়ে ছিল। তাই কার্যকরী কমিটির অনুমোদনের তোয়াক্কা না করে শেখ মুজিব তাঁর প্রস্তাবগুলো নিয়ে লাহোরে যাওয়ার ঝুঁকি নেন, যদিও জনগণের অনুকূল

মনোভাব সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট আস্থাবান ছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবের ধানমন্ডির বাসায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির এক সভায় শেখ মুজিব ছয় দফা পাস করিয়ে নিতে সক্ষম হন। উপস্থিত সদস্যদের সমর্থন আদায়ের জন্য ছাত্রলীগের সদস্যদের নিয়ে সিরাজুল আলম খান পেশিশক্তির মহড়া দিয়েছিলেন।[১৭]

ছয় দফা নিয়ে একটা চূড়ান্ত ফয়সালার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব ১৮-১৯ মার্চ (১৯৬৬) ঢাকার হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা ডাকেন। সভাপতি মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের অনুপস্থিতিতে সভায় সভাপতিত্ব করেন সহসভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। কাউন্সিল সভায় ছয় দফা অনুমোদন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে সভাপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি তৈরি করা হয়। কমিটিতে নির্বাচিত অন্যান্য কর্মকর্তার মধ্যে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, হাফেজ হাবিবুর রহমান ও রাজশাহীর মুজিবুর রহমান (সহসভাপতি), মিজানুর রহমান চৌধুরী (সাংগঠনিক সম্পাদক), জহুর আহম্মদ চৌধুরী (শ্রম সম্পাদক), আবদুল মোমেন (প্রচার সম্পাদক), কে এম ওবায়দুর রহমান (সমাজকল্যাণ সম্পাদক), আমেনা বেগম (মহিলা সম্পাদক), মুহম্মদুল্লাহ (দপ্তর সম্পাদক) ও নুরুল ইসলাম চৌধুরী (কোষাধ্যক্ষ)।[১৮]

ছয় দফা পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে প্রচণ্ড আলোড়ন তৈরি করেছিল। আওয়ামী লীগ ছয় দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ একটা পুস্তিকা প্রকাশ করে। ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে এটা প্রচার করা হয়। শিরোনাম ছিল, 'আমাদের বাঁচার দাবি ছয় দফা কর্মসূচি'। ঢাকার পাইওনিয়ার প্রেস থেকে শেখ মুজিবের নামে এটা ছাপা হয়েছিল। দাম রাখা হয়েছিল পঁচিশ পয়সা। এক ফর্মার (ষোল পৃষ্ঠা) এই পুস্তিকার শেষ অংশটি ছিল এ রকম :

> মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবির জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁর পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পেছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাইবোনেরা আল্লার দরগায় শুধু এই দোওয়া করিবেন, বাকি জীবনটুকু আমি যেন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।[১৯]

শেখ মুজিবের নামে ছাপা হলেও এ পুস্তিকার আসল রচয়িতা হলেন আবুল মনসুর আহমদ। তিনি তখন সক্রিয় রাজনীতি থেকে অনেকটাই নির্বাসিত। তাঁর

আমার প্রিয় দেশবাসী—

আমি ক্ষমতার প্রত্যাশী নই। কারণ, ক্ষমতার চেয়ে জনগণের দাবী আদায়ের সংগ্রাম অনেক বড়। এবার নির্বাচনের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ ও দাবী আদায়ের শক্তি যদি আমাদের উপর ন্যস্ত করতে চান তাহলে আওয়ামী লীগকে শক্তি দান করতে হবে। যে শক্তি হবে সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর। অতএব, এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হচ্ছে অধিকার আদায়ের প্রতিশ্রুতি। তাই আমার জীবনের সুদীর্ঘ সংগ্রামের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে আমার একটি মাত্র আবেদন — বাংলাদেশের সকল আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদেরকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিন।

সংগ্রামী দেশবাসী—

সর্বশেষে, আমি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আপনাদের কাছে কয়েকটি কথা পেশ করতে চাই। আপনারা জানেন ১৯৬৫ সালের ১৭ দিনের যুদ্ধের সময় আমরা বাংলাদেশ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন, অসহায় ও নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছিলাম। বিদেশের সাথে এবং দেশের অপর অংশের সাথে আমাদের সকল যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছেদ হয়ে পড়েছিলো। সতের দিনের যুদ্ধে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রেখে এক সীমাহীন অনিশ্চয়তার মুখে দিন কাটিয়েছিল। তদানীন্তন শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রশাসনের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সেদিনের সেই জরুরী প্রয়োজনের দিনেও আমাদের [illegible] বাইরে ছিল। তাই আমার নিজের জন্যে নয়, বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ হিসেবে ১৯৬৬ সালে আমি ৬-দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম। এই দাবী হচ্ছে আমাদের স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক মুক্তির আদায়ের দাবী; অতীতে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তার অবসানের দাবী। এই দাবী তুলতে গিয়ে আমি নির্যাতিত হয়েছি। একটির পর একটি মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আমাকে হয়রানী করা হয়েছে। আমার ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও আপনাদের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছিল। আমার সহকর্মীদেরকেও একই অন্যায় অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। সেই দুর্দিনে পরম করুণাময় আল্লাহর আশীর্বাদ ছাড়া আপনারাই কেবল আমার সাথে ছিলেন। কোন নেতা নয়, কোন দলপতি নয়, আপনারা — বাংলার বিপ্লবী ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও সর্বহারা মানুষ রাতের অন্ধকারে কারফিউ ভেঙে [illegible], বাংলাদেশের মানুষ মেহনতি মানুষেরা প্রাণ দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলে আমাকে ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কবল থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিনের কথা আমি ভুলে যাইনি, জীবনে কোনদিন ভুলব না, ভুলতে পারবো না। জীবনে আমি যদি একলাও হয়ে যাই, মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মত আবার যদি মৃত্যুর পরোয়ানা আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তাহলেও আমি শহীদের পবিত্র রক্তের সাথে বেঈমানী করবো না। আপনারা যে ভালোবাসা আমার প্রতি আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, জীবনে যদি কোনদিন প্রয়োজন হয় তবে আমার রক্ত দিয়ে হলেও আপনাদের এ ভালোবাসার ঋণ পরিশোধ করবো।

প্রিয় ভাইবোনেরা—

বাংলার যে জননী শিশুকে দুধ দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে [illegible] মারা গেল, বাংলার যে শিক্ষক অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ঢলে পড়লো, বাংলার যে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে জীবন দিলো, বাংলার যে ছাত্র অধিকার অর্জনের সংগ্রামে রাজপথে রাইফেলের সামনে বুক পেতে দিলো, বাংলার যে সৈনিক কুর্মিটোলার বন্দী শিবিরে অসহায় অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হলো, বাংলার যে কৃষক ধান ক্ষেতের আলের পাশে প্রাণ হারালো — তাদের বিদেহী অমর আত্মা বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে ঘরে-ঘরে ঘুরে ফিরছে এবং অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার দাবী করছে। রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে যে আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, সে আন্দোলন ৬-দফা ও ১১-দফার। আমি তাঁদেরই ভাই। আমি জানি, ৬-দফা ও ১১-দফা বাস্তবায়নের পরই তাদের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে। কাজেই আপনারা আওয়ামী লীগের প্রতিটি প্রার্থীকে 'নৌকা' মার্কায় ভোট দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি আসনে জয়যুক্ত করে আনুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, [illegible] কেড়ে নিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা জয়যুক্ত হবো।

শহীদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। ন্যায় ও সত্যের সংগ্রামে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সহায় হবেন।

জয় বাংলা ॥ পাকিস্তান জিন্দাবাদ ॥

নিবেদক—
আপনাদেরই
শেখ মুজিবুর রহমান

[illegible]

ছয় দফার পক্ষে শেখ মুজিবের স্বাক্ষর-সংবলিত প্রচারপত্রের শেষ পৃষ্ঠা

জবানিতে এ পুস্তিকা রচনার ইতিহাস তুলে ধরা যাক :

> অনেকের এমনকি খোদ আওয়ামী লীগারদেরও অনেকের বিশ্বাস, ছয় দফা আমিই রচনা করিয়াছি। যুক্তফ্রন্টের একুশ দফাও আমিই রচনা করিয়াছিলাম। এই সুপরিচিত তথ্য হইতেই সকলে অতি সহজেই ছয় দফাও আমার রচনার

কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন। আসল সত্য তা নয়। আমি ছয় দফা রচনা করি নাই। ছয় দফার ব্যাখ্যায় বাংলা-ইংরাজি যে দুইটি পুস্তিকা *আমাদের বাঁচার দাবি* ও *আওয়ার রাইট টু লিভ* প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত হইয়াছে, এই দুইটি অবশ্যই আমি লিখিয়াছি এবং বরাবরের মতো নির্ভুল ছাপা হওয়ার গ্যারান্টিস্বরূপ আমি নিজেই তাদের প্রুফও দেখিয়া দিয়াছি। মুজিবের ভালোর জন্যই এ কথাটা গোপন রাখা স্থির হইয়াছিল। সে গোপনতার হুঁশিয়ারি হিসেবে প্রুফ নেওয়া-আনার দায়িত্ব পড়িয়াছিল তাজউদ্দীনের উপর। মানিক মিয়া, মুজিব, তাজউদ্দীন ও আমি এই চারজন ছাড়া এই গুপ্ত কথাটা আর কেউ জানিতেন না। অথচ অল্প দিনেই কথাটা জানাজানি হইয়া গেল। মুজিব তখন জেলে। আমি ভাবিলাম, মুজিবের কোনও বিরোধী পক্ষ তাঁর দাম কমাইবার অসাধু উদ্দেশ্যে এই প্রচারণা চালাইয়াছে। কাজেই আমি খুব জোরে কথাটার প্রতিবাদ করিতে থাকিলাম। পরে শেখ মুজিবের সহকর্মী মরহুম আবদুস সালাম খাঁ ও জহিরুদ্দিন সাহেবানের মুখে যখন শুনিলাম, স্বয়ং মুজিবই তাঁদের কাছে এ কথা বলিয়াছেন, তখন আমি নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হইলাম।[২০]

এ ঘটনা থেকে মনে হয়, শেখ মুজিব ঋণ স্বীকার করতে জানতেন। অন্যের কাজ নিজের বলে চালিয়ে দিয়ে বাহবা নেওয়ার স্থূল আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে তখন ছিল না। অবশ্য তাঁর অনেক অনুসারী এতটা উদার মনের ছিলেন না। তাঁদের অনেকেই দাবি করেন, মুজিবই সবকিছু করেছেন। তাঁরা এটা বুঝতে অক্ষম যে একজন ব্যক্তি একা সব কাজ করতে পারেন না।

আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা গৃহীত হওয়ার পর থেকেই সরকার শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে নানা রকমের মামলা দিয়ে হয়রানি করতে থাকে। মুজিব যেখানেই যান, সেখানেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জামিন নিয়ে তিনি আবার প্রচার শুরু করেন।

১৯৬৬ সালের ২০ মার্চ ঢাকায় কনভেনশন মুসলিম লীগের সমাপ্তি অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ছয় দফার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন যে দেশের অখণ্ডতাবিরোধী কোনো প্রচেষ্টা সরকার সহ্য করবে না; প্রয়োজন হলে 'অস্ত্রের মুখে' তার জবাব দেওয়া হবে।[২১] ২৪ এপ্রিল ঢাকার পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের পূর্বনির্ধারিত জনসভা ছিল। এর আগেই শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় পল্টনের সভায় উপস্থিত হতে পারেননি। আওয়ামী লীগের অন্য নেতারা মঞ্চে একটা খালি চেয়ার রেখে জনসভার কাজ চালান। সভাপতির আসনটি শূন্য রেখে আওয়ামী লীগ প্রতীকী প্রতিবাদ জানায়।[২২] কয়েক দিন পর মুজিব জামিনে ছাড়া পান।

সরকারের আক্রমণাত্মক কথাবার্তায় শেখ মুজিব ও ছয় দফার পক্ষে জনসমর্থন বাড়তে থাকে। দৈনিক *ইত্তেফাক* ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলে। অবশেষে মে মাসের ৮ তারিখ 'পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে' মুজিবকে

গ্রেপ্তার করা হয়। কয়েক দিনের ব্যবধানে আওয়ামী লীগের প্রায় সব প্রধান নেতাকে পুলিশ আটক করে কারাগারে নিয়ে যায়।

৯ মে জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা নুরুল আমিন এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেপ্তারকে 'চিন্তা ও বাকস্বাধীনতার ওপর নগ্ন হামলা' বলে মন্তব্য করেন। বিরোধী দলের উপনেতা শাহ আজিজুর রহমান এই গ্রেপ্তারকে 'অযাচিত ও জবরদস্তিমূলক' বলে অভিহিত করে বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া নেতারা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের সর্বজনীন দাবি করেছিলেন।

আওয়ামী লীগ ১৯৬৬ সালের ২০ মে কার্যকরী কমিটির সভায় ৭ জুন মঙ্গলবার, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালনের আহ্বান জানায়। ৭ জুনের হরতালের আগে ঢাকায় ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সভা হয়েছিল। এ সভায় যাতে হরতালের পক্ষে কোনো প্রস্তাব পাস না হয়, সে উদ্দেশ্যে আইয়ুব সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ কেন্দ্রীয় সরকারের তিনজন উচ্চ পদের কর্মকর্তা ঢাকায় আসেন। তাঁদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে ন্যাপ কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন সদস্য ৭ জুনের হরতালের বিরোধিতা করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এর আগে চীনভক্ত এক জননেতা মোহাম্মদ তোয়াহা, অধ্যাপক আসহাবউদ্দিন, আবদুল হক ও সুখেন্দু দস্তিদারের নামে জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাতিল করার জন্য গভর্নর মোনায়েম খানের কাছে তাঁদের নাম পাঠিয়েছিলেন। সুখেন্দু দস্তিদার 'হিন্দু', এ কারণে মোনায়েম খান তাঁর ওপর থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তুলে নিতে অস্বীকার করেন। বাকি তিনজনের পরোয়ানা বাতিল করা হয়। তখন ওই জননেতা মোজাফফর আহমদের নাম পাঠালে মোজাফফর আহমদের ওপর থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। মোজাফফর আহমদ এটা জানতেন না। ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটিতে পিকিংপন্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। তাদের ভোটে কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছয় দফা কর্মসূচির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।[২৩]

ছয় দফা আন্দোলন এবং ৭ জুনের হরতালের আগে আওয়ামী লীগের সামনের সারির অনেক নেতা গ্রেপ্তার হয়ে যান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও মিজানুর রহমান চৌধুরী ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। ২০ মে (১৯৬৬) হরতালের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আরও নেতা গ্রেপ্তার হন। ২ জুন গ্রেপ্তার হন প্রচার সম্পাদক আবদুল মোমেন, সমাজসেবা সম্পাদক ওবায়দুর রহমান, ঢাকা নগর সভাপতি হাফেজ মোহাম্মদ মুসা, সহসভাপতি শাহাবুদ্দিন চৌধুরী ও সহসম্পাদক রাশেদ মোশাররফ এবং নারায়ণগঞ্জ শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তফা সরোয়ার।

চটকল শ্রমিক ফেডারেশনের নেতা মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন এবং আফতাব আলী ও ফয়েজ আহমদ পরিচালিত

পূর্ব পাকিস্তান ফেডারেশন অব লেবার বিভিন্ন শিল্প এলাকায় হরতালবিরোধী ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশনের পূর্ব পাকিস্তান শাখা কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত না নিয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শাখা কমিটিগুলোকে নির্দেশ দেয়। এই সংগঠনের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান হরতালের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও এর সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন ভূঁইয়া ৬ জুন তেজগাঁও

আওয়ামী লীগের ডাক!

আগামী ৭ই জুন, মঙ্গলবার পূর্ণ "হরতাল" পালন করুন।

স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, যান-বাহন, কল-কারখানা, দোকান-পাট, হাট-বাজার প্রভৃতি বন্ধ রাখুন।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বজ্র কণ্ঠে আওয়াজ তুলুন!

- শ্রমিক-ছাত্র জনতা—এক হও।
- ৬ দফা—কায়েম কর!
- সকল রাজবন্দীদের—মুক্তি চাই।
- টেণ্ডুপাতা অর্ডিন্যান্স—বাতিল কর!
- সংবাদ পত্রের উপর বিধি নিষেধ—প্রত্যাহার কর!
- জরুরী অবস্থা—প্রত্যাহার কর।
- খাদ্য সমস্যার—স্থায়ী সমাধান চাই।
- শ্রমিক বিরোধী আইন—বাতিল কর।
- জালিম শাহী—ধ্বংস হউক।
- পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা----দিতে হবে।

বিঃ দ্রঃ —ডাক্তার খানা [illegible], বিদ্যুৎ সরবরাহ ও জল সরবরাহের বেলায় প্রযোজ্য নহে।

[illegible] ইং

আওয়ামী লীগ, চট্টগ্রাম।

১৯৬৬ সালের ৭ জুন হরতালের পক্ষে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের প্রচারপত্র

আঞ্চলিক শাখার অধীনে প্রতিটি শ্রমিক ইউনিয়ন থেকে দুজন করে প্রতিনিধি নিয়ে একটা বর্ধিত সভা ডাকেন। সভায় বিভিন্ন বক্তা আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিববিরোধী বক্তব্য দিলেও অবশেষে রাত দেড়টায় 'আইয়ুব-মোনায়েম সরকারের জুলুম এবং কলকারখানার মালিকদের অত্যাচারের প্রতিবাদে' ৭ জুন হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[২৪]

৭ জুন স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল হয়েছিল। ওই দিনের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে অলি আহাদ লিখেছেন :

> ৭ জুন ঢাকা শহরে হরতালের প্রথম বেলায় বিশেষ কোনো সাড়া জাগাতে পারেনি। কিন্তু সমগ্র পরিস্থিতির মোড় ঘুরে যায় তেজগাঁও শিল্প এলাকার মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সকাল ৮টার দিকে তেজগাঁওয়ে অবস্থিত কোহিনূর কেমিক্যাল কো. (তিব্বত) ও হক ব্রাদার্স কো. সম্মুখস্থ রাজপথের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত একটি চায়ের দোকানে ধর্মঘটী শ্রমিক দল চা-নাস্তা গ্রহণকালে একজন শ্রমিক সাইকেলে তথায় আসিলে দোকানে উপবিষ্ট শ্রমিকদের একজন সাইকেলের হাওয়া ছাড়িয়া দেয়। এমনি আপোষী দৃশ্যে হাসি-কৌতুকের হিল্লোড় বহিয়া যায়। হঠাৎ হরিষে বিষাদ সৃষ্টি করে একটি পুলিশ জিপের আগমন। পুলিশ জিপে আগত পুলিশ শ্রমিকদিগকে লাঠিপেটা আরম্ভ করে, শুরু হয় পাল্টা শ্রমিক প্রতিরোধ। অসহিষ্ণু পুলিশের রিভলবারের গুলিতে তিনজন শ্রমিক গুলিবিদ্ধ হয়। উক্ত তিনজনের মধ্যে সিলেট জেলা নিবাসী বেঙ্গল বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজের শ্রমিক মনু মিয়া ঘটনাস্থলে শাহাদৎ বরণ করেন।
>
> উক্ত হৃদয়বিদারক ঘটনার পর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের সহস্র সহস্র শ্রমিক লাঠি হাতে মিছিল সহকারে পথে বাহির হইয়া পড়ে। মিছিল তেজগাঁও রেলওয়ে ক্রসিং অতিক্রমকালে উত্তরদিক হইতে আগত ট্রেনকে পথিমধ্যে থামাইয়া দেয়। ট্রেনটি পুনঃ চালাইবার চেষ্টা করিলে উহা লাইনচ্যুত হইয়া যায়; ঘটনার অব্যবহিত পরই পুলিশ ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) এর সশস্ত্র বাহিনী রেললাইনের পশ্চিম দিক হইতে রেল লাইনের পূর্বদিকে অবস্থানরত শ্রমিক মিছিল ছত্রভঙ্গ করিবার প্রয়াসে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। এমতাবস্থায় আকস্মিকভাবে নোয়াখালী জেলা নিবাসী আজাদ এনামেল এন্ড এলুমিনিয়াম কারখানায় ছাঁটাইকৃত শ্রমিক আবুল হোসেন পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। ইহাতে উত্তেজিত হইয়া আহত আবুল হোসেন বীরদর্পে দাঁড়াইয়া সশস্ত্র বাহিনীকে তাহার বক্ষে গুলি করিতে আহ্বান জানান। পুলিশের উদ্যত রাইফেলের নির্মম গুলি তাহার বক্ষকে বিদীর্ণ করে। এইভাবে ধরাশায়ী শহীদ আবুল হোসেন স্বীয় তপ্ত শোণিতে মুক্তি সংগ্রামের মৃত্যুঞ্জয়ী ডাক লিখিয়া গেলেন।
>
> নারায়ণগঞ্জ শহরে ৭ জুন হরতাল উপলক্ষে কয়েক স্থানে পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ ঘটে। সর্বশেষ বোস কেবিনের নিকট জনতা রেলওয়ে ওয়াগন লুট করিবার চেষ্টা নিলে পুলিশের গুলিতে ৬ জন মৃত্যুবরণ করে।[২৫]

৭ জুন গুলি করে মানুষ হত্যার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগদলীয় সদস্যরা ৮ জুন রাওয়ালপিন্ডিতে জাতীয় পরিষদের এবং ঢাকায় প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন বর্জন করেন। ১৬ জুন দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর সম্পাদক মানিক মিয়াকে তাঁর ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই দিন গভর্নরের আদেশে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে ১ নম্বর রামকৃষ্ণ মিশন রোডে অবস্থিত 'নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস' বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই প্রেস থেকে *ইত্তেফাক* ছাপা হতো। ফলে *ইত্তেফাক*-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

কমিউনিস্ট পার্টির মতে, ৭ জুনের পর ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের জনগণ ও শ্রমিকদের ভেতর যে ব্যাপক বিক্ষোভ ও উত্তেজনা ছিল এবং সারা পূর্ববঙ্গে তখন যে অবস্থা ছিল, তাতে ওই সংগ্রামকে বিভিন্নভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ ৭ জুনের পর জনগণকে আর কোনো নেতৃত্ব দেয়নি। তাই নেতৃত্বের অভাবে ছয় দফা আন্দোলন আর অগ্রসর হয়নি। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের কার্যকলাপে মনে হয়েছিল, ওই আন্দোলনকে একটা যুক্তিসংগত পরিসমাপ্তিতে নিয়ে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা তাদের ছিল না। বরং জনসমাবেশ ও দু-একটা হরতাল দ্বারা সরকারকে চাপ দিয়ে আপস করা ছিল তাদের নীতি। কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্য আত্মসমালোচনা করেছে। 'পাকিস্তান হওয়ার পর উহাই ছিল প্রথম ঘটনা যখন জনগণ ও শ্রমিকেরা রাস্তায় নামিয়া নিজেদের দাবির জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হইলেও শ্রমিক শ্রেণির পার্টির কর্মীরা দূরে দাঁড়াইয়া নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।'[২৬]

৭ জুনের হরতালের সময় কমিউনিস্ট পার্টি ও তার অঙ্গসংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন পুরোপুরি নির্লিপ্ত ছিল, এ কথা বলা যাবে না। ছাত্র ইউনিয়ন ইতিমধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের মস্কোপন্থী অংশটি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্নে আন্তরিক ছিল এবং এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সঙ্গে ঐক্য ও সমঝোতার নীতি গ্রহণ করেছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দেওয়ার ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টি সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও ৭ জুন হরতালের দিন শেষ সময়ে এসে ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সক্রিয় সমর্থন দেওয়ার অবস্থা তৈরি হয়েছিল।[২৭]

হরতালের দিন ছাত্র ইউনিয়নের কিছু কর্মী ঢাকা শহরে প্রচারে নেমেছিলেন। সকাল সাড়ে আটটার দিকে স্টেডিয়ামের গেটের কাছে জিন্নাহ অ্যাভিনিউ (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ) এলাকায় পিকেটিং করার সময় ছাত্র ইউনিয়নের সংগঠক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, জিল্লুর রহমান মিঠু ও এ বি এম

সোহরাবউদ্দিন সিরাজিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে রমনা থানায় নিয়ে যায়। সেখানে অবাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট মি. বখ্‌ত সংক্ষিপ্ত আদালত বসিয়ে তাঁদের এক মাসের কারাদণ্ড দিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেন। পরে আদালতে আপিল করে দুই সপ্তাহ পর তাঁরা জামিন পান।[২৮]

১৮ জুন প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধীদলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্যরা একটি মুলতবি ও একটি অধিকার প্রস্তাব ওঠালে স্পিকার আবদুল হামিদ চৌধুরী তা বাতিল করে দেন। এর প্রতিবাদে বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যরা অধিবেশন থেকে কিছুক্ষণের জন্য ওয়াকআউট করেন। তারপর একে একে শেখ ফজলুল হক মণি, শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, মোল্লা জালালউদ্দিন ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী গ্রেপ্তার হন। ২২ জুন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরীকে চাঁদপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর প্রতিবাদে ২৮ জুন জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের সদস্যরা দুবার ওয়াকআউট করেন। বিরোধী দলের সদস্য মাহমুদ আলী মিজানুর রহমান চৌধুরীকে গ্রেপ্তারের বৈধতা সম্পর্কে তাঁর দেওয়া নোটিশের কী হলো, তা জানতে চান। স্পিকার তা নাকচ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানান। নুরুল আমিনের নেতৃত্বে বিরোধী দলের সদস্যরা অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করেন।[২৯]

১৯৬৬ সালের ৭ জুনকে অনেকেই এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করেন। বলা হয়, স্বাধীনতার বীজ বপন করা হয়েছিল এই দিনে। ৭ জুন ১০ জন এবং পরে আহত অবস্থায় হাসপাতালে একজন, মোট ১১ জন শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র চারজনের নাম জানা যায়—মনু মিয়া, শফিক, শামসুল হক ও আবুল হোসেন।[৩০] অন্যদের নাম জানা বা অনুসন্ধানের কোনো চেষ্টা আজ অবধি হয়নি।

ছয় দফাকে কেন্দ্র করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে বিতর্ক হয়। দলটিতে তখন মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী এ দুই শিবিরে তাত্ত্বিক লড়াই চলছিল এবং এর সহগামী ছাত্র ইউনিয়ন ইতিমধ্যে দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল। ছাত্র ইউনিয়নের মস্কোপন্থী গ্রুপটির অবস্থান ছিল এ রকম :

> আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবিকে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েমের দাবি বলেই মনে করি। এ দাবিগুলো ঐতিহাসিক ২১ দফার ১৯ নম্বর কর্মসূচির মধ্যেই রয়েছে। স্বায়ত্তশাসনের দাবি সকল পূর্ব পাকিস্তানবাসীরই দাবি।...এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা ঘোষণা করিতেছি যে আমাদের সংগঠন ছয় দফার বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ করবে না। বরং স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সংগ্রাম গড়ে তোলা এবং ঐক্য

কায়েমের প্রচেষ্টাই আমরা করব।...সংগঠনের মধ্যে ছয় দফা সম্পর্কে বিভ্রান্তি থাকার ফলেই আমরা এবার স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে তথা ৭ জুনের ঐতিহাসিক হরতালে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারিনি।[৩১]

অন্যদিকে পিকিংপন্থী গ্রুপটির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিপরীত। ১৯৬৭ সালে অনুষ্ঠিত গ্রুপটির বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত কার্যবিবরণীতে বলা হয় :

বর্তমানে ছয় দফা দাবির প্রবক্তারাও তাদের দাবিতে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ থেকে মুক্তির এবং শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জনগণের কোনো দাবিকে স্থান না দিয়ে বলে বেড়াচ্ছে যে, ছয় দফা আদায় হলেই সব দাবি পূরণ করা যাবে, এইরূপ স্তোকবাক্যে আমরা আর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। ছয় দফা দাবির নেতারা পূর্ণ সচেতনভাবেই এসব দাবি রাখেননি।...ভুল কর্মসূচির পেছনে আমরা ছুটব না। স্বায়ত্তশাসনের বুলির আড়ালে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী বাঙালি বুর্জোয়া, সামন্তগোষ্ঠীর একনায়কত্ব কায়েম করতে দেব না।[৩২]

৭ জুনের হরতালের পর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অনেকটাই থিতিয়ে যায়। আওয়ামী লীগের বেশির ভাগ নেতা জেলে বন্দী। আমেনা বেগম ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে প্রায় একাই দলকে নেতৃত্ব দেন। তিনিই ছিলেন নেতাবিহীন আওয়ামী লীগের ওই সময়ের কান্ডারি। এ সময় বিরোধী দলগুলোর মধ্যে একটা জোট বাঁধার চেষ্টা হয়। কয়েকজন নেতা ১৯৬৭ সালের ৩০ এপ্রিল ঢাকায় আতাউর রহমান খানের বাসায় সভা করে 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট' (পিডিএম) নামে একটা জোট তৈরি করেন। জোটের নেতাদের মধ্যে ছিলেন এনডিএফের নুরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী ও আতাউর রহমান



কারাগারে আটক শেখ মুজিবের মামলা পরিচালনার লক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য ছাপা চাঁদার কুপন

খান; কাউন্সিল মুসলিম লীগের মমতাজ দৌলতানা, তোফাজ্জল আলী ও খাজা খয়েরউদ্দিন; জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা তোফায়েল আহমদ, মাওলানা আবদুর রহিম ও অধ্যাপক গোলাম আযম; পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, আবদুস সালাম খান ও গোলাম মোহাম্মদ খান লুন্দখোর এবং পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টির চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, মৌলভী ফরিদ আহমদ ও এম আর খান।

পিডিএম গঠন করাকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগে ভাঙন দেখা দেয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত সভাপতি) ও আমেনা বেগমের (ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক) নেতৃত্বে একটি গ্রুপ পিডিএমে যোগ দিতে অস্বীকার করে। অন্যদিকে মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ ও রাজশাহীর মুজিবুর রহমান পরিচালিত আওয়ামী লীগের ছয় দফাবিরোধী গ্রুপটি পিডিএমে যোগ দেয়। পিডিএমের পক্ষ থেকে একটা আট দফা কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়।

১৯ আগস্ট (১৯৬৭) ঢাকায় ছয় দফাপন্থী আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের মোট ৯৫০ জন কাউন্সিল সদস্যের মধ্যে ৮৮৬ জন যোগ দেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, তাঁরা পিডিএমে যোগ দেবেন না। সভায় দলের ১১ জনের বিরুদ্ধে 'কারণ দর্শাও' নোটিশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তাঁরা হলেন আবদুস সালাম খান, জহিরুদ্দিন, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, মুজিবুর রহমান (রাজশাহী), আবদুর রহমান খান, এম এ রশিদ, রওশন আলী, মমিনউদ্দিন আহমদ, এস ডব্লিউ লকিতুল্লাহ, সাদ আহমদ ও জামালউদ্দিন খান।[৩৩]

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নসরুল্লাহ খান ২৩ আগস্ট (১৯৬৭) ঢাকায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির এক সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ১৯ আগস্টের কাউন্সিল সভাকে অবৈধ বলে ঘোষণা দেন। ওই দিন তিনি মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশকে সভাপতি এবং রাজশাহীর মুজিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করেন। কমিটিতে অন্যদের মধ্যে ছিলেন সহসভাপতি মশিউর রহমান (যশোর), কোষাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম চৌধুরী (ঢাকা) এবং সদস্য আবদুস সালাম খান (ফরিদপুর), মিয়া আবদুর রশিদ ও রওশন আলী (যশোর), আবদুর রহমান খান, ডা. সুলতান আহমদ ও আহমদ আলী (কুমিল্লা), মতিউর রহমান (রংপুর), রহিমউদ্দিন আহমদ ও আবদুর রহমান চৌধুরী (দিনাজপুর), সাদ আহমদ ও আবদুর রউফ (কুষ্টিয়া), এস ডব্লিউ লকিতুল্লাহ (বরিশাল), মোমিন উদ্দিন আহমদ (খুলনা), আবদুল হাই ও জালালউদ্দিন আহমদ (সিলেট), দেওয়ান শফিউল আলম (ঢাকা), মনসুর আলী (পাবনা), বি

এম ইলিয়াস (বগুড়া) ও জুলমত আলী (ময়মনসিংহ)। তাঁরা সবাই ছিলেন ছয় দফাবিরোধী।[৩৪]

ছয় দফাপন্থীরা ২৭ আগস্ট (১৯৬৭) নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটি পুনর্গঠন করেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে সভাপতি এবং আবুল হাসনাত মুহাম্মদ কামারুজ্জামানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে কার্যকরী কমিটির সদস্য হন সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ময়মনসিংহ), মিজানুর রহমান চৌধুরী, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও আমেনা বেগম (কুমিল্লা), আমজাদ হোসেন ও হোসেন মনসুর (পাবনা), মেহরাব হোসেন ও আফজাল হোসেন (যশোর), শাহ আজিজুর রহমান (কুষ্টিয়া), এ বি এম নুরুল ইসলাম (ফরিদপুর), আবদুল মালেক উকিল, মুহম্মদুল্লাহ ও নুরুল হক (নোয়াখালী), বাহাউদ্দিন চৌধুরী (বরিশাল), শেখ আবদুল আজিজ (খুলনা), জাকিরুল হক (চট্টগ্রাম), মাহিবুস সামাদ (সিলেট) ও শামসুল হক, হাফেজ মুসা ও তাজউদ্দীন আহমদ (ঢাকা)।[৩৫]

কমিটিতে মোট ৪৮ সদস্যের মধ্যে ২৪ জন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের। তাঁদের অন্যতম ছিলেন মালিক হামিদ সরফরাজ, চৌধুরী নাজিরুদ্দিন, সৈয়দ আবু আছিম, সৈয়দ খালিদ আহমদ তিরমিযী, সৈয়দ শাহ বোখারী ও মোহাম্মদ মোরতাজা। ১৮ সেপ্টেম্বর (১৯৬৭) ঢাকায় আওয়ামী লীগ অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনে কামারুজ্জামান কমিটি ঘোষণা করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির প্রথম সভায় শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে (তখন কারাগারে বন্দী) কামারুজ্জামানকে স্থায়ী আহ্বায়ক নির্বাচন করা হয়।[৩৬]

এ সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ন্যাপের দুই ভাগ হয়ে যাওয়া। পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির মধ্যে উগ্রপন্থার প্রতি একটু ঝোঁক ছিল। 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' স্লোগান দিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতান্ত্রিক ভারত প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের তত্ত্ব গ্রহণ করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রবণতা ছিল। এ নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি ও দলাদলি হয়েছে। দলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মেরুকরণ ঘটে।[৩৭]

১৯৬৪ সাল থেকেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন মস্কো ও পিকিং এ দুই শিবিরে ভাগ হতে শুরু করে। ১৯৬৫ সালের ১-৩ এপ্রিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভার শেষ দিনে কমিউনিস্ট পার্টির

সহযোগী সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন আনুষ্ঠানিকভাবে ভাগ হয়ে যায়। ডাকসুর সহসভাপতি রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে পিকিংপন্থী গ্রুপটি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে একটি কমিটি তৈরি করে। মস্কোপন্থী গ্রুপটি ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে (বর্তমানে জহুরুল হক হল) আরেকটি কমিটি গঠন করে।[৩৮] এর পর থেকে পিকিংপন্থী গ্রুপটি 'মেনন গ্রুপ' এবং মস্কোপন্থী গ্রুপটি 'মতিয়া গ্রুপ' নামে পরিচিতি পায়।

ছাত্র ইউনিয়নের বিভক্তির প্রক্রিয়ায় ন্যাপও দুই ভাগ হয়। ন্যাপের মস্কোপন্থী অংশটি দলের কাউন্সিল সভা ডাকার অনুরোধ জানিয়ে সভাপতি মওলানা ভাসানীকে চিঠি দেয়। চিঠির জবাব না দিয়ে ভাসানী রংপুরে কাউন্সিল সভা করেন এবং শৃঙ্খলা ভাঙার অভিযোগে সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেনসহ কয়েকজনকে দল থেকে বের করে দেন। মস্কোপন্থী অংশটি ১৯৬৮ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় কাউন্সিল সভা করে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদকে প্রাদেশিক ন্যাপের সভাপতি নির্বাচন করে।[৩৯]

পাকদর্শন

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাঙালি মুসলমানরা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট না দিলে পাকিস্তানের জন্ম হতো না। পূর্ব পাকিস্তানের জনমানসে পাকিস্তানবাদের শেকড় বেশ ভালোভাবেই গেড়ে বসেছিল। ১৯৪৮-৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবির পরও পাকিস্তান রাষ্ট্রটির প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থায় চিড় ধরেনি। পাকিস্তানের স্থপতি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'কায়েদে আজম' বা মহান নেতা হিসেবে তাঁর আসনটি ধরে রেখেছিলেন অনেক বছর।

মাহে-নও ছিল মাসিক সাহিত্য ম্যাগাজিন। তথ্য দপ্তর থেকে বের হতো *পাকিস্তানি খবর*। প্রথম কাতারের অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবী সরকারি এ দুটো পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তাঁদের অনেক লেখায় পাকিস্তান ও জিন্নাহ-বন্দনা ছিল বেশ জোরেশোরেই। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা *মাহে-নও* পত্রিকায় 'কায়েদে আজমকে' নামে এক কবিতায় ফজল শাহাবুদ্দীন লেখেন :

মাঝে মাঝে দেখিয়াছি প্রভাতের আলোক রঙীন।
তবু সেই ঝড় এলো-মেলো সেই রাত্রির হাওয়ায়
তুমি এলে হে নাবিক, প্রভাতের পানপাত্র হাতে
আঁধার মুখর হলো জীবনের প্রদীপ্ত শপথে
রাত্রির বন্দর থেকে মৌসুমীর হাসিন উষায়।[১]

মাহে-নও-এর একই সংখ্যায় জিন্নাহকে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'ইতিহাস' নামে একটা কবিতা লিখেছিলেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল। তাঁর কবিতার কয়েকটি লাইন ছিল :

তোমাকে জেনেছি আকাশের চেয়ে বড়—
সাগরের চেয়ে অনেক মহত্তর—
কেননা ক্লান্ত চোখের পাতায় নতুন আলোর ঝড়
তুমি এনে দিলে। নতুন জোয়ার ছুঁয়ে গেল বন্দর।[২]

মযহারুল ইসলাম ‘স্রষ্টার প্রতি (কায়েদে আজমকে)’ নামে লিখেছিলেন :

সহসা আলোর পরশ লাগলো
প্রাণে প্রাণে এক চেতনা জাগলো
আঁধার দুয়ার খুলে গেল সম্মুখে
কে তুমি হে নব-পথ-সন্ধানী আলোকদ্রষ্টা?[৩]

বেগম সুফিয়া কামাল ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৬ সাল অবধি জিন্নাহকে নিয়ে কমপক্ষে আটটি কবিতা লিখেছিলেন, যা ছাপা হয়েছিল *মাহে-নও* পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায়। জিন্নাহকে জন্মদিনের শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে ‘হে মহান নেতা’ শিরোনামে তিনি লিখেছিলেন পঁচিশ লাইনের একটি কবিতা। ভাষা আন্দোলনের প্রায় তিন বছর পর লেখা এ কবিতার প্রথম লাইনগুলো ছিল :

কায়েদে আজম! হে মহান নেতা সাড়া দাও,
দাও সাড়া,
তোমারে ভোলেনি, আজিও ডাকিছে বঞ্চিত সর্বহারা...[৪]

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন ছয় দফা দাবিনামা। ৭ জুন প্রদেশব্যাপী হরতাল হলো, ঝরে গেল এগারোটি প্রাণ। শেখ মুজিব কারাগারে বন্দী। ১৪ আগস্ট *পাকিস্তানি খবর*-এ পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ‘স্মরণীয়’ নামে একটা কবিতা লিখলেন বেগম সুফিয়া কামাল। এর কয়েকটা লাইন ছিল :

এইখানে একটি পতাকা
চন্দ্র ও তারকা আঁকা
কোটি মানবের নব প্রাণের প্রতীক...[৫]

শুধু পদ্য নয়, গদ্যেও গদগদ ছিলেন কেউ কেউ। ১৯৬১ সালে সারা দেশ সামরিক শাসনের জাঁতাকলে চাপা পড়েছিল। হাসান হাফিজুর রহমান ওই সময় লিখলেন ‘ছোটদের কায়েদে আযম’। তার কয়েকটা লাইন ছিল এ রকম :

তিনি গড়ে তুলেছিলেন নতুন এক দেশ, হয়েছিলেন বিরাট এক জাতির মুকুটহীন রাজা। রাজার ছেলে তিনি নন, কিন্তু রাজা বাদশাদের চেয়েও অনেক বড় কাজ তিনি করে গেছেন। অসম্ভবকে করে গেছেন সম্ভব। ঘর-হারা জাতিকে দিয়ে গেছেন চিরকালের অটুট এক ঘর।[৬]

ঘরটি চিরকাল অটুট থাকেনি। দশ বছরের মধ্যেই জিন্নাহর পাকিস্তান ভেঙে দুই টুকরো হয়ে গিয়েছিল। বাঙালি বুদ্ধিজীবী মানসে পরিবর্তন এসেছিল ধীরে ধীরে। ষাটের দশকে বাঙালি স্বাতন্ত্র্যবোধ ও জাতীয়তাবাদ দানা বাঁধতে শুরু করে। তবে এ যাত্রায় সবাই শামিল হননি।

পূর্ব পাকিস্তানে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে ধারাটি কমিউনিস্ট পার্টি এবং পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের একটি অংশ বহমান রেখেছিল, তার

সমান্তরাল একটি অসাম্প্রদায়িক, উদার ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনও যুগপৎ চালু ছিল। মূলত বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী এবং দলীয় পরিচয়ের বাইরে মুক্তমনা কয়েকজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিজীবী এই প্রয়াসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁদের সম্মিলন ঘটে। এর তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী।

১৯৬১ সালে ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদকে সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক খান সারওয়ার মুরশিদকে সাধারণ সম্পাদক করে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি গঠন করা হয়। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে দেশের প্রথম সারির লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ ঘটেছিল। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইমাম হোসেন চৌধুরী। বিচারপতি মোর্শেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ বক্তব্য দেন।[৭]

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন নিয়ে কাদা-ছোড়াছুড়ি হয়েছে। ঢাকার দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় এ নিয়ে কেউ কেউ বিষোদ্গার করেছেন। প্রবন্ধকার আবদুল হক (পরে বাংলা একাডেমির পরিচালক) ১৯৬১ সালের ৩০ এপ্রিল তাঁর ডায়েরিতে লেখেন, 'শুচিবায়ুপীড়িত জলাতঙ্কগ্রস্ত *আজাদ* তার চিরাচরিত কু-অভ্যাস অনুযায়ী হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে : রবীন্দ্রনাথ আসলে হিন্দু ছিলেন, তাঁর কাব্য-সাহিত্য আসলে হিন্দু-সাহিত্য, এতে মুসলমানদের কথা নেই, বরং কোথাও কোথাও তাদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে, কাজেই পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য যারা আয়োজন করছে তারা পাকিস্তানবিরোধী অখণ্ড ভারতবাদী।'[৮]

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৬৩ সালে ঢাকায় ছায়ানট নামে একটা সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি করা হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে বেগম সুফিয়া কামাল ও ফরিদা হাসান। এর প্রধান সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন মোখলেসুর রহমান (সিধু মিয়া), ওয়াহিদুল হক, সন্‌জীদা খাতুন, শামসুন্নাহার রহমান (রোজ), সাইদুল হাসান, আহমেদুর রহমান, মীজানুর রহমান (ছানা), সাইফুদ্দীন আহমেদ (মানিক) প্রমুখ। দেশে পদ্ধতিগতভাবে রবীন্দ্রসংগীত শেখানোর মাধ্যমে রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা ও প্রসারে ছায়ানট অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। ১৯৬৭ সাল থেকে তারা নিয়মিতভাবে প্রতিবছর (১৯৭১ সাল বাদে) পয়লা বৈশাখে রমনার বটমূলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান করে থাকে। জন্মের শুরু থেকেই ছায়ানট সরকারের কোপানলে পড়েছিল। ছায়ানটের অর্থের উৎস নিয়ে সরকারি পর্যায়ে তদন্ত, এই

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নানাভাবে হয়রানি, সংগীত বিদ্যালয়কে অস্থায়ী আবাস থেকে একাধিকবার উচ্ছেদ ও অনুষ্ঠান পণ্ড করার চেষ্টার মাধ্যমে নানা ষড়যন্ত্র চলে।[৯]

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পরস্পরবিরোধী দুটি ধারা বহমান ছিল। একটি হলো ইসলাম ধর্মের মোড়কে পাকিস্তানি এস্টাবলিশমেন্টের ধারা, যেখানে বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) ক্রমে পাকিস্তানের (পশ্চিম পাকিস্তান) একটি 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে' পরিণত হয়েছিল; অন্যটি ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক ধারা, যা বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়াসকে সঞ্জীবনী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করছিল ধীরে ধীরে। বাঙালির এ লড়াইয়ে একটি মস্ত বড় অবলম্বন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সাহিত্য। তাই পাকিস্তানি এস্টাবলিশমেন্ট রবীন্দ্রনাথের ওপর আঘাত হানল। পাকিস্তান সরকারের মালিকানাধীন বাংলা পত্রিকা *দৈনিক পাকিস্তান*-এ ১৯৬৭ সালের ২৪ জুন একটা খবর ছাপা হলো, শিরোনাম 'রেডিও পাকিস্তান থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার করা হবে না'। সংবাদটি ছিল এ রকম :

> কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন গতকাল জাতীয় পরিষদে বলেন যে ভবিষ্যতে রেডিও পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান প্রচার করা হবে না এবং এ ধরনের অন্যান্য গানের প্রচারও কমিয়ে দেওয়া হবে। রাজশাহী থেকে নির্বাচিত বিরোধীদলীয় সদস্য জনাব মুজিবুর রহমান চৌধুরীর এক অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে খাজা শাহাবুদ্দীন উপরিউক্ত মন্তব্য করেন।[১০]

খবরটি অনেকের চোখ এড়িয়ে গেলেও কারও কারও মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নাগরিক সমাজের অগ্রগণ্য কিছু সদস্য নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করলেন। বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষাতেই একটি বিবৃতি তৈরি করা হলো। দুটিই মুসাবিদা করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রিডার (সহযোগী অধ্যাপক) মুনীর চৌধুরী। এর পরদিন অর্থাৎ ২৫ জুন *দৈনিক পাকিস্তান*-এর প্রথম পাতায় ছাপা হলো 'রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত—১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি'। বিবৃতিতে বলা হলো :

> স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় ২৪ জুন ১৯৬৭ তারিখে মুদ্রিত একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এতে সরকারি মাধ্যম হতে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তাঁর সংগীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছে, তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানিদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারি নীতিনির্ধারণের সময় এ সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।

এই বিবৃতিতে সই দেন ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদিন, এম এ বারি, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ড. খান সারওয়ার মুরশিদ, সিকান্‌দার আবু জাফর, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ড. আহমদ শরীফ, ড. নীলিমা ইব্রাহীম, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, ড. আনিসুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।[১১] বিবৃতিটি দেখে শেষ সময়ে শহীদুল্লা কায়সারও সই দিয়েছিলেন। তাঁর সই করা বিবৃতি শুধু *সংবাদ*-এ ছাপা হয়েছিল।[১২]

সরকারি নীতির সমর্থনে ১৯৬৭ সালের ২৯ জুন *দৈনিক পাকিস্তান*-এর প্রথম পাতায় পাশাপাশি দুটি বিবৃতি ছাপা হয়। একটি ছাপা হয় '১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি—বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন শিক্ষক কর্তৃক মতানৈক্য প্রকাশ' শিরোনামে। এ বিবৃতি যাঁদের নামে ছাপা হয়েছিল, তাঁরা হলেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন (অধ্যক্ষ, ইংরেজি বিভাগ), এম শাহাবুদ্দীন (আইন অনুষদের ডিন), মোহাম্মদ মোহর আলী (ইতিহাস বিভাগের রিডার), এ এফ এম আবদুর রহমান (গণিত বিভাগের রিডার) ও কে এম এ মুনিম (ইংরেজি বিভাগের সিনিয়র লেকচারার)। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন :

> সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে কতিপয় ব্যক্তির বিবৃতিতে ভুল-বোঝাবুঝির অবকাশ রয়েছে বলে আমরা মনে করি এবং এ বিবৃতি পাকিস্তানবিরোধী প্রচারে ব্যবহৃত হতে পারে। বিবৃতির ভাষায় এ ধারণা জন্মে যে স্বাক্ষরকারীরা বাংলাভাষী পাকিস্তানি ও বাংলাভাষী ভারতীয়দের সংস্কৃতির মধ্যে সত্যিকারের কোনো পার্থক্য রয়েছে বলে স্বীকার করেন না। বাংলাভাষী পাকিস্তানিদের সংস্কৃতি সম্পর্কে এ ধারণার সঙ্গে আমরা একমত নই বলেই এ বিবৃতি দিচ্ছি।[১৩]

পাশাপাশি '৪০ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি : রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে ১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি মারাত্মক' শিরোনামে আরেকটি দীর্ঘ বিবৃতি ছাপা হয়। বিবৃতির ভাষা ছিল এ রকম :

> পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে ঘোষিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদপত্রে একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী মহলের যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, 'রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষী পাকিস্তানিদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।' এ উক্তির প্রতিবাদ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি এ কারণে যে এ উক্তি স্বীকার করে নিলে পাকিস্তানি ও ভারতীয় সংস্কৃতি যে এক এবং অবিচ্ছেদ্য, এ কথাই মেনে নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ যে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তা হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতি—যে সংস্কৃতির মূল কথা হলো : 'শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন' এবং যে সংস্কৃতি এ উপমহাদেশের মুসলমানদের অভিহিত করে 'হিন্দু-মুসলমান' বলে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই প্রথম

তাঁর এক প্রবন্ধে এ উপমহাদেশের মুসলমানদের 'হিন্দু-মুসলমান' বলে অভিহিত করেন।

সংস্কৃতি সম্পর্কে এই যে ধারণা, এর সঙ্গে পাকিস্তানি সাংস্কৃতিক ধারণার আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে এবং বলা যেতে পারে, একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে তামদ্দুনিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, উপরিউক্ত বিবৃতি মেনে নিলে সে ভিত্তিই অস্বীকৃত হয়। এ কারণে উপরিউক্ত বিবৃতিকে আমরা শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, অত্যন্ত মারাত্মক এবং পাকিস্তানের মূলনীতির বিরোধী বলেও মনে করি।

যে ৪০ জন বুদ্ধিজীবী এ বিবৃতিতে স্বাক্ষর দেন, তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন অতিপরিচিত এবং নিজ নিজ পেশায় প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিত্ব। তাঁদের মধ্যে নামজাদা সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, আইনজ্ঞ, শিক্ষক ও শিল্পীর সমন্বয় ঘটেছিল। স্বাক্ষরদাতারা ছিলেন মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, বিচারপতি আবদুল মওদুদ, মুজিবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, ড. কাজী দীন মোহাম্মদ, ড. হাসান জামান, ড. গোলাম সাকলায়েন, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, বেনজির আহমদ, মইনুদ্দীন, অধ্যক্ষ শেখ শরফুদ্দীন, আ কা মু আদম উদ্দীন, তালিম হোসেন, শাহেদ আলী, আ ন ম বজলুর রশীদ, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ, সানাউল্লাহ নূরী, আবদুস সাত্তার, কাজী আবুল কাশেম, মুফাখখারুল ইসলাম, শামসুল হক, ওসমান গনি, মফিজউদ্দীন আহমদ, আনিসুল হক চৌধুরী, মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক মোহাম্মদ মতিউর রহমান, জহুরুল হক, ফারুক মাহমুদ, মোহাম্মদ নাসির আলী, এ কে এম নুরুল ইসলাম, জাহানারা আরজু, বেগম হোসনে আরা, বেগম মাফরুহা চৌধুরী, কাজী আবদুল ওয়াদুদ ও আখতার-উল-আলম।[১৪]

বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদেও বিতর্ক হয়। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী সবুর খানের মন্তব্য ছিল :

এ কথা বলা হচ্ছে যে, ড. রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধন করেছেন এবং তাঁর কাব্য-বিহনে একশ্রেণির বুদ্ধিজীবীরা এতিম হয়ে পড়েছেন। এই শ্রেণির মূর্খদের গলাবাজির প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি নেই।[১৫]

জাতীয় পরিষদের বিরোধীদলীয় বাঙালি সদস্যরা এসব উক্তির জোরালো বিরোধিতা করেছিলেন বলে জানা যায় না। তবে ছাত্র ও সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নিছক ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রতীক। অনেক চেষ্টা হয়েছিল বাংলা ভাষার আরেক প্রধান কবি কাজী নজরুল ইসলামকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর। নজরুলকে প্রচার করা হচ্ছিল মুসলমানদের কবি হিসেবে। এমনকি তাঁর কোনো কোনো কবিতায় শব্দ বদলে দিয়ে

মুসলমানীকরণের চেষ্টা হয়েছিল। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। পূর্ব পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের বাংলা পাঠ্যবইয়ে নজরুলের ‘চল্ চল্ চল্’ কবিতাটি স্থান পেয়েছিল। ওই কবিতার একটি লাইন ছিল ‘সজীব করিব মহাশ্মশান’। তো ‘মহাশ্মশান’ কেটে সেখানে ‘গোরস্তান’ শব্দটি বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই সময় ঢাকায় নজরুল একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়। কয়েকজন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী সরকারের রবীন্দ্রসংগীত বর্জনের ঘোষণার সমর্থনে বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বেদারউদ্দীন আহমদ, আবদুল লতিফ, আবিদ হোসেন খান, আবদুল আলীম, নীনা হামিদ প্রমুখ। এই বিবৃতি দেখে ছাত্রসমাজ ক্ষুব্ধ হয়েছিল।[১৬]

প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের একপর্যায়ে খাজা শাহাবুদ্দীন তাঁর অবস্থান তুলে ধরেন। জাতীয় পরিষদে ১৯৬৭ সালের ৪ জুলাই তারিখে তিনি মন্তব্য করেন, পত্রিকায় রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বেতারে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞার কথা তিনি বলেননি। জনৈক ভারতীয় উর্দু কবি সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানের আদর্শ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবিরোধী কোনো কিছু বেতারে অনুমোদন করা হবে না। তখন একজন সদস্য তাঁকে প্রশ্ন করেন, ‘এ কথা কি রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?’ জবাবে তিনি বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ, যদি তাঁর কোনো গান পাকিস্তানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবিরোধী হয় তাহলে তা বাজানো হবে না।’[১৭]

পাক-বাংলার কালচার নামে পাকিস্তানি শাসকেরা এ দেশে বাংলা ভাষার ইসলামীকরণের চেষ্টা করেছিলেন। এর প্রয়োজন ছিল না। বাংলা ভাষায় এমনিতেও অনেক আরবি-ফারসি-তুর্কি শব্দ প্রচলিত আছে এবং তা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। ভাষার এ আত্তীকরণ হয়েছে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়, এ দেশের সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাপন প্রণালির ধারাবাহিকতায়। সেখানে জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়ার পাকিস্তানি প্রবণতার বিরুদ্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশের সচেতন প্রয়াস ছিল। বাঙালিদের যেকোনো দাবিদাওয়া অগ্রাহ্য করার জন্য শাসকেরা ওই সব দাবিকে সাম্প্রদায়িকতার মোড়কে উপস্থাপন করার চেষ্টা করত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার অন্যতম শিকার। যে অর্থে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয়, একই অর্থে নজরুলও ছিলেন ভারতীয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির আড়ালে রবীন্দ্রনাথকে বিদেশি বলে প্রচার করা এবং নজরুলকে নিয়ে অতি মাতামাতি ছিল দৃষ্টিকটু। অনেক বাঙালি কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক এ প্রবণতার জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এই রবীন্দ্রবিদ্বেষ এবং নজরুলপ্রেম একেবারে নিষ্কাম ছিল না। সরকারি তথ্য বিভাগ, ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন (বিএনআর), পাকিস্তান কাউন্সিল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের

মাধ্যমে অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবীকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হতো। বিএনআর তৈরি হয়েছিল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সময়। এর প্রথম পরিচালক ছিলেন সিএসপি কর্মকর্তা ও কবি আবু জাফর মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ খান। বিএনআরের হয়ে অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানবাদের পক্ষে লিখতেন এবং এ জন্য তাঁরা অর্থ পেতেন।

পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতর বাঙালির গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন অনুষঙ্গ হিসেবে। ষাটের দশকের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ প্রধান রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। এ দলের সমর্থনপুষ্ট ছাত্র সংগঠন ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ। তখন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ছিল সবচেয়ে বড় ছাত্রসংগঠন। তারা পালাক্রমে সাধারণ ছাত্রদের ভোটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে (ডাকসু) নেতৃত্ব দিত। ছাত্রলীগের প্রধান দুর্বলতা ছিল এই যে, তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের তেমন বিকাশ হয়নি। আওয়ামী লীগের কোনো সাংস্কৃতিক গণসংগঠন ছিল না। দেশের শিক্ষাঙ্গনে যে কয়টি সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল, সেগুলো ছিল সাধারণভাবে বাম-প্রভাবিত। ওই সব সংগঠনের সদস্য-কর্মীরা রবীন্দ্রসংগীত ও নানা রকম গণসংগীতের চর্চা এবং সংগীতের মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততা তৈরির চেষ্টা করতেন। আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগের মধ্যে এসব ছিল না।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ, সৃজনী লেখকগোষ্ঠী, উদীচী—এই সংগঠনগুলো ছিল বামধারার সাংস্কৃতিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত। প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে সংকলন প্রকাশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করার ক্ষেত্রে ছাত্র ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ডাকসুর নেতৃত্বে আয়োজিত একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানমালার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ছাত্র ইউনিয়ন ও সংস্কৃতি সংসদ তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডে ছায়ানটের সহযোগিতা পেয়েছে। ওই সময় ছাত্র ইউনিয়ন ও সংস্কৃতি সংসদের প্রভাবে দেশের অনেক বরেণ্য লেখক, কবি, সংগীতশিল্পী, আবৃত্তিকার, অভিনয়শিল্পী, আঁকিয়ে ও শিক্ষক প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁরা স্বেচ্ছায় ও নিঃস্বার্থভাবে অংশ নিতেন। তাঁদের মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে আদর্শিক ভালোবাসা কাজ করত। পরে ছায়ানট থেকে বেরিয়ে এসে কামাল লোহানী 'ক্রান্তি' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদেরও একটা ভালো ভূমিকা ছিল। বলা চলে, ষাটের দশকে এ দেশে একটি সাংস্কৃতিক জাগরণের জোয়ার বয়ে যায়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী ধারার রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি বামধারার এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন এ দেশের মধ্যবিত্ত মানসকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং স্বাধিকার আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।[১৮]

পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ছিল খুবই ক্ষীণ। পূর্ব বাংলা বিচ্ছিন্ন থাকল। এখানে দুটি মনোজাগতিক ধারা প্রবহমান হলো। একটি পাকিস্তানি সংহতির ধারা, অন্যটি বাঙালি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার ধারা। পাকিস্তানি ধারাটির মূলে ছিল ভারতভীতি ও হিন্দুবিদ্বেষ। যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্রটি বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করত, সে জন্য বাঙালির মনোজগতে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ক্ষয়িষ্ণু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একধরনের অসাম্প্রদায়িক ধারা তৈরি হলো। পাকিস্তান রাষ্ট্র ধর্মাশ্রয়ী ও নির্যাতনকারী না হলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা অসাম্প্রদায়িক ধারায় যোগ দিত কি না, তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে।

বাঙালিরা যখনই তাদের দাবিদাওয়ার কথা বলত, পাকিস্তানি এস্টাবলিশমেন্ট তাকে দেখত সন্দেহের চোখে। বাঙালিদের 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে গাল দেওয়া হতো। গোয়েন্দা প্রতিবেদন এমনভাবে সাজানো হতো, যাতে করে সরকারি মহলে ধারণা হতো, বাঙালিরা পাকিস্তান ভাঙতে চায়। এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল ১৯৬৭ সালে।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাঁর অফিসে বসে আছেন। মারগালা পাহাড়ে ঘেরা মনোরম ইসলামাবাদ শহর সাজিয়েছেন তিনি নিজ হাতে। এখানেই তাঁর আলিশান দপ্তর। প্রতিদিন সকালে একটি গোয়েন্দা প্রতিবেদন তাঁর টেবিলের ওপর রেখে দেওয়া হয়। তিনি এটি পড়ে দেশের হাল-হকিকত টের পান। ২১ জুলাই তিনি একটি কাগজ দেখেই চমকে ওঠেন। *দৈনিক জং*-এর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী খলিলুর রহমানের কাছে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ওয়াল্টার প্যাট্রিক ম্যাককনির লেখা একটি জরুরি বার্তার অনুলিপি এটি। বার্তাটি পাঠানো হয়েছিল ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেস্টার বোল্‌সের কাছে, দুই বাংলা এবং আসাম প্রদেশ নিয়ে প্রস্তাবিত বাংসাম (BANGSAM) নামের নতুন একটি দেশ তৈরির আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থন জানিয়ে। খলিল সাহেব এটি না ছাপিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে তাঁর ভাইয়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন, যেন তা প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিবের হাতে দেওয়া হয়। বিষয়টির ওপর আমেরিকানদের একটি বৈঠকের কার্যবিবরণীও ওই চিঠির সঙ্গে সংযুক্তি হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। লেখাটি গুপ্তলিখনে তৈরি। এটি পাঠোদ্ধার করে টাইপ করা হয়েছে। ম্যাককনির দাবি, এই 'আন্দোলনে' মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিন রাস্কের আশীর্বাদ আছে এবং যেকোনো মূল্যে এটি বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি আরও বলেছেন, বাংলা সব সময় দিল্লির শাসনের বিরুদ্ধে ছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের বর্তমান দাবি আসলে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবি। পাকিস্তান ও ভারত ঝুঁকির মধ্যে পড়লেও এ আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং তাঁদের সব রকম সহযোগিতা দেওয়া দরকার। চিঠিতে এমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে পূর্বাঞ্চলে

একটি সমন্বিত প্রকল্প নেওয়া দরকার, যাতে করে দুই বাংলার মানুষ একসঙ্গে কাজ করতে পারে।[১৯] আইয়ুব খান তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন :

> এটি যদি চূড়ান্ত নাশকতার কাজ না হয়ে থাকে, তাহলে কোনটি হবে? আমেরিকানরা সব সময় বলে যে কমিউনিস্টরাই শুধু অন্যান্য দেশে নাশকতার কাজে জড়িত। কিন্তু সত্য হলো এই যে আমেরিকানদের নাশকতা এখন সর্বজনীন এবং তা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে।[২০]

বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অজ্ঞতা, ঘৃণা ও ভয় মেশানো। ব্যতিক্রম হয়তো ছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু বাঙালিরা খাঁটি মুসলমান নয়, খাঁটি পাকিস্তানি নয়, এ রকম একটি ধারণা পশ্চিম পাকিস্তানি মানুষের মনের ভেতর ঢোকানো হয়েছিল। পাকিস্তানি এস্টাবলিশমেন্ট সচেতনভাবে এই মনস্তত্ত্ব তৈরি করেছিল। এর সবচেয়ে বড় প্রতিফলন দেখা যায় পাকিস্তানি শাসকদের চিন্তায় ও কাজে। পাকিস্তানি শাসকদের মধ্যে আইয়ুব খান সাড়ে দশ বছর ক্ষমতার শীর্ষে ছিলেন। তাঁর কথাবার্তায় বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানি দৃষ্টিভঙ্গি সবচেয়ে খোলামেলাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ডায়েরি পড়লে বোঝা যায় পূর্ব বাংলার মানুষকে তিনি কেমন চোখে দেখতেন। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য তাঁর ডায়েরি থেকে বেশ কিছু অংশ এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হলো।[২১]

১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬

> মাওলানা আতাহার আলী এসেছিল দেখা করতে। সে একটি চতুর শেয়াল। সে আমার বিরোধিতা করার জন্য মাপ চাইল এবং বলল, বাঙালিরা খুবই সংকীর্ণ ও অনুদার এবং তারা একে অন্যের সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করে। ওপরে ওপরে তারা খুবই ধার্মিক। কিন্তু ইসলামের দর্শন সম্বন্ধে ধারণা খুবই কম এবং উর্দু ভাষা যা উপমহাদেশে প্রচলিত, তা তারা জানে না।

২৯ মার্চ ১৯৬৭

> জানতে পারলাম, জাতীয় পরিষদের স্পিকার আবদুল জব্বার খান দলবল নিয়ে চট্টগ্রামে ফজলুল কাদের চৌধুরীর বাসায় দাওয়াত খেতে গেছেন। অথচ জব্বার খানের জন্য ফজলুল কাদেরকে আমি স্পিকারের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম, এমনকি জব্বার খানের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার জন্য আমি তাকে মুসলিম লীগ থেকে বের করে দিয়েছিলাম। এ জন্য ফজলুল কাদের আমাকে কখনো ক্ষমা করেনি। এতে এটাই প্রমাণিত হয়, এরা কত চরিত্রহীন ও ভীরু। এদের বিশ্বাস করাটাও বোকামি।

১১ এপ্রিল ১৯৬৭

> পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার আসার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে তার কী প্রভাব পড়বে

এ নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললাম। পূর্ব পাকিস্তানে যারা ধ্বংসাত্মক রাজনীতি করে, এতে তারা উৎসাহ পাবে বলে মনে হয়। আবার হিন্দু আধিপত্যের ভীতিও থাকতে পারে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য আমার শেষের মন্তব্যের সঙ্গে একমত হলেন না। তাঁর মতে, পূর্ব পাকিস্তানিরা নাকের সামনের জিনিসটিও দেখতে পায় না। তারা পশ্চিম পাকিস্তান, বিশেষ করে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে নির্বোধের মতো যেনতেন কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতে পারে। ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ হওয়ার ফলে আসামকে নিয়ে তারা রীতিমতো একটি সাম্রাজ্য পেয়েছিল। তাদের বোকামির জন্য এটি তারা হারাল। বঙ্গভঙ্গ বজায় রাখার আন্দোলন না করে তারা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার নামে হিন্দুদের সঙ্গে জোট বাঁধল। এখন তারা আবারও ইতিহাসের এ রকম একটি বাঁকে দাঁড়িয়ে আছে। একটি ভুল করলেই তারা আবার দুই শ বছরের জন্য হিন্দুদের প্রজা হবে।

২৬ এপ্রিল ১৯৬৭

একটি কথা শোনা যাচ্ছে, মুজিবুর রহমান তার লোকদের বলে বেড়াচ্ছে যে যদি তারা পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ করে, তাহলে আমেরিকানরা তাদের সাহায্য করতে ছুটে আসবে। বঙ্গোপসাগরে কয়েকটি আমেরিকান সাবমেরিন নাকি এ জন্য অপেক্ষা করছে। এ রকম কিছু একটা ঘটতে পারে, আমার তা বিশ্বাস হয় না। অবশ্য অদূরদর্শী ও মূর্খরা যা কিছু ভাবতে পারে। তার সমর্থকদের মধ্যে একটি ধারণা তৈরি হয়েছে যে, মে মাসে একটি বিপ্লব হবে এবং এ জন্য তাদের তৈরি থাকা দরকার। সন্দেহ নেই লোকটি সত্যিই বিপজ্জনক এবং যত দিন বেঁচে থাকবে তত দিন সে বাঙালিদের বিপথগামী করবে।

১ মে ১৯৬৭

অর্থমন্ত্রী, অর্থসচিব ও আলতাফ গওহরকে ডেকে তাদের সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে নির্দেশ দিলাম :

ক. বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সাম্প্রতিক আলোচনার ভিত্তিতে নোট তৈরি করা।

খ. একটি ছক তৈরি করা, যাতে একনজরে বোঝা যায়, পূর্ব পাকিস্তান শাসন করা খুব কঠিন হলে এবং ওরা যদি আলাদা হয়ে যেতে চায়, তাহলে ওখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন হবে। যদিও এর সম্ভাবনা এ মুহূর্তে নেই, তবু ভবিষ্যতের জন্য তৈরি থাকতে তো কোনো দোষ নেই। অনেক দেশেই এ ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

১৭ জুন ১৯৬৭

অল্প কয়েক দিনের সফরে মোনায়েম খান এসেছিল। সে বলল, আমি যেন পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে হতাশ না হই, কেননা বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সংখ্যায় খুব

কম। তাকে বললাম, আমি এমন কাউকে দেখছি না যে তাদের মনোভাব বদলাতে সাহায্য করবে। পূর্ব পাকিস্তানিরা স্বভাবতই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলে। সে বিষয়টি বুঝতে পারছে না। আমার দায়িত্ব হলো তাদের সতর্ক করা, যাতে তারা এই আত্মঘাতী প্রবণতার ফলাফলটা ভেবে দেখে।

১২ আগস্ট ১৯৬৭

পূর্ব পাকিস্তানের কথা মনে হলেই আমি ভাবি, এরা কেন পশ্চিম পাকিস্তানকে দূরে সরিয়ে হিন্দুদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে চায়। আসলে তাদের নিজেদের কোনো ভাষা ও সংস্কৃতি নেই, এবং এই উপমহাদেশের মুসলমানদের তমদ্দুন, যার ভিত্তি হলো উর্দু, তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। এটি করে তারা পাকিস্তানের ওপর দুটি রাষ্ট্রভাষা চাপিয়ে দিয়েছে। এটি তাদের জন্য এবং পাকিস্তানের জন্য দুঃখজনক একটি ঘটনা। ইসলামি দর্শনের ওপর তাদের কোনো ভালো সাহিত্য নেই। আমাকে বলা হয়েছে, ইকবালের সাহিত্য থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো অনুবাদ করে তাদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। তবে এটি সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। কেননা, বাঙালিদের নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ নেই।

২১ আগস্ট ১৯৬৭

পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতির ওপর সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার একটি প্রতিবেদন পড়লাম। বলা হয়েছে, ৯৫ শতাংশ লোক গ্রামে বাস করে এবং তারা খাঁটি মুসলমান ও পাকিস্তানপন্থী। শহরবাসীদের অধিকাংশ, যাদের মধ্যে ছাত্র, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা রয়েছে, হয় ন্যাপ অথবা আওয়ামী লীগের সমর্থক। একটি হলো বামপন্থী বা কমিউনিস্ট এবং স্বভাবতই পাকিস্তানের ব্যাপারে এদের মাথাব্যথা নেই। আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে। পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা নেই। তাদের লক্ষ্য হলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যেমন খুশি তেমন করে চলা। প্রতিবেদনে বেশ কয়েকটি সুপারিশ রাখা হয়েছে। এর কতকগুলো ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু এর ফলে বাঙালির মতিগতির কোনো পরিবর্তন হবে বলে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, যদি তারা নিজেরা সহযোগিতা না করে। বর্তমানে তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান এম এম আহমদ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন নিয়ে কথাবার্তা বললেন। পূর্ব পাকিস্তানে অতিরিক্ত বরাদ্দ দিয়েও কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না। দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য বেড়েই চলেছে। এটি হয়েছে তারা অধিকতর

স্বায়ত্তশাসন পাওয়ায়। সমস্যা হলো, তারা দালানকোঠা বানাতে বা জাঁকজমক করতে বেশি খরচ করে, কৃষি বা অন্যান্য প্রকল্প, যেখানে বিনিয়োগ করলে তাড়াতাড়ি বেশি লাভ হবে, সাধারণ মানুষ লাভবান হবে, সেখানে খরচ করে না। এটি গভর্নরের দোষ নয়। যদিও সে অর্থনীতি বা উন্নয়ন বোঝে না। একদল তরুণ বাঙালি কর্মকর্তা তার সঙ্গে কাজ করে। এরা বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন নয়। এরপর আমি যখন পূর্ব পাকিস্তানে যাব, তাদের কিছু কথা শোনাতে হবে। ব্যক্তি খাতের অবস্থা এমন করে রেখেছে যে, সেখানে কেউ বিনিয়োগের ঝুঁকি নিতে চায় না।

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

পূর্ব পাকিস্তানে একটি লম্বা সফর দিয়ে খাজা শাহাবুদ্দীন এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর মতে, হিন্দুপন্থী ও পশ্চিম পাকিস্তানবিরোধী মনোভাব শিক্ষিত সমাজে বাড়লেও জনগণ নিঃসন্দেহে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে বিশ্বাস করে। তাদের আনুগত্য বজায় রাখার জন্য যা কিছু করা দরকার, তা করতে হবে। আমরা সমস্যাগুলো নিয়ে কথাবার্তা বললাম এবং তারা যাতে আবার হিন্দুদের জোয়ালে আটকা না পড়ে, সে জন্য কী কী করা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করলাম। আমি খাজাকে বললাম, পদক্ষেপগুলো সবই তো জাতীয় পরিষদ সদস্যদের জন্য। কিন্তু তাতে লাভ কী, যদি তারা নিজেরা নিজেদের রক্ষা করতে না চায়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন ভবিষ্যৎ দেখছেন? তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তিনি ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশ। একপর্যায়ে বলেই ফেললেন, মাঝে মাঝে তিনি এতটাই মুষড়ে পড়েন যে চূড়ান্ত বিপদ ঘটে যাওয়ার আগেই ঢাকার সব সম্পত্তি বিক্রি করে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে চলে আসতে চান।

আমি দুটি বিষয় নিয়ে সব সময় চিন্তা করি, (১) পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দু ভারতের ষড়যন্ত্র, এবং (২) পূর্ব পাকিস্তানিদের নৈরাশ্যজনক চালচলন। এমন প্রতিবেশী এবং এমন দেশবাসী জুড়ে দিয়ে খোদা আমাদের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন। হিন্দু ও বাঙালি, এর চেয়ে খারাপ সংমিশ্রণ আর কী হতে পারে। আমি খাজাকে হতাশ না হতে পরামর্শ দিলাম। যদি সর্বনাশ ঘটেই যায়, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। যদি প্রয়োজন পড়ে, রক্তের নদী বয়ে যাবে। এর মধ্য থেকে হিন্দুদের দাসত্ব ঝেড়ে ফেলে কোটি কোটি মুসলমান আবার উঠে দাঁড়াবে।

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৭

পূর্ব পাকিস্তানে ভাষাসংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে *পাকিস্তান টাইমস*-এ প্রকাশিত সুলেরির একটা প্রবন্ধ পড়লাম। ঢাকা সফর থেকে ফিরে এসে তিনি এটি

লিখেছেন। তাঁর মত হলো, পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের মানুষ উর্দু ও বাংলা এ দুই ভাষার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত না হওয়া পর্যন্ত যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষা চালু রাখা দরকার। পাকিস্তানের সর্বত্র উর্দু ও বাংলা শেখানো দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন। এটি আসলে বাঙালিদের অদূরদর্শিতা ও গোঁয়ার্তুমির কাছে আত্মসমর্পণ করা। এটি বলা সহজ, করা কঠিন। পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য এটি আরেকটি বোঝা হবে।

১৪ ডিসেম্বর ১৯৬৭

অর্থনৈতিক কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হলো। পরিকল্পনা কমিশনের একটি প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা হলো। পূর্ব পাকিস্তান থেকে দাবি উঠেছে, বরাদ্দ আরও বাড়াতে হবে, এমনকি সামরিক বাহিনীকে সমান ভাগে ভাগ করে দুই প্রদেশে রাখতে হবে এবং সামরিক ব্যয় দুই প্রদেশের জন্য সমান হতে হবে। সামরিক ব্যয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের খরচ কেমন করে ভাগ করা যায়? কেন্দ্র ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অভিযোগ উঠেছে, পূর্ব পাকিস্তান হলো একটি তলাবিহীন পাত্র। কেন্দ্র ও পশ্চিম পাকিস্তান এটি অনবরত ভাবছে এবং নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমার মন্তব্য হলো নিম্নরূপ :

ক) পূর্ব পাকিস্তানে সম্পদের বরাদ্দ দেওয়ার ব্যাপারে আমি আমার কথা রেখেছি। কিন্তু তারা প্রমাণ করেছে, তারা এ ত্যাগের অনুপযুক্ত।

খ) তাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সম্পদ নেওয়া, যদিও জনকল্যাণ নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

গ) কেন্দ্র-প্রদেশ সম্পর্ক ঠিক নেই।

ঘ) কেন্দ্র অনেক কষ্ট করে সম্পদ জোগাড় করে এবং প্রদেশ তা খরচ করে। কিন্তু দায় শোধ করতে হয় কেন্দ্রকে। আর্থিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে প্রদেশের কোনো দায় নেই। এটি সংশোধন করা দরকার।

আসল সমস্যা হলো গভর্নর মোনায়েম খানকে নিয়ে। যদিও সে একজন অত্যন্ত ভালো মানুষ। সে অর্থনীতি, উন্নয়ন ও উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানে না। সবকিছু ড. হুদার হাতে। এরা হচ্ছে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ বোঝার জন্য কোনো পয়গম্বরের দরকার নেই। যারা প্রদেশটা চালাচ্ছে, তাদের ওপর নির্ভর করে এটি কেমন চলবে। এদের সীমাবদ্ধতা অনেক।

১৫ ডিসেম্বর ১৯৬৭

পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী কাজী কাদের আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। সে একজন সাচ্চা মুসলমান, যদিও সে মনে করে যে মোনায়েম খান তাকে অবহেলা করে। সে একটা মজার কথা বলল, বাঙালিরা প্রকৃতিগতভাবে

বেইমান ও অবিশ্বস্ত। কিন্তু আমার ওপর তাদের আস্থা আছে, এমনকি বিরোধী রাজনীতিকেরাও মনে করে তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আমার হাতে। বিগত যুদ্ধের সময় আমি যদি দায়িত্বে না থাকতাম, তাহলে কী হতো?

জানুয়ারি-মার্চ ১৯৬৮

বিখ্যাত বাঙালি লেখক নীরদ চৌধুরীর ইংরেজিতে লেখা একটি প্রবন্ধ দেখলাম। পশ্চিমবঙ্গে সাংবিধানিক সংকট সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন, বাঙালিরা এমনকি হিন্দুরাও নিজেদের দেখভাল করতে পারে না। তারা খুব ছোট মনের মানুষ, সব সময় দলাদলি করে এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা নেই।

বাঙালির মনোভাব দেখে আমি অবাক হই। তারা কোনো যুক্তির ধার ধারে না। তারা হিন্দু, মুসলমান শাসক ও ইংরেজদের অধীনে ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রথমবার তারা স্বাধীনতা ও সমতার স্বাদ এবং নিজেদের সরকার পরিচালনা করার সুযোগ পায়। ইতিহাসে এর আগে কখনো এটি ঘটেনি। যেকোনো স্বাভাবিক মানুষ এ পরিবর্তনে খুশি হতো। কিন্তু তাদের রাজনীতিবিদ এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা এটি বুঝতে অক্ষম। তারা তাদের অতীতে ফিরে যেতে চায়। এর ফল হবে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু আধিপত্যের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া।

৬ জুলাই ১৯৬৮

মুশকিল হলো, পূর্ব পাকিস্তানে যোগ্য লোকের বড়ই অভাব। এ প্রসঙ্গে কুমিল্লা একাডেমির পরিচালক আখতার হামিদ খানের সঙ্গে দুই বছর আগের আলাপচারিতার প্রসঙ্গ মনে পড়ল। আমি তাঁর কাছে পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন লোকের নাম জানতে চেয়েছিলাম, যাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জায়গা দেওয়া যেতে পারে। তিনি অল্প কথার মানুষ, কাঠখোট্টা স্বভাবের। বললেন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে কাউকে নিতে হলে চার আনা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এর চেয়ে বেশি আশা করা হবে বোকামি এবং সময়ের অপচয়।

১ অক্টোবর ১৯৬৮

ছাত্রদের সুশিক্ষার জন্য শরীর ও মন দুটোই গড়ে তোলা দরকার। চেষ্টা থাকতে হবে, ইসলামকে প্রগতির বাহন হিসেবে দেখার। শাহ ওয়ালিউল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ, ইকবাল, কায়েদে আজম ও নজরুল ইসলামের কাছ থেকে আমরা কী শিখতে পারি, তা নিয়ে আলোচনা হতে হবে। এর ফলে তরুণদের মন থেকে অনেক বিভ্রান্তি দূর হবে। এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা সারা দেশে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে খুবই দরকার। মুসলমানদের বহিরাগত হিসেবে দেখা হয়। এটি মুসলমানদের মধ্যে একতা নষ্ট করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শূদ্র থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে। এদের লেখাপড়া অল্প। এরা ভাষা ও

পালাপার্বণের মধ্য দিয়ে আবার হিন্দু হতে চায়। হিন্দুত্বের অভিশাপ থেকে এদের রক্ষা করা একটি কঠিন কাজ।

ওপরে ডায়েরির যে অংশগুলো উল্লেখ করা হলো, তা থেকে ওই সময়ের পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অবস্থা, তাদের রাজনীতি ও অর্থনীতি, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্ক, বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের মনোভাব ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়। এটি অস্বীকার করা যাবে না, এই পাকিস্তানি দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের একটি বিরাট অংশের সমর্থন তো ছিলই, পূর্ব পাকিস্তানের অনেক বাঙালি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তা না হলে ২৪ বছর পাকিস্তান রাষ্ট্রটি অখণ্ড থাকতে পারত না।

আইয়ুব খান গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তবে তিনি ছিলেন সমকালীন পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের তুলনায় অনেক বেশি আধুনিক ও সংস্কারমুক্ত। তাঁর অপছন্দের তালিকার শীর্ষে ছিল জামায়াতে ইসলামী ও আওয়ামী লীগ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এমন দিন আসবে, যখন বাঙালিরা পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে না। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন শান্তিপূর্ণভাবে করা যায় কি না, এ নিয়ে একসময় তাঁর একটি চিন্তা ছিল। কিন্তু এটি কার্যকর করার জন্য যথেষ্ট সুযোগ ও সময় তিনি পাননি। ক্ষমতার শীর্ষ পদটি আঁকড়ে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে তিনি পাকিস্তানি রাজনীতিকে ধর্মাশ্রয়ী করেছেন। ১৯৬২ সালে তিনি যখন নতুন সংবিধান জারি করেন, তাতে পাকিস্তানকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়নি। এটি পরে সংযোজন করে তিনি হলেন 'চলতি হাওয়ার পন্থী'। বাঙালিদের প্রতি তাঁর প্রবল বিতৃষ্ণার একটি কারণ হতে পারে এই যে, তিনি ছোট মনের বাঙালিদের সঙ্গে ওঠাবসা করতেন। তাঁর সবচেয়ে পছন্দের মানুষ ছিলেন মোনায়েম খান। মোনায়েম খান সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা আছে এমন বাঙালি ছিল বিরল। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানেও তাঁকে নিয়ে সব সময় ঠাট্টা-তামাশা হতো। তাঁকে নিয়ে একটি চুটকি চালু ছিল পাঞ্জাবে। গল্পটা এ রকম: মফস্বল থেকে ঢাকা শহরে এক লোক ঢুকছে চতুষ্পদ জানোয়ারের পিঠে চড়ে। এই জানোয়ারটা বাংলা মুলুকে দুর্লভ হলেও এখানে অনেকেই মোট বইবার জন্য ব্যবহার করে। তো দেখা গেল, এক দিন পরই তাঁকে গভর্নর বানিয়ে দেওয়া হলো।[২২]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৬৭ সালের ২২ ডিসেম্বর। আইয়ুব খান তাঁর অফিসঘরে বসে আছেন। সামনে টেবিলের ওপর একটি গোয়েন্দা প্রতিবেদন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলা গঠন করার একটি ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রের হোতা নৌবাহিনীর একজন বাঙালি কর্মকর্তা। তিনি ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় মিশন এবং আরও কয়েকজনের সহযোগিতায় সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য, বেসামরিক কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসহ অনেকেই এর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন, সক্রিয় সমর্থন দিয়েছেন, যদিও মশিউর রহমান ও মোহন মিয়া কোনোভাবেই এর সঙ্গে জড়িত নন। কীভাবে এর মোকাবিলা করা হবে, তদন্ত শেষ হলে তা নির্ধারণ করা হবে।[১]

আইয়ুব খানের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর কেউ নন, স্বয়ং সবুর খান। তিনি সবুর খানকে ডেকে পাঠালেন। সবুর খান বললেন, তিনি বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আইয়ুব খান তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীনকে একটা চিঠি দিয়ে তাঁর হতাশার কথা জানান। তাঁর ধারণা, তাঁর মন্ত্রিসভার বাঙালি মন্ত্রীদের কেউ কেউ তথ্য গোপন করছেন। খাজা শাহাবুদ্দীন প্রেসিডেন্টকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন। এ ধরনের একটি জটিল বিষয়ের সুরাহা করার জন্য কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত বলে তিনি পরামর্শ দেন। পরামর্শগুলো ছিল :

১) এখন পর্যন্ত যেটুকু জানা গেছে, তাতে মনে হয় কোনো রাজনৈতিক দল এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত নয়। সুতরাং সরকারদলীয় কতিপয় নেতার কথা শুনে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর অভিযোগ আনলে জনগণ এটির ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে।

২) জনগণ এমন মনে করতে পারে যে বিরোধী দলকে দমন করার জন্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এ নাটক সাজিয়েছে।

৩) জনগণ মনে করতে পারে, রাজনীতিকদের ফাঁসালে মূল শত্রু ভারত ছাড়

পেয়ে যাবে এবং দেশ-বিদেশে এটিই মনে করা হবে, এ ঘটনার পেছনে জনসমর্থন আছে।

৪) বিরোধী সব রাজনৈতিক দল বা কোনো একটি দলকে দায়ী করলে হিতে বিপরীত হতে পারে, তখন তারা অনন্যোপায় হয়ে আরও বেশি ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োজিত হবে।

৫) বিষয়টিকে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা দরকার। বিষয়টি সব মন্ত্রী ও সরকারি মুখপাত্রকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন এবং দলেরও উচিত হবে সব গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে বিষয়টি উপলব্ধি করানো।[২]

২ জানুয়ারি (১৯৬৮) পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র দপ্তর প্রথম একটি 'ষড়যন্ত্রমূলক' তৎপরতার কথা ঘোষণা করেছিল। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জনসমক্ষে আসে ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দেওয়া একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়:

পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার একটি ভারত-সমর্থিত ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোট ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

একজন সরকারি মুখপাত্র সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে প্রকাশিত তালিকাটি এ-যাবৎ ধৃত ব্যক্তিদের পূর্ণ তালিকা।

আজকের ঘোষণায় সরকারের এর আগেকার একটি প্রেসনোটকেই বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। আগের প্রেসনোটে রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতার দায়ে কতিপয় লোককে গ্রেপ্তারের কথা বলা হয়েছিল। সেই সংক্ষিপ্ত ঘোষণা দেশে নানা ধরনের জল্পনার সৃষ্টি করেছিল। আজকের ঘোষণায় ধৃত ব্যক্তিদের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করায় সব রকম জল্পনার সমাপ্তি ঘটেছে।

এদের সবাইকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তিদের অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার এ ষড়যন্ত্রে তাদের নিজ নিজ ভূমিকার কথা স্বীকার করেছে। এদের কেউ কেউ কমপক্ষে একজন ভারতীয় কূটনীতিক মি. ওঝার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। এরা আগরতলার ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার লে. ক. মিশ্র এবং মেজর মেননের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ভারতের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহই এ সাক্ষাতের উদ্দেশ্য ছিল।

তবে আজ যে ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বের কোনো ইচ্ছা প্রকৃতপক্ষে ভারতের নেই। কাশ্মীর বিরোধ ও অন্যান্য বিরোধ পাকিস্তানের প্রতি একটি গভীর শত্রুতারই প্রকাশ।

ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে দুজন সিএসপি অফিসার আহমদ ফজলুর রহমান ও রুহুল কুদ্দুসকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সামরিক শাসনামলে স্ক্রিনিং

কমিটি এদের দুজনের প্রতি নোটিশ দিয়েছিল। পরে প্রেসিডেন্ট উভয়কেই ক্ষমা করেন এবং আরেকবার সরকারি কাজ করার সুযোগ দেন।

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে স্বাভাবিকভাবে দেশের উভয় অংশের জনসাধারণের মধ্যে যে ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে, সরকার সে সম্পর্কে সচেতন। তাই সরকার তদন্তের ফলাফল, অগ্রগতি এবং এদের বিচার-সম্পর্কিত সব তথ্য জনসাধারণকে জানাবে।

এ ব্যাপারে তদন্ত সমাপ্তির পথে এবং বিচার শিগগিরই শুরু হবে। ধৃত ব্যক্তিরা হলেন অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল সংস্থায় কর্মরত পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী, মি. বিধান কৃষ্ণ সেন, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ডাক্তার সাইদুর রহমান, সার্ভিস সিভিল ইন্টারন্যাশনালের (সুইজারল্যান্ড) পাকিস্তান শাখার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এম আলী রেজা, আহমদ ফজলুর রহমান সিএসপি (স্বাস্থ্যগত কারণে ১৯৬৬ সাল থেকে ছুটি ভোগ করছেন), রুহুল কুদ্দুস সিএসপি (অবসর গ্রহণের প্রস্তুতির ছুটি ভোগ করছিলেন এবং একটি ট্রেনিং কোর্সের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন), মুহিবুর রহমান (সাবেক নেভাল স্টুয়ার্ড), কামাল উদ্দিন আহমদ (সাবেক নেভাল পেটি অফিসার), সুলতান উদ্দিন আহমদ (সাবেক নেভাল লিডিং সি-ম্যান), মীর্জা এম রমিজ (পিআইএতে কর্মরত অবসরপ্রাপ্ত সাবেক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট), আমির হোসেন (পাকিস্তান বিমানবাহিনীর সাবেক করপোরাল), খুরশীদ আলম (সাবেক নেভাল লিডিং সি-ম্যান), মোহাম্মদ মাহমুদ আলী, এ বি এম ইউসুফ, তাজুল ইসলাম, খুরশীদ মিয়া, দলিলুদ্দিন, মামুদ আর চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন, পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান, ডাক্তার ক্যাপ্টেন খুরশিদুদ্দিন, এ এম সি সুবেদার আবদুর রাজ্জাক (পাকিস্তান সেনাবাহিনী), সার্জেন্ট এ এম এফ হক (বিমানবাহিনী), সার্জেন্ট শামসুদ্দিন (বিমানবাহিনী) ও হাবিলদার ইনসাফ আলী।[৩]

৬ জানুয়ারি ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি পি এন ওঝাকে পাকিস্তান সরকার বহিষ্কার করে। এর পাল্টা জবাবে ভারত সরকার দিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশনের উপদেষ্টা এম আহমদকে এক দিনের মধ্যে ভারত ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

১৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও পরিচালনার সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাজেই অন্যদের সঙ্গে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে তিনি আগে থেকেই জেলে ছিলেন।'[৪]

যত দূর জানা যায়, সশস্ত্র বাহিনীর ছোট্ট একটি বিক্ষুব্ধ গ্রুপ বাঙালি সেনা ও অফিসারদের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে গোপনে একটি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

গড়ে তোলে। করাচির মনরো দ্বীপে ১৯৬২ সালে এক কর্মকর্তার বাসায় প্রথম আনুষ্ঠানিক গোপন সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। লে. ক. মোয়াজ্জেম, স্টুয়ার্ড মুজিব, সি-ম্যান নুর মোহাম্মদ ও লিডিং সি-ম্যান সুলতান উদ্দিন এ সভায় ছিলেন। পরবর্তী সময়ে যাদের বিশ্বাস করা যায়, তাদেরই তাঁরা এ সংগঠনের সদস্য করে নেন। সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন, সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হবে। এ আন্দোলনের একজন উচ্চপদস্থ নেতার প্রয়োজন মনে করা হলে কর্নেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ওসমানী নৈতিক সমর্থন জানিয়ে ওই মুহূর্তে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, সশস্ত্র বিদ্রোহ করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা বাঙালি রেজিমেন্টের এখনো হয়নি, 'সেপাই সুরু মিয়া এখনো হামাগুড়ি দেওয়ার উপযুক্ত হয়নি'। আরও ১০টি বাঙালি রেজিমেন্ট গঠন না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার। বিদ্রোহীরা অতটা সময় অপেক্ষা করতে রাজি ছিলেন না। তাঁরা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করলেন। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও মওলানা ভাসানীর সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা হলো। শেখ মুজিবের সঙ্গে বিদ্রোহী দলের প্রথম যোগাযোগ হয় ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে করাচিতে। মোয়াজ্জেম নিজে শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠক হয় এবং মোয়াজ্জেম তাঁর পরিকল্পনা তুলে ধরেন। শেখ মুজিব তখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহর প্রচার নিয়ে ব্যস্ত। তিনি মোয়াজ্জেমকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেন এবং বলেন যে ফাতেমা জিন্নাহ নির্বাচনে জিতলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আর প্রয়োজন হবে না।[৫]

শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে যাবেন, এ সংবাদ পেয়ে মোয়াজ্জেম তাঁকে লাহোর যাওয়া থেকে বিরত রাখার পরিকল্পনা করেন। তাঁর ধারণা ছিল, লাহোরে শেখ মুজিব তাঁর দাবিদাওয়া উপস্থাপন করলে শেখ মুজিবের ওপর গোয়েন্দা নজরদারি অনেক বেড়ে যাবে এবং তাঁদের পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীকে মোয়াজ্জেম তাঁর আশঙ্কার কথা জানান এবং শেখ মুজিবকে এ কথা জানিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করার জন্য খুব উদ্গ্রীব ছিলেন। গাফ্ফার চৌধুরীর কাছে মোয়াজ্জেমের নাম শুনেই শেখ মুজিব ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, 'আমি তাকে চিনি। আমি জানি সে কী চায়। ইদানীং সে মানিক চৌধুরীর সঙ্গে মাখামাখি করছে। আমি মানিককে এসব পাগলামি থেকে দূরে থাকতে বলেছি। আমি তোমাকেও বলছি, এসব থেকে দূরে থাকো। আমাদের লড়াই হচ্ছে বাংলার মানুষের জন্য গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন আদায় করা। আমি সব সময় পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, এর পরিবর্তে বাঙালি সামরিক জান্তাকে

ক্ষমতায় বসানোর জন্য নয়।' এরপর মোয়াজ্জেমের সঙ্গে শেখ মুজিবের আর কোনো যোগাযোগ হয়নি।[৬]

মোয়াজ্জেম তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হন। তাঁরা একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠন করেন। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে তাঁর চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির বাসায় একটি জরুরি সভা ডাকেন। এ সভায় তিনি প্রস্তাবিত নতুন রাষ্ট্রের নাম 'বাংলাদেশ', জাতীয় পতাকার ডিজাইন ও রাষ্ট্রীয় মূল নীতিগুলো সদস্যদের সামনে তুলে ধরেন। নীতিগুলো ছিল :

১) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা;
২) যে কাজ করবে না, সে খাবে না—এ নীতি বলবৎ করা;
৩) সকল ব্যক্তিগত সম্পত্তি সরকারের মালিকানাধীন করা;
৪) কলকারখানা জাতীয়করণ করা;
৫) প্রতিটি নাগরিকের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা।[৭]

অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে মোয়াজ্জেম ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি পি. এন ওঝাকে মানিক চৌধুরীর মাধ্যমে অস্ত্রের একটি তালিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ওঝা ও মানিক চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগের ভার দেওয়া হয় সাবেক করপোরাল আবদুস সামাদকে। এ যোগাযোগ নিরাপদ ও সন্দেহমুক্ত রাখার জন্য স্থান হিসেবে আহমদ ফজলুর রহমানের স্ত্রী হাসিনা রহমানের ঢাকাস্থ্ 'গ্রীন ভিউ' পেট্রল পাম্প নির্ধারণ করা হয়। আবদুস সামাদকে পেট্রল পাম্পের ম্যানেজারের চাকরি দেওয়া হয়।[৮]

চট্টগ্রামের সায়দুর রহমানের মাধ্যমে মোয়াজ্জেম ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে ওঝার সঙ্গে পাঁচবার দেখা করেন। পঞ্চম বৈঠকে ওঝা জানান, ভারত সরকার অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের আগে বিপ্লবী দলের সঙ্গে ভারত সরকারের কর্মকর্তাদের আলোচনা হওয়া দরকার বলে মনে করে। ওঝা আগরতলায় দুই পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠকের প্রস্তাব করেন। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে এক জরুরি সভায় সিদ্ধান্ত হয়, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও আলী রেজা প্রতিনিধি হিসেবে আগরতলায় যাবেন। ১২ জুলাই প্রতিনিধিদল বিলোনিয়া হয়ে আগরতলায় পৌঁছায়। কিন্তু প্রতিনিধিদলের সদস্যরা নিম্নপদস্থ হওয়ায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের সঙ্গে আলোচনায় রাজি হয়নি। এ বৈঠক না হওয়ায় মোয়াজ্জেম নিজেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৬৮ সালের ১৬ জানুয়ারি বৈঠকের দিন ঠিক করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে মোয়াজ্জেম প্রথমে নেপালে যাবেন এবং সেখান থেকে দিল্লি পৌঁছাবেন। তাঁর সঙ্গী হবেন আহমদ ফজলুর রহমান। কিন্তু এ পরিকল্পনা আর বাস্তবায়িত হয়নি।[৯]

১৯৬৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সরকারি কর্মসূচি ছিল। একই সময় চট্টগ্রামে দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করা হচ্ছিল। পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতিসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কর্মকর্তার চট্টগ্রামে আসার কথা ছিল। বিপ্লবীরা এ সুযোগে সেনাপ্রধানসহ সব কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার এবং অন্যান্য সেনানিবাসে যুগপৎ আক্রমণ করে দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু বিপ্লবী পরিষদের দলত্যাগী কোষাধ্যক্ষ করপোরাল আমির হোসেনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এ পরিকল্পনার তথ্য সরকারের গোয়েন্দা বাহিনীর কাছে চলে যায়। ফলে চট্টগ্রামের অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সরকার অতি গোপনে কিছু কিছু গ্রেপ্তার করার কাজ শুরু করে।[১০]

দলের এক সভায় মোয়াজ্জেম বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে আমির হোসেনের প্রাণদণ্ডের নির্দেশ দেন। এটি কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয় আশরাফ আলীকে। আশরাফ আমির হোসেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি আমির হোসেনকে সতর্ক করে দেন। ১৯৬৭ সালের অক্টোবরে প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে আমির হোসেন রাওয়ালপিন্ডিতে নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা অফিসে নিজেই হাজির হয়ে সবকিছু ফাঁস করে দেন। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গণগ্রেপ্তার শুরু হয়। গ্রেপ্তার পর্ব প্রায় শেষ হয়ে গেলে ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর একটি প্রেসনোট দিয়ে 'ষড়যন্ত্রের' কথা প্রকাশ করে। ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আরেকটি ঘোষণায় শেখ মুজিবুর রহমান ও শামসুর রহমান খান সিএসপিকে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার অভিযোগে আটক করা হয়। মুজিব আগে থেকেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে বন্দী ছিলেন।[১১]

এ 'ষড়যন্ত্রের' সঙ্গে শেখ মুজিবের নাম জড়ানো নিয়ে লুকোচুরি খেলা হয়েছে। সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান এ ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা রাখেন। যখন 'ষড়যন্ত্রকারীদের' গ্রেপ্তার করা শুরু হয়, তিনি তখন মুজিবকে এ সুযোগে দেশদ্রোহী হিসেবে কলঙ্কিত করার সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাননি। গ্রেপ্তার হওয়া অনেককে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়, যাতে তাঁরা মুজিবকে জড়িয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। ঢাকার মগবাজারে একটি 'সেফ হোমে' ধরে এনে তাঁদের দিনের পর দিন নির্যাতন করা হয়। নির্যাতন সইতে না পেরে অনেকেই 'রাজসাক্ষী' হতে রাজি হন।[১২]

পুরো বিষয়টি তখন পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। সবকিছু গুছিয়ে আনার পর প্রেসিডেন্টের সম্মতির প্রয়োজন দেখা দেয়। আইয়ুব খান স্বৈরশাসক হলেও আইনি ব্যাপারে ছিলেন খুঁতখুঁতে স্বভাবের। সুতরাং

সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী যে 'ষড়যন্ত্র' উদ্‌ঘাটন করেছে, তার যথার্থতা নিয়ে আইয়ুব নিঃসন্দেহ হতে চাইলেন, যাতে করে এটি আদালতে প্রশ্নের মুখে না পড়ে। ইয়াহিয়া তখন আইয়ুবের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করেন। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে আইয়ুব পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। তাঁর চন্দ্রঘোনা কাগজের কল দেখতে যাওয়ার কথা ছিল। সামরিক গোয়েন্দা সূত্রে বলা হলো, প্রেসিডেন্ট যে বিমানে চড়ে চট্টগ্রামে যাবেন, ষড়যন্ত্রকারীরা বোমা মেরে তা উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। আইয়ুব তাঁর চট্টগ্রাম যাত্রা বাতিল করে দেন। 'বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ষড়যন্ত্রের' কথা জেনে তিনি মুষড়ে পড়েন। তথ্যসচিব আলতাফ গওহরকে তিনি সখেদে বলেন, 'ওরা আমাদের সঙ্গে আর থাকবে না।' আইয়ুব চেয়েছিলেন একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এর বিচার হোক। ইয়াহিয়া তখন কয়েকজন মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাকে নিয়ে সেনাসদরে একটি সভা করেন। ইয়াহিয়া দাবি করেন যে এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে শেখ মুজিব জড়িত। তিনি একটি প্রকাশ্য বিচারের প্রস্তাব করেন, যাতে করে বিষয়টি প্রচার পায়। আলতাফ গওহর দ্বিমত প্রকাশ করে বলেন, তাহলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম হুমড়ি খেয়ে পড়বে এবং মামলার দুর্বলতা ও ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করবে। ইয়াহিয়া আলতাফ গওহরকে আশ্বস্ত করে বলেন, চিন্তার কারণ নেই, মামলাটি একেবারেই নিশ্ছিদ্র। আলতাফ জবাবে বলেন, তাহলে প্রচারও হবে নিশ্ছিদ্র।[১৩]

আলতাফ গওহর আইয়ুব খানকে ইয়াহিয়ার সঙ্গে এ বৈঠকের বিষয়টি জানিয়ে বলেন, শক্ত প্রমাণ ছাড়া মুজিবকে এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়ালে বিপদ হতে পারে। আইয়ুবের পরামর্শে তখন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকা থেকে মুজিবের নাম বাদ দেওয়া হয়। কয়েক দিন পর যখন স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে প্রেসনোট দেওয়া হলো, দেখা গেল মুজিবের নামটি রয়েছে তালিকার শীর্ষে। ইয়াহিয়া যেভাবেই হোক এ ব্যাপারে আইয়ুবকে রাজি করাতে পেরেছিলেন। এই সিদ্ধান্ত ছিল খুব দুঃখজনক এবং এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। ইয়াহিয়া নিশ্চয়ই জানতেন যে মামলাটি হবে প্রচণ্ড রকম বিস্ফোরক, যা সরকারের সব সুনাম ধুলায় মিশিয়ে দেবে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে, সম্ভবত চিরদিনের জন্য।[১৪]

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ২৫ জানুয়ারি (১৯৬৮) আলতাফ গওহরকে ডেকে পাঠান। আইয়ুব তখনো তাঁর হৃদ্‌রোগের ধাক্কা সামলে ওঠেননি। আলতাফ গওহর সরাসরি আইয়ুবের শোবার ঘরে চলে যান। তাঁদের কথোপকথন ছিল এ রকম :

আলতাফ : বাঙালিরা সম্ভবত ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে না।

আইয়ুব : বাঙালিদের কথা উঠলেই তোমার মধ্যে আশঙ্কা জেগে ওঠে!

আলতাফ : বাঙালিরা সম্ভবত খুব আবেগপ্রবণ এবং সংগত কারণেই তাদের মধ্যে ক্ষোভ আছে। সংবিধান অনুযায়ী তারা তাদের প্রাপ্য পাচ্ছে না। জাতীয় পরিষদ এবং এর সচিবালয় ঢাকায় থাকার কথা, যা কিনা হবে দ্বিতীয় রাজধানী। তাদের একটা ভুতুড়ে শহর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। জাতীয় পরিষদের সব কাজ হয় ইসলামাবাদে এবং পরিষদের কর্মচারীরাও এখানে স্থায়ীভাবে থাকে।

আইয়ুব : আমার প্রিয় বন্ধু, শোনো। আমি তাদের দ্বিতীয় রাজধানী দিয়েছি। কারণ, একদিন তাদের এটি দরকার হবে। তারা আমাদের সঙ্গে থাকবে না।[১৫]

'আগরতলা ষড়যন্ত্রের' মূল পরিকল্পনাকারী ও নেতা ছিলেন পাকিস্তান নৌবাহিনীর লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। সরকার 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' রুজু করার সময় তাঁকেই প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করেছিল। পরে এই মামলায় শেখ মুজিবকে জড়ানো হলে মোয়াজ্জেমকে '২ নম্বর আসামি' করা হয়। কমান্ডার মোয়াজ্জেমের পরিকল্পনা সম্পর্কে অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেছে। এ ব্যাপারে কিছু চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন তাঁর স্ত্রী কোহিনূর হোসেন :

এটি ১৯৬৪ সালের কথা। আমার বয়স কম। ক্লাস টেনে পড়ার সময় বিয়ে হয়ে যায়। অনেক কিছুই বুঝতাম না। করাচিতে ড্রিগ রোডে মোহাম্মদ আলী কলোনির বাসায় তাঁর কাছে অনেকেই আসতেন। কথা বলতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হয়তো মাঝরাতে এসে আমাকে বললেন, 'এতজনকে খাওয়াতে হবে।' বলতাম, ঘরে তো তেমন কিছু নেই, কী খাওয়াব? উনি বলতেন, 'আলুভর্তা-ডিম, যা কিছু হোক, কেউ না খেয়ে যাবে না।' মাঝে মাঝে বিরক্ত হতাম। মামলা চলার সময় এদের অনেককে দেখে আমি চিনতে পেরেছি।

একদিন সন্ধ্যায় বাসায় এসে বললেন, 'ভালো কিছু আয়োজন করো, একজন বিশেষ অতিথি আসবেন।' আমি কয়েক পদ রান্না করলাম। তারপর কে বা কারা এল, দেখিনি। সকালে উনি বললেন, 'জানো কে এসেছিল, শেখ মুজিব!' বললাম, আমাকে একটু ডাকলেই পারতে, ওনাকে দেখতাম। শেখ মুজিব দুবার আমাদের বাসায় এসেছিলেন। শুনেছিলাম, রুহুল কুদ্দুস সাহেব আর আহমদ ফজলুর রহমান সাহেব শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন।

উনি প্রায়ই উইকএন্ডে ঢাকায় যেতেন। শনিবার গিয়ে সোমবারে চলে আসতেন। বলতেন, অফিসের কাজ থাকে। তারপর উনি বদলি হলেন। তখন আমরা বরিশালে। উনি ডেপুটেশনে বিআইডব্লিউটিএতে। বললেন, বরিশালে থাকলে সুবিধা, প্রতি সপ্তাহে ঢাকা যাওয়া যায়। আবার একটা কথা প্রায়ই বলতেন, ভাত আর রুটি এক থালায় রাখা যায় না। পশ্চিম পাকিস্তানিদের উনি একদম দেখতে পারতেন না।

এটি ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি হবে হয়তো। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, উনি বসে কোরআন তিলাওয়াত করছেন। বললাম, এত রাতে? নিজের মনেই বললেন, এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওরা বিলোনিয়া ক্রস করেছে।[১৬]

এই মামলার শিরোনাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'। ১৯৬৩ সালের ফৌজদারি আইন সংশোধনীর (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল অর্ডিন্যান্স) ৪ ধারা অনুযায়ী ২১ এপ্রিলের (১৯৬৮) এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। মামলার বিবরণীতে বলা হয় :

গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের অনুসরণে এমন একটি ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটন করা হয়, যার মাধ্যমে ভারত কর্তৃক প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও অর্থ ব্যবহার করে পাকিস্তানের একাংশে সামরিক বিদ্রোহের দ্বারা ভারতের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি স্বাধীন সরকার গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কতিপয় ব্যক্তিকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা আইনের আওতায় এবং কতিপয় ব্যক্তিকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে চাকরির সঙ্গে সম্পৃক্ত আইনের আওতায় গ্রেপ্তার করা হয়।...

তাদের প্রধান কর্মপরিকল্পনা ছিল সামরিক ইউনিটগুলোর অস্ত্রশস্ত্র দখল করে সেগুলো অচল করে দেওয়া। কমান্ডো স্টাইলে অভিযান চালিয়ে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।[১৭]

অধিকাংশ নেতা জেলে আটক থাকার কারণে আওয়ামী লীগের তখন ছন্নছাড়া অবস্থা। আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে সক্রিয় জনমত গড়ে তোলার মতো অবস্থা তখন দলটির ছিল না। এ মামলার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদটি উচ্চারিত হয় ঢাকার জগন্নাথ কলেজের ছাত্রদের মুখে। মামলায় শেখ মুজিবকে জড়ানোয় ছাত্রলীগের কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি কাজী ফিরোজ রশীদ ও সাধারণ সম্পাদক কাজী সাইফুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের কর্মীরা একটি মিছিল বের করেন। এই মিছিলের পর পুলিশ জগন্নাথ কলেজের ছাত্রনেতাদের ওপর খেপে ওঠে। মফিজুর রহমান, কাজী ফিরোজ রশীদ, সাইফুদ্দীনসহ অন্য নেতাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ হন্যে হয়ে ওঠে। ছাত্রনেতারা একের পর এক গ্রেপ্তার হন।[১৮]

মামলায় ৩৫ জন অভিযুক্ত এবং ২৩২ জন সাক্ষীর তালিকা দেওয়া হয়। অভিযুক্তদের মধ্য থেকে ১১ জনকে ক্ষমা করে রাজসাক্ষী বানানো হয়। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, আসামিরা ছদ্মনাম ব্যবহার করে তাঁদের গোপন তৎপরতা চালাতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান (পরশ), লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেন (আলো), আমির হোসেন মিয়া (উল্কা), ক্যাটারিং লে. মোজাম্মেল হোসেন (তুহিন), সাবেক লিডিং সি-ম্যান সুলতান উদ্দিন আহমদ (কামাল), স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান (মুরাদ), রুহুল কুদ্দুস সিএসপি (শেখর) ও

।। পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাঁড়াও ।।

৭ জুন স্মরণে ১৯৬৮ সালে 'সংগ্রামী জনতা'র বরাত দিয়ে ছাত্রলীগের একটি প্রচারপত্র

লিডিং সি-ম্যান নূর মোহাম্মদ (সবুজ)।[১৯] অভিযোগপত্রে কর্নেল ওসমানীর নাম উল্লেখ থাকলেও তাঁকে আসামি কিংবা সাক্ষী করা হয়নি।

১৯৬৮ সালের ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসের ভেতর একটি ঘরে মামলার বিচারকাজ শুরু হয়। পত্রপত্রিকায় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে সংবাদ পরিবেশন করা হতে থাকে। তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি শেখ আবদুর রহমান এবং অন্য দুজন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি এম আর খান ও মুকসুমুল হাকিম।[২০] তাঁরা দুজনই ছিলেন বাঙালি।

মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য আইনজীবী নিয়োগের প্রক্রিয়ার শুরুটা ছিল হতাশাব্যঞ্জক। আইনজীবীদের অন্যতম ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের বিবরণ থেকে জানা যায়, কে জেড আলম, সাখাওয়াত হোসেন, আবুল খায়ের খান ও মওদুদ এই চারজন তরুণ ব্যারিস্টার শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা কেউ আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন না। আওয়ামী লীগের বেশির ভাগ নেতা তখন জেলে। সংগঠন বলতে কিছুই ছিল না। বাইরে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই নিশ্চুপ। এই চারজন আইনজীবী বেগম মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসায় যান। বেগম মুজিব প্রথমে তাঁদের কথা বিশ্বাস করেননি। তিনি বলেছিলেন, 'আমার বাড়ির ওপর দিয়ে এখন কাক পর্যন্ত ওড়ে না। আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবেরা এই রাস্তা দিয়ে আর যায় না, আমাদের বাড়ি এড়াবার জন্য অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে যায়। বন্ধুবান্ধবেরা যারা তার (মুজিবের)

কাছ থেকে উপকার পেয়েছে তারাও আর আসে না, আপনাদের তো আমি চিনি না।' এরপর তাঁরা চারজন মানিক মিয়ার সঙ্গে আলাপ করে তাঁকে নিয়ে বেগম মুজিবের সঙ্গে দেখা করেন এবং মানিক মিয়ার বাসায় কয়েকটি বৈঠক করেন। বেগম মুজিব তাঁদের বিশ্বাস করতে শুরু করলেন। এর প্রায় এক মাস পর তিনি তাঁর এক আত্মীয়কে নিয়ে মওদুদের কায়েতটুলীর বাসায় মাঝরাতে এসে শেখ মুজিবের সই করা একটি ওকালতনামা দিয়ে তাঁদের উদ্যোগ নিতে বলেন। ঢাকা হাইকোর্টে আইনজীবীদের নিয়ে একটি কমিটি করার চেষ্টা প্রথমে ব্যর্থ হয়। সিনিয়র আইনজীবীরা কেউ ওকালতনামায় সই দেননি। মওদুদ তখন লন্ডনে তাঁর বন্ধুদের শরণাপন্ন হন। জাকারিয়া খানের নেতৃত্বে লন্ডনের বাঙালিরা স্যার টমাস উইলিয়ামের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁকে নিয়োগ করে। টমাস উইলিয়াম আসছে জেনে ঢাকায় অনেক আইনজীবী উৎসাহ দেখান। শেষ পর্যন্ত আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে আইনজীবীদের একটি 'ডিফেন্স কাউন্সেল' গঠন করা সম্ভব হয়।[২১]

১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে আইয়ুব খান চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান। যে হোটেলে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, প্রথম দিনই ওই হোটেলের সামনে পূর্ব পাকিস্তানি ছাত্রদের একটি বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। যেভাবেই হোক তাঁরা শেখ মুজিবকে বাঁচানোর জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ছাত্ররা 'রাইটস অব ইস্ট পাকিস্তান ডিফেন্স ফ্রন্ট' গঠন করেন এবং বিলেতের খ্যাতনামা আইনজীবী টমাস উইলিয়াম কিউসিকে ঢাকায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে আইনজীবীদের সঙ্গে যোগ দেওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। ব্রিটিশ গণমাধ্যমও এ মামলার ব্যাপারটি পছন্দ করেনি। *দ্য টাইমস*-এর মন্তব্য ছিল, এমন সময় মুজিবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে, যখন তিনি জেলে বন্দী। ঢাকা সেনানিবাসে আদালত বসানোয় মনে হয় এর পেছনে সেনাবাহিনীর কারসাজি আছে।[২২]

মামলা চলাকালে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনকে বিচারকক্ষে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পছন্দমতো আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ পান। শেখ মুজিবের পক্ষে প্রধান কৌঁসুলি নিযুক্ত হয়েছিলেন আবদুস সালাম খান। টমাস উইলিয়াম শেখ মুজিবের পক্ষে মামলার বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেন। তাঁকে সহায়তা দিয়েছিলেন আমীর-উল-ইসলাম ও মওদুদ আহমদ। অন্য আইনজীবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আতাউর রহমান খান, খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল, আমিনুল হক, খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন আহমেদ, মীর্জা গোলাম হাফিজ, বদরুল হায়দার চৌধুরী, জহিরুদ্দিন, মোল্লা জালালউদ্দিন, জুলমত আলী খান প্রমুখ। সরকারপক্ষের প্রধান আইনজীবী ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অ্যাটর্নি জেনারেল মঞ্জুর কাদের। তাঁর সহযোগী ছিলেন বাঙালি আইনজীবী টি এইচ খান।[২৩]

টমাস উইলিয়াম ঢাকায় এক সপ্তাহ ছিলেন। সরকার তাঁকে নানাভাবে হয়রানি করে। গোয়েন্দারা সব সময় তাঁকে অনুসরণ করত। এমনকি তাঁর ঘরে ঢুকে ব্যাগ খুলে কাগজপত্র তছনছ করা হয়। তিনি লন্ডনে ফিরে যান। *লন্ডন টাইমস*-এর সংবাদদাতা পিটার হ্যাজেলহার্স্ট টমাস উইলিয়ামের হয়রানি ও আগরতলা মামলা সম্পর্কে কয়েকটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন। এর ফলে বিদেশিরাও মামলা সম্পর্কে জানতে পারেন।[২৪]

মামলা চলাকালে ২৯ আগস্ট আকস্মিকভাবে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বিচারকক্ষে হাজির হন। তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আইনজীবীদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে বসেন। কাঠগড়ায় শেখ মুজিবকে দেখে তিনি দ্রুত তাঁর কাছে যান এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। গুঞ্জন শোনা যায়, ভুট্টো শেখ মুজিবের পক্ষে আইনি লড়াইয়ে নামবেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জাতীয় পরিষদের সদস্য গোলাম মোস্তফা খার। সরকারপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি মঞ্জুর কাদেরও ভুট্টোর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। একপর্যায়ে ভুট্টো কাঠগড়ার পাশে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে ১০ মিনিট কথা বলেন। তাঁরা পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে কথা বলছিলেন। এরপর ভুট্টো বিচারকক্ষ ছেড়ে চলে যান। তিনি শেখ মুজিব বা অন্য কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে ওকালতনামায় সই করেননি।[২৫]



ঢাকায় টমাস উইলিয়াম। সঙ্গে মীর্জা গোলাম হাফিজ, আমিনুল হক, মওদুদ আহমদসহ কয়েকজন আইনজীবী

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দেওয়া জবানবন্দি এবং আইনজীবীদের সওয়াল-জওয়াব পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল নিয়মিত। ফলে একদিকে অভিযোগের নানা অসংগতি ফুটে উঠছিল, অন্যদিকে মানুষ জানতে পারছিল, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য কী অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল।

মামলার ২ নম্বর অভিযুক্ত লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন যে জবানবন্দি দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর ওপর চালানো নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে। জবানবন্দিতে তিনি বলেন, এক গোপন মিশনে যাওয়ার কথা বলে তাঁকে ঢাকা থেকে রাওয়ালপিন্ডি নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি ১৯৬৭ সালের ৩ ডিসেম্বর সেখানে পৌঁছালে বিমানবন্দর থেকে সাদাপোশাকে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন তাঁকে সেনাসদরের জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে ছয় দফা কর্মসূচি সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত জানতে চাওয়া হয়। জবানবন্দিতে তিনি বলেন :

> আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আমি আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে চিনি কি না।...এরপর আমাকে পরামর্শ দেওয়া হলো যে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রদত্ত জবানবন্দিতে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাদের নির্দেশমতো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে আমাকে বলতে হবে যে আমি তাদের চিনি। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। তিনি আমাকে সামরিক বাহিনীতে কর্মরত এবং সাবেক লোকদের তাঁর পার্টির সমর্থনে সংগঠিত করতে বলেছিলেন। তাঁর নির্দেশে আমার নেতৃত্বে এই সংগঠন চলবে এবং এই সংগঠনের জন্য ভারত থেকে অর্থসাহায্য পাওয়া যাবে।
>
> রাত প্রায় চারটার সময় কর্নেলদ্বয় (কর্নেল হাসান ও কর্নেল আমীর) আমাকে দেখতে এলেন। তাঁরা আমাকে অফিসকক্ষে নিয়ে পুনরায় আলোচনা শুরু করলেন। সেদিন ছিল প্রথম রমজান। আলাপ-আলোচনার এ পর্যায়ে আমি সেহ্‌রির জন্য বললাম। আমাকে এই কথা বলা হলো যে বাঙালি মুসলমানদের জন্য রোজা রাখা বাধ্যতামূলক নয়। কারণ, তারা হিন্দুদের জারজ সন্তান। আমি প্রকৃতই মুসলমান কি না সে বিষয়ে তাঁদের নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন এবং তাঁদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমাকে জোর করে উলঙ্গ করা হলো। দুঘণ্টা ধরে এই জিজ্ঞাসাবাদ চলে এবং পুরো সময়টাই আমাকে হাঁটুতে ভর দিয়ে দুই হাত ওপরে তুলে থাকতে হয়েছে। আমার অবস্থার একটু নড়চড় হলেই তাঁরা কিল-চড়, লাথি-ঘুষি এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করছিলেন।...একদিন নির্যাতনের সময় তাঁরা আমাকে চেয়ারের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে চোখের সামনে অত্যুজ্জ্বল ফ্লাডলাইট জ্বালিয়ে দেন। আমি তাঁদের অনুরোধ করলাম নির্যাতনের এ পদ্ধতি বাদ দিতে। কারণ, আমার চোখে সমস্যা ছিল এবং ডাক্তারের পরামর্শ ছিল কড়া রোদে খালি চোখে না যাওয়ার। তাঁরা আমার অনুরোধ উপেক্ষা করলেন। উপরন্তু কর্নেল হাসান আমার চুলের মুঠি ধরে মাথা সোজা করে রাখেন, যাতে

আমার চোখে-মুখে পুরোপুরি লাইট পড়ে। আমি যখনই চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করেছি, তখনই তাঁরা আমার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছেন।...[২৬]

গোড়ার দিকে ট্রাইব্যুনালে ২২৭ জন সাক্ষীর তালিকা জমা দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত আড়াই শর বেশি সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়। নির্যাতনের ভয় ও অন্যান্য প্রলোভন দেখিয়ে এসব সাক্ষী দাঁড় করানো হয়। মামলার শুনানি চলার সময় একজন রাজসাক্ষী এবং তিনজন সরকারি সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করা হয়। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন কামালউদ্দিন আহমেদ। তিনি ছোটখাটো একটি ব্যবসা করতেন। তিনি ছিলেন অন্যতম অভিযুক্ত সুলতান উদ্দিন আহমদের বোনের স্বামী।

সাক্ষ্য নেওয়ার জন্য কামালউদ্দিনকে প্রচণ্ড রকম নির্যাতন করা হয়েছিল। তিনি সাক্ষ্য দিতে রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু ট্রাইব্যুনালে এসে তিনি নির্যাতনের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। এর ফলে জনমত বিরূপ হয়ে ওঠে। তাঁর জবানবন্দির কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো।

...জোর করে আমার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করল। ইন্সপেক্টর কে আহমদ আমায় বলল, 'ভারতের সঙ্গে যোগসাজশে তোমরা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে যারা জড়িত আছ সকলের নাম লিখে স্টেটমেন্ট করে দিচ্ছি, সই করে দিতে হবে।'

আমি বললাম, আমি এসবের কিছুই জানি না, আপনারা আমায় অযথা হয়রানি করছেন।

কাজ হাসিল হলো না দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল সে, আমাকে ঘাড় ধরে মাটিতে ফেলে দিল।

পরদিন আমাকে মিলিটারির হাতে তুলে দিল।...ওরা এক থেকে পাঁচ ডিগ্রি পর্যন্ত নির্যাতন চালাল আমার ওপর।

একদিন তো কানের কাছে এমন প্রচণ্ড চড় কষাল যে এখনো কানে ভালো শুনতে পাই না। কয়েকটি নখে সুঁই ঢুকিয়ে দিয়েছে কতবার, রুল দিয়ে মেরে মেরে আঙুল ভেঙে দিয়েছে। আঙুলগুলো আর নাড়তে পারছি না। এতেও ওদের নির্যাতন শেষ হলো না। আমাকে উলঙ্গ করে গুহ্যদ্বারে ব্যাটন ঢুকিয়ে জোর করে হাঁটিয়েছে। সে যে কী অসহ্য যন্ত্রণা কী বলব। কতবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছি।

আরেক দিন মাটিতে শুইয়ে হাত-পা বেঁধে উপুড় করে রুল দিয়ে গুহ্যদ্বারে কতগুলো বরফের টুকরা ঢুকিয়ে দিল। তারপর চলল জিজ্ঞাসাবাদ : বল তোদের নেতা কে? মুজিবুর রহমান? ইন্ডিয়ায় কার সাথে যোগসাজশ আছে? ঢাকায় ইন্ডিয়ান হাইকমিশনে কার সঙ্গে যোগাযোগ আছে? কোথায় কোথায় তোদের ঘাঁটি আছে, বল?

আমি জ্ঞান হারাতে হারাতে শুধু বলতে পেরেছি, আমি এসবের কিছুই জানি না।

> দিনের পর দিন ওরা নিত্যনতুন নির্যাতন চালিয়েছে। খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ছুরি দিয়ে শরীরের নানা স্থান কেটে কেটে কাটা জায়গায় নুন আর লঙ্কার গুঁড়া ছিটিয়ে দিয়েছে।...আরেকবার একজন সিপাই খুঁটির সঙ্গে বেঁধে শরীর থেকে কাপড় খুলে নিল। তারপর আমার পুরুষাঙ্গ ধরে প্রবলভাবে টানাহেঁচড়া করতে লাগল। অণ্ডকোষ দুই হাতে রগড়ে পিষে দিতে লাগল। অসহ্য যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার করে উঠলাম। মাথা ঘুরে গেল। চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরতেই দেখলাম স্যাঁতসেঁতে একটি মেঝেতে পড়ে রয়েছি।...
>
> ...একজন মিলিটারি অফিসার বলল, '...যদি স্টেটমেন্ট না দাও, তোমার স্ত্রী আর মেয়েদের এনে তোমার সামনে উলঙ্গ করে চাবুক দিয়ে শরীর কেটে কেটে লঙ্কা-নুন ছিটিয়ে দেব। তোমার রূপসী স্ত্রীকে তোমার চোখের সামনে ন্যাংটা করে সাধারণ সেনাদের লেলিয়ে দেব তাকে ধর্ষণ করার জন্য।...' তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, না, না, ওদের কিছু করবেন না, আমি স্টেটমেন্ট দেব।...
>
> ১৫ ডিসেম্বর ওরা আমাকে দিয়ে একটি দলিলে সই করিয়ে নিল।[২৭]

ট্রাইব্যুনালে শেখ মুজিব তাঁর জবানবন্দিতে কথিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগ অস্বীকার করে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে তাঁর আপসহীন লড়াইয়ের জন্যই তাঁকে এ মামলায় জড়ানো হয়েছে। তাঁর জবানবন্দির কিছু অংশ ছিল এ রকম :

> আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল—দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচি রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম—ছয় দফা কর্মসূচিতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে। দেশের জন্য আমি যা মঙ্গলকর ভাবিয়াছি, আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডির ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে এবং আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর শোষণ ও নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখিতে চায়।[২৮]

মামলার বিস্তারিত বিবরণ, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জবানবন্দি, সাক্ষীদের জেরা, কৌসুলি, অভিযুক্ত ও সাক্ষীদের মধ্যে সওয়াল-জবাব, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ওপর নির্যাতনের বিবরণ ইত্যাদি পত্রিকায় বিস্তারিতভাবে ছাপা হতে থাকে। ধীরে ধীরে জনমত সরকারের বিরুদ্ধে চলে যায়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ মানুষের সহানুভূতি ও সমর্থন বাড়তে থাকে। একপর্যায়ে শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন জাতীয় বীর। পুরো মামলাই সরকারের জন্য বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়।

শেখ মুজিব মওলানা ভাসানীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। মামলার কার্যবিবরণী সংগ্রহের জন্য অনেক সাংবাদিক ট্রাইব্যুনাল কক্ষে উপস্থিত থাকতেন। তাঁদের একজনের মাধ্যমে মুজিব ভাসানীকে আন্দোলন তৈরি করার অনুরোধ জানান। ভাসানী রাজনীতিতে ভিন্নমত পোষণ করলেও শেখ মুজিবের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল। তাঁদের সম্পর্ক ছিল অনেকটা গুরু-শিষ্য কিংবা পিতা-পুত্রের মতো। খবর পেয়েই ভাসানী বলে ওঠেন, 'শেখ মুজিব বলেছে, আমাকে যেতে হবে। সরকার এদের সবাইকে ফাঁসি দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে।'[২৯]

ভাসানী ১৯৬৮ সালের ৬ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে জনসভা করেন। তিনি মামলা বাতিল করে শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি করেন এবং ১২ ডিসেম্বর হরতাল ডাকেন। তাঁর দলের অন্যতম নেতা ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহা হরতালের বিরোধিতা করেন। সভা শেষ করে ভাসানী যখন মিছিল নিয়ে গভর্নর হাউসের সামনে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তখন পুলিশের বাধার মধ্যে পড়েন। পুলিশের সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। তিনি তখনই ঘোষণা দেন, 'আগামীকাল ৭ ডিসেম্বর হরতাল।' ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় সম্পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সঙ্গে পিকেটারদের বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়। সকাল ১০টার দিকে স্টেডিয়ামের গেটের কাছে মোটরসাইকেলে মোহাম্মদ তোয়াহাকে দেখা গেলে পিকেটাররা তাঁকে ধাওয়া করে। তিনি দ্রুত সরে পড়েন। বেলা ১১টায় পুলিশ নীলক্ষেতে জনতার ওপর গুলি চালায়। গুলিতে পাক ইলেকট্রিক শপের ম্যানেজার আবদুল মজিদ ও কর্মচারী আবদুল হক আহত হন। হাসপাতালে নেওয়ার পর মজিদের মৃত্যু হয়। বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে গুলিস্তান এলাকায় পুলিশের গুলিতে এক বালক ঘটনাস্থলেই নিহত এবং আরও তিনজন গুরুতরভাবে আহত হয়। বেলা ১টা ১৫ মিনিটে সচিবালয়ের দ্বিতীয় গেটের কাছে বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে সোহেল আহমদ নামে একজন আহত হন। বিকেল পাঁচটায় নবাবপুর রেলক্রসিংয়ের কাছে জনতার ওপর পুলিশ আবারও গুলি ছুড়লে আবদুস সাত্তার নামে এক ব্যক্তি আহত হন। সারা দিনে পুলিশের গুলিতে তিনজন নিহত এবং ৩০ জন আহত হন, গ্রেপ্তার করা হয় তিন শর বেশি মানুষকে।[৩০]

হতাহতের প্রতিবাদে পরদিন ৮ ডিসেম্বর প্রদেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। পরপর দুদিনের হরতালে জীবনযাত্রা প্রায় অচল হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক মোড় পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে সারা দেশে।

১৩ ডিসেম্বর প্রদেশব্যাপী আবারও হরতাল পালিত হয়। ওই দিন চট্টগ্রামে এক মিছিলে পুলিশের গুলিতে ১২ জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের একজন পরদিন মারা যান। ১৭ ডিসেম্বর সম্মিলিত বিরোধী দলের এক কর্মিসভা অনুষ্ঠিত

হয়। ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি আটটি রাজনৈতিক দল মিলে আট দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (ডাক) গঠন করে। ডাকের সদস্যরা ছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, জামিয়াতুল উলেমা-ই-ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পিডিএমপন্থী পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), নেজামে ইসলাম, জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও জামায়াতে ইসলামী। ওই দিন সন্ধ্যায় শেখ মুজিবের বাসভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ডাকের ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়।

১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে গণ-আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়। এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে। একাধিক ছাত্রসংগঠনকে নিয়ে একই কর্মসূচির ভিত্তিতে একসঙ্গে কাজ করার প্রক্রিয়াটি শুরু করা সহজ ছিল না। বিশেষ করে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতা গড়ে তুলতে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক মোহাম্মদ ফরহাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় তিনি ছাত্র ইউনিয়নকে কৌশলগত পরামর্শ দিতেন এবং ছাত্রলীগের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে উৎসাহিত করতেন। ষাটের দশকজুড়ে তিনি ছাত্র আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। ছাত্রলীগের সাবেক নেতা সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল।[৩১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর ১ জানুয়ারি পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস ছোড়ার প্রতিবাদে ২ জানুয়ারি প্রতিবাদ সভা আহ্বান করা হয়েছিল। ইকবাল হলের ছাত্র সংসদ কার্যালয়ে ২ জানুয়ারি থেকে পরপর তিন দিন ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ও ডাকসু নেতাদের সভা হয়। একপর্যায়ে ওই সভায় জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের (এনএসএফ) কয়েকজন নেতাও যুক্ত হন। প্রতিটি ছাত্রসংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং ডাকসুর সহসভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে নিয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। কর্মসূচি তৈরির জন্য আলোচনা শুরু হলে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ছয় দফা শব্দটি উল্লেখ করার ব্যাপারে আপত্তি জানায়। এই পরিস্থিতিতে ছয় দফা উল্লেখ না করে ছয় দফার দাবিগুলো ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ হিসেবে সংযুক্ত করার প্রস্তাব দিলে ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার সম্মতি দেন। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিলসংক্রান্ত বিষয়ে ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুর রউফ আপত্তি জানালে 'এক ইউনিট বাতিল' শব্দগুলো বাদ দিয়ে বেলুচ, পাঠান, সিন্ধি ও পাঞ্জাবিদের স্বায়ত্তশাসন দিয়ে একটা সাব-ফেডারেশন করার কথা লেখা হয়। অনেক আলোচনার পর বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে এভাবেই এগারো দফা কর্মসূচি তৈরি হয়।[৩২]

এগারো দফা কর্মসূচি যখন প্রথম প্রকাশ করা হয়, তখন এর সঙ্গে ছয়জন ছাত্রনেতার নাম যুক্ত ছিল। তাঁরা হলেন ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) সভাপতি সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক ও সাধারণ সম্পাদক সামসুদ্দোহা, ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুর রউফ ও সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী এবং ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার ও প্রচার সম্পাদক নুর মোহাম্মদ খান। এগারো দফার মধ্যে স্পষ্টভাবে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'সহ সব মামলা প্রত্যাহারের দাবিটিকে সংযোজনের জন্য ছাত্রলীগ প্রস্তাব করে। একই সাথে ডাকসু ও এনএসএফকে অন্তর্ভুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের বিষয়ে ৮ জানুয়ারি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ ছাড়া ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) নুর মোহাম্মদ খানের পরিবর্তে সহসম্পাদক দীপা দত্তের নাম অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। ডাকসুর সহসভাপতি তোফায়েল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান চৌধুরীর নাম যোগ করে কর্মসূচিটি ছাপিয়ে বিতরণ করার সিদ্ধান্ত হয়। ১০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় অনুষ্ঠিত এক সাধারণ ছাত্রসভায় ছাপানো এগারো দফা কর্মসূচি বিতরণ করা হয়। তোফায়েল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই সভায় সমবেত ছাত্রছাত্রীরা হাত তুলে এ কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানান। ওই সভায় এনএসএফের সাবেক নেতা মাহবুবুল হক দোলনও বক্তৃতা করেন।[৩৩]

ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল্লাহর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকায় তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। এ জন্য এগারো দফা কর্মসূচিতে তাঁর স্বাক্ষর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। পরে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জনসভাগুলোয় তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন এবং বক্তৃতা করতেন।[৩৪]

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কোনো আহ্বায়ক ছিলেন না।[৩৫] সচরাচর চার সংগঠনের পক্ষ থেকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করতেন। ডাকসুর সহসভাপতি হিসেবে তোফায়েল আহমেদ সভায় সভাপতিত্ব করতেন। সভা শেষে ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান চৌধুরী সভার প্রস্তাব পাঠ করতেন।

পালাবদল

আইয়ুব খান বড় ধরনের কোনো উপদ্রব ছাড়াই দেশ শাসন করে যাচ্ছিলেন। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়। মাস দেড়েক তাঁকে চিকিৎসা নিতে হয়। এ সময় তিনি অফিস করেননি। তখন তাঁকে জড়িয়ে নানা রকম গুজব ছিল। আইয়ুবের পরিবারের সদস্যরা খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন। একসময় এ রকমও মনে করা হচ্ছিল, আইয়ুব খান আর বাঁচবেন না। তিনি তাঁর মেজ ছেলে গওহর আইয়ুবকে উত্তরাধিকারী হিসেবে তৈরি করছিলেন। আইয়ুবের পরিকল্পনা ছিল, যদি কোনো অঘটন ঘটেই যায়, পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর ও সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) মুসা অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হবেন এবং ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন দেবেন। নির্বাচনে গওহর প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াবেন এবং তাঁকে জয়ী করা হবে। এ পরিকল্পনার কথা জেনে মুসা খুব নার্ভাস হয়ে পড়েন। এই ঝুঁকি নেওয়ার মতো সাহস তাঁর ছিল না।[১]

নভেম্বর থেকে সারা দেশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ১১ নভেম্বর (১৯৬৮) পেশোয়ারের জিন্নাহ পার্কে এক জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় এক তরুণ পাঠান আইয়ুবকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও আন্দোলন মোকাবিলা করার মতো শক্ত অবস্থান তখন তাঁর দল মুসলিম লীগের ছিল না। সেনাপ্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে ডেকে আইয়ুব তাঁকে (আইয়ুবকে) প্রধান রেখে সামরিক আইন জারি করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে বলেন। ইয়াহিয়া অবশ্য তাৎক্ষণিক জবাবে বলেছিলেন, সশস্ত্র বাহিনী সব শক্তি দিয়ে প্রেসিডেন্টের পাশে দাঁড়াবে। এর পর থেকে প্রায় সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া সেনাবাহিনীর জজ অ্যাডভোকেট জেনারেল ব্রিগেডিয়ার কাজীকে নিয়ে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে যেতেন এবং রুদ্ধদ্বার সভা করতেন। সপ্তাহে তিন দিন অন্তত দুই ঘণ্টা তাঁরা সলাপরামর্শ করতেন। একদিন সন্ধ্যায় কাজী একা এলেন এবং ইয়াহিয়ার পক্ষ থেকে কয়েকটি প্রস্তাব দিলেন :

১) সংবিধান বাতিল করে প্রেসিডেন্ট সামরিক আইন জারি করবেন;
২) রাষ্ট্রপতির আদেশবলে ইয়াহিয়া খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হবে;
৩) আইয়ুব দীর্ঘমেয়াদি ছুটিতে যাবেন, যত দিন না দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে।[২]

ইয়াহিয়ার মতলব বুঝতে আইয়ুব খানের এতটুকু অসুবিধা হলো না। ১৯৫৮ সালের অভিজ্ঞতা তাঁর মনে আছে। তখন ইস্কান্দার মির্জা তাঁকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন এবং ২০ দিনের মাথায় আইয়ুব মির্জাকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। আইয়ুব খান বিকল্প চিন্তা শুরু করলেন। তিনি তিনটি সম্ভাব্য পদক্ষেপের কথা ভাবলেন :

১) ইয়াহিয়া খানকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া এবং একই সঙ্গে তাঁর সহযোগী আরও কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে অবসরে পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু এ সময় এটি করা ঠিক হবে না। এতে করে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে এবং প্রেসিডেন্টের দুর্বলতা ধরা পড়ে যেতে পারে।
২) শক্তিশালী রাজনৈতিক একটি দলের সঙ্গে সমঝোতায় আসা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোন দলের সঙ্গে?
৩) ইয়াহিয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া।[৩]

আইয়ুব খান তাঁর পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন সদস্য এবং তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত তথ্যসচিব আলতাফ গওহরের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কার্যকর সমঝোতায় আসার পক্ষে তাঁরা মত দেন। এ রকম দল বলতে তখন মাত্র দুটো—ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ। দুজনই তখন কারাগারে বন্দী। ভুট্টোর ব্যাপারে আইয়ুব খানের ছিল প্রচণ্ড রকম আপত্তি। 'রাষ্ট্রবিরোধী' কার্যকলাপ সত্ত্বেও মুজিবকেই তাঁর পছন্দ হলো। তাঁর মনে হলো, এ পরিকল্পনায় মুজিবকে হয়তো পাওয়া যাবে। রাষ্ট্রপতির এডিসি আরশাদ সামি খান অত্যন্ত কাছ থেকে এ রাজনৈতিক নাটকটি মঞ্চস্থ হতে দেখেছেন। তিনি বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

> প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নিলেন, কারাগারে শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে জানানো দরকার। তিনি আলতাফ গওহরকে শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন। আমি নিজে দেখেছি, বেশ কয়েকবার রাতের বেলা মুজিব ছদ্মবেশে আলতাফ গওহরের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট হাউজে এসেছেন। প্রতিবার তাঁরা তিনজন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাবার্তা বলতেন। মুজিবের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের এ গোপন বৈঠকের খবর কেমন করে জানি বিরোধী পক্ষের কাছে ফাঁস হয়ে যায়।[৪]

আইয়ুব খান ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে এবং ফেব্রুয়ারির (১৯৬৯) দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢাকায় এসেছিলেন। সম্ভবত ওই সময় গোপন বৈঠকগুলো হয়েছিল। যখন এ বৈঠকগুলো চলছিল, তখন ঢাকা ছিল উত্তপ্ত। মওলানা ভাসানী ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকে হরতাল পালিত হচ্ছিল। আলতাফ গওহর অবশ্য এ বৈঠকের বিষয়টি স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন, ১৯৬৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারির আগে আইয়ুবের সঙ্গে শেখ মুজিবের কখনো দেখা হয়নি।[৫]

তত দিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতি টালমাটাল হয়ে পড়েছে। জানুয়ারির (১৯৬৯) দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই এগারো দফা আন্দোলন তীব্রতর হচ্ছিল। ১৮ জানুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট শুরু হয়। প্রতিদিনই সভা-মিছিল চলছিল। ধর্মঘটের তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ২০ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রদের মিছিলে পুলিশ গুলি করলে আসাদুজ্জামান নামে ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন) একজন সদস্য নিহত হন। আসাদ একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র এবং শহীদুল্লাহ হল শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। এমএ পাস করে তিনি সেন্ট্রাল ল কলেজে আইন পড়তেন। নরসিংদী এলাকার শিবপুর থানার ধানুয়া গ্রামে তাঁর বাড়ি। তাঁর বাবা মাওলানা আবু তাহের শিবপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি ১৯৫৪ সালে নেজামে ইসলাম থেকে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। পরিবারটি ছিল খুবই গোঁড়া। কিন্তু আসাদ ছিলেন এর উল্টো। বাবার চাপে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে আসমাতুন্নেসা হাইস্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিয়েছিলেন। স্কুলে যোগ দিয়েই তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং মিছিলে অংশ নেন।[৬]

আসাদের মৃত্যু এগারো দফা আন্দোলনকে বেগবান করে তোলে। ২১ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে তাঁর জানাজা হয়। মিটিং-মিছিল-বিক্ষোভ চলছিল প্রতিদিন। ২৪ জানুয়ারি গণবিস্ফোরণ ঘটল। ২৫ জানুয়ারি ঢাকার দৈনিক *আজাদ* আট কলাম ব্যানার হেডিং ছাপল 'ঢাকায় ২৪ ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য আইন জারি, সেনাবাহিনী তলব'। রিপোর্টের অংশবিশেষ ছিল এ রকম :

> ৫ লক্ষ লোকের সমাবেশে পুলিশের গুলিবর্ষণে অন্ততপক্ষে চারজন নিহত ও বহু আহত। হারিশ ও শহীদুল নামক দুইজন পুলিশের গুলিতে নিহত হইবার পর পুলিশ লাশ লইয়া গিয়াছে বলিয়া দাবি করা হইয়াছে। এ দুইজনকে ধরিলে গুলিতে নিহতের সংখ্যা ছয়জনে দাঁড়ায়। সেক্রেটারিয়েটের ১ নম্বর গেটের নিকট গুলিতে ১. মতিউর রহমান, ১৭ বছর; ২. শেখ রোস্তম আলী, ১৪ বছর; ৩. মকবুল, ১৫ বছর এবং অপর একজন নিহত হয়। চতুর্থ ব্যক্তির লাশ পুলিশ রাস্তা হইতে টানিয়া সেক্রেটারিয়েট ভবনের অভ্যন্তরে লইয়া যায় এবং তাহার খোঁজ পাওয়া যায় নাই। বিক্ষুব্ধ জনতা অপরাহ্নে ট্রাস্টের সরকার সমর্থক

ইংরাজি দৈনিক *মর্নিং নিউজ* ও বাংলা *দৈনিক পাকিস্তান* অফিসে অগ্নিসংযোগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে পোড়াইয়া দিয়াছে। তাহা ছাড়া *পয়গাম* পত্রিকা অফিসেও জনতা আক্রমণ করে এবং অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালায়। পল্টনে মুসলিম লীগ নেতা এন এ লস্করের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।[৭]

পল্টন ময়দানে জানাজা শেষ হওয়ার পর লাশ নিয়ে এক বিরাট মিছিল বের হয়। মিছিলটি ইকবাল হলে পৌঁছালে এক অনির্ধারিত প্রতিবাদ সভায় সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমেদ, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক ও মাহবুব উল্লাহ বক্তৃতা করেন। সিরাজুল আলম খানের বক্তব্য ছিল খুবই মর্মস্পর্শী। ছাত্র-জনতা তা বিহ্বল হয়ে শুনছিল। সভার পরই জানা গেল, বিক্ষুব্ধ জনতা নবাবপুর রোডে 'হোটেল আরজু'তে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কারণ, ওই হোটেলের মালিক 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র শুনানির সময় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।[৮]

সন্ধ্যায় কারফিউ জারি করা হয়। রাতে কারফিউ ভেঙে জনতা বিভিন্ন স্থানে মিছিল করে। ২৫ জানুয়ারি কারফিউ থাকা অবস্থায় ইপিআরের গুলিতে নাখালপাড়ায় আনোয়ারা নামের এক গৃহবধূ নিহত হন। তিনি এ সময় তাঁর শিশুসন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিলেন।[৯]

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নেতা সবুর খান ৩১ জানুয়ারি (১৯৬৯) জাতীয় পরিষদে ঘোষণা দেন যে বিরোধী দলের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব একটা গোলটেবিল বৈঠক ডাকবেন।[১০] ১ ফেব্রুয়ারি এক আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় আইয়ুব খান বলেন, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে কোনো সমাধান এলে তা মেনে নেওয়া হবে।[১১]

৫ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) আইয়ুব খান ডাক-এর আহ্বায়ক নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানকে প্রস্তাব দেন, সব রাজনৈতিক নেতাকে নিয়ে ১৭ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠক হবে। এরপর আইয়ুব খান ঢাকা সফরে আসেন এবং ঘোষণা দেন, প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেওয়ার জন্য বিরোধী দলগুলো যদি শেখ মুজিব ও ভুট্টোকে মনোনীত করে, তাহলে তাঁদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ১২ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান রাওয়ালপিন্ডিতে ফিরে যান।[১২]

ইতিমধ্যে আইয়ুব খানের প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন ভুট্টো ও ভাসানী। অন্যান্য রাজনৈতিক দল ওই বৈঠকে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। ৯ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে ডাক-এর উদ্যোগে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা নুরুল আমিনের এ সভায় সভাপতিত্ব করার কথা। ছাত্রলীগের একদল কর্মী পল্টনে হাজির হয়ে

ঘোষণা করেন, নুরুল আমিনকে সভাপতিত্ব করতে দেওয়া হবে না। তাঁরা খন্দকার মোশতাক আহমদকে সভাপতিত্ব করার অনুরোধ জানান। মোশতাক এতে রাজি হলেন না। এ সময় ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক আ স ম আবদুর রবের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতার একটি মিছিল মাঠে এসে উপস্থিত হলো। রব স্টেজে চড়াও হয়ে মাইক কেড়ে নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন, 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই, এগারো দফার সঙ্গে বেইমানি করা চলবে না' ইত্যাদি। ছাত্রলীগের কর্মীরা মঞ্চ দখল করে নেন। ডাক-এর জনসভা ভণ্ডুল হয়ে যায়।[১৩]

৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) দৈনিক *ইত্তেফাক*-এর ছাপাখানা নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। ১২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ জেল থেকে মুক্তি পান। এগারো দফার সমর্থনে এবং সরকারের নির্যাতনের প্রতিবাদে জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের সাতজন সদস্য পদত্যাগ করেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি সরকার ঘোষণা করে, ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে জরুরি আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ শুরুর দিন জরুরি আইন জারি করা হয়েছিল। ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা সেনানিবাসে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যা গণ-আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে।

১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে মোহাম্মদপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের ছাত্র কামালউদ্দিন আহমেদ রান্না করা দুই হাঁড়ি হরিণের মাংস নিয়ে এসেছেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। সিগন্যাল অফিসার্স মেসে বন্দী আছেন শেখ মুজিবসহ কয়েকজন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা। দূরে আরেকটি ব্যারাকে কয়েকটি কক্ষে আছেন বাকি সবাই। তাঁরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত। কামাল আগেও অনেকবার এখানে এসেছেন। তাঁর বড় ভাই নৌবাহিনীর সাবেক লিডিং সি-ম্যান সুলতান উদ্দিন আহমদ এ মামলার অন্যতম অভিযুক্ত। তাঁর বড় বোনের স্বামী এ মামলার সরকারপক্ষের একজন সাক্ষী। তাঁকে ইতিমধ্যে বৈরী ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর নামও কামালউদ্দিন আহমেদ। তখন তিনি মুক্ত।[১৪]

গেটে পৌঁছে কামাল দেখলেন পরিস্থিতি কেমন যেন গুমোট, অন্যান্য দিনের মতো নয়। অবাঙালি সেন্ট্রি তাঁকে ঢুকতে দিচ্ছে না, কিছু বলছেও না। একটু পরে একজন দীর্ঘকায় লোক এক হাতে একটি সাইকেল এবং অন্য হাতে অনেক কাপড়চোপড় নিয়ে গেটের কাছে এলেন। তিনি পরিচয় দিয়ে বললেন যে তিনি লন্ড্রিম্যান। সকালে গোলাগুলি হয়েছে, দুজন বন্দীর গায়ে গুলি লেগেছে। কামাল তাঁর বড় ভাইয়ের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হলেন। লন্ড্রিম্যান বললেন, যে দুজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, তাঁরা বিমানবাহিনীর সার্জেন্ট। একজন ইতিমধ্যে মারা গেছেন। কে মারা গেছেন জানতে চাইলে লন্ড্রিম্যান উত্তর দিলেন, তাঁদের মধ্যে যিনি বেশি

শিক্ষিত তিনি নিহত হয়েছেন। মাংস রাখা যাবে না, কেননা গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে সবাই অনশন করছেন।

কামাল মাংসের হাঁড়ি নিয়ে বাসায় ফিরে যান। দুলাভাইয়ের কাছে পুরো ঘটনার বর্ণনা দিলে তিনি বললেন, বেশি শিক্ষিত ব্যক্তিটি মারা গিয়ে থাকলে এ নির্ঘাত ফজলু। অর্থাৎ সার্জেন্ট জহুরুল হক ও সার্জেন্ট ফজলুল হক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, তবে ফজলুল হক মারা গেছেন। এ সংবাদ নিয়ে কামাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের ক্যানটিনে এলেন। সেখানে সিরাজুল আলম খানসহ অনেকেই ছিলেন। কামাল সবকিছু খুলে বললেন। ইতিমধ্যে রাত হয়ে গেছে। ছাত্রলীগের নেতা মোদাচ্ছের আলী 'সার্জেন্ট ফজলুল হকের রক্ত—বৃথা যেতে দেব না' স্লোগান দিতে দিতে কয়েকজনকে নিয়ে একটি মিছিল বের করলেন। তোফায়েল আহমেদ কামালকে বকাঝকা করে বললেন, এ রকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। ঘটলে রেডিওতে বলত। সিরাজুল আলম খান চুপচাপ বসে দাঁত দিয়ে আঙুলের নখ কাটতে থাকলেন। পরদিন সকালে রেডিওর সংবাদে জানা গেল, পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় রক্ষীদের গুলিতে সার্জেন্ট জহুরুল হক নিহত এবং সার্জেন্ট ফজলুল হক আহত হয়েছেন।[১৫]

রেডিওতে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা হয়েছিল। তাঁরা দুজন মোটেও পালানোর চেষ্টা করেননি। স্টুয়ার্ড মুজিব ও সুলতানউদ্দিন আহমদ ব্যারাকের একটি কক্ষে থাকতেন। তাঁরা প্রায়ই বাইরে একসঙ্গে পায়চারি করতেন। তো একদিন তাঁদের সঙ্গে অবাঙালি রক্ষীদের কথা-কাটাকাটি হয়। রক্ষীরা বাঙালির জাত তুলে গালাগাল করছিল। স্টুয়ার্ড মুজিব ছিলেন বিশালদেহী, গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। তিনি রাগ সামলাতে না পেরে একজন রক্ষীকে দুই হাতে তুলে আছাড় দেন। এতে রক্ষীরা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে যে তারা দেখে নেবে। তাদের চোখ-মুখের ভাষা বুঝতে স্টুয়ার্ড মুজিব আর সুলতান উদ্দিনের এতটুকু অসুবিধা হয়নি। তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন, একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। ব্যারাকে ফিরে এসে তাঁরা পাশের কক্ষের বন্দীদের সতর্ক করে দেন, পাশের কক্ষের বন্দীরা তাঁদের পরবর্তী কক্ষের বন্দীদের একইভাবে সাবধান করে দেন। এভাবেই সতর্কবার্তা দেওয়া চলতে থাকে। সব শেষের কক্ষে থাকতেন দুই সার্জেন্ট। ভুলক্রমে তাঁদের কক্ষে সতর্কবার্তা পৌঁছানো হয়নি। পরদিন সকালে টয়লেটে যাওয়ার জন্য কেউ আর বাইরে এলেন না। ব্যতিক্রম শুধু দুই সার্জেন্ট। তাঁরা বেরোতেই রক্ষীরা তাঁদের ওপর গুলি করে। ফজলুল হক মড়ার মতো পড়ে থাকেন। জহুরুল হক গুলি খেয়ে আহত বাঘের মতো গর্জন করতে থাকলেন। তাঁকে পরপর কয়েকটি গুলি করা হয়। মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য বেয়নেট দিয়ে তাঁর শরীর খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করা হয়। গোলাগুলি শুনে অনেকেই দৌড়ে আসেন। দুজনকেই সম্মিলিত সামরিক

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জহুরুল হক আগেই মারা গিয়েছিলেন। সার্জেন্ট ফজলুল হকের দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়। তিনি বেঁচে যান।[১৬]

কর্তৃপক্ষ রাত তিনটার দিকে জহুরুল হকের লাশ তাঁর ভাই অ্যাডভোকেট আমিনুল হকের এলিফ্যান্ট রোডের চিত্রা ভবনে দিয়ে যায়। সকাল নয়টার মধ্যে ছাত্রলীগের অনেক কর্মী ওই বাসার সামনে জড়ো হন। লাশ নিয়ে তাঁরা মিছিল করে পল্টন ময়দানে হাজির হন। বায়তুল মোকাররম মসজিদের ইমাম সাহেবকে অনুরোধ করা হলো জানাজা পড়ানোর জন্য। ইমাম সাহেব জানালেন, আসরের নামাজের ঠিক আগে জানাজা হবে। বেলা তিনটার মধ্যে পল্টন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। ইতিমধ্যে মওলানা ভাসানী এসে উপস্থিত হন। তিনি এসেই জানাজায় ইমামতি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁকে বলা হলো, বায়তুল মোকাররম মসজিদের ইমামের সঙ্গে কথা হয়েছে, তিনি ইমামতি করবেন। ভাসানী ইমাম সাহেবের পাশে দাঁড়ালেন। জানাজা সম্পন্ন হলো। লাশ নিয়ে মিছিলসহকারে সবাই আজিমপুর গোরস্তানের দিকে হাঁটছেন। মিছিল থেকে কয়েকজন আবদুল গণি রোডে প্রাদেশিক মন্ত্রী সুলতান আহমেদের বাসা থেকে ফুল তুলে আনতে দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়ে। মন্ত্রীর এক মেয়ে তাদের বাসায় আক্রমণ করা হয়েছে এই ভেবে বন্দুক দিয়ে গুলি ছুড়তে শুরু করে। জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উল্টো দিকে অবস্থিত প্রাদেশিক মন্ত্রী অংশু প্রু চৌধুরীর বাসায় আক্রমণ চালায়। মিছিল থেকে কয়েকজন পুরানা পল্টন এলাকায় মুসলিম লীগের এক নেতার মালিকানাধীন পেট্রল পাম্পে আগুন ধরিয়ে দেয়। কাকরাইলের যে অতিথি ভবনে আগরতলা মামলার ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান থাকতেন, তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আরেক দল মিছিলকারী রেসকোর্স মাঠের হাউজি প্যান্ডেলে আগুন দেয়। শাহবাগে প্রাদেশিক মন্ত্রী খাজা হাসান আসকারির বাসায়ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। আরেকটি দল পরীবাগে অবস্থিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীনের বাসভবনে আগুন দেয়। সন্ধ্যাবেলা সার্জেন্ট জহুরুল হকের দাফন সম্পন্ন হয়। রাত ১০টায় কারফিউ জারি করা হয়।[১৭]

শেখ মুজিব ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি আইয়ুবের ডাকা গোলটেবিল বৈঠকে যাবেন। তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাকসহ একটি অগ্রবর্তী দল ইতিমধ্যে রাওয়ালপিন্ডি চলে গেছে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য তাঁর জামিনের ব্যবস্থা করা। যে অর্ডিন্যান্সের অধীনে আগরতলা মামলার বিচার চলছিল, তাতে জামিনের কোনো সুযোগ ছিল না। তখন একটি উপায় বের হলো, মুজিব প্যারোলে মুক্ত হয়ে বৈঠকে যোগ দেবেন। মুজিব রাজি হলেন। তিনি ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামকে প্যারোলের আবেদন করতে নির্দেশ দেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি প্যারোল

বিষয়ে ট্রাইব্যুনালে শুনানি হওয়ার কথা ছিল।[১৮] এই প্যারোল নিয়ে রীতিমতো একটি নাটক হয়। যুবনেতা সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাক বেগম মুজিবের কাছে ধরনা দেন, যেভাবেই হোক 'নেতার' প্যারোলে বের হওয়া ঠেকাতে হবে; কারণ মানুষ এটিকে একটি আপস হিসেবে দেখবে এবং নেতার 'ইমেজ' তাতে নষ্ট হবে।[১৯] মামলার অন্যতম অভিযুক্ত লে. আবদুর রউফ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

> ...শুনলাম, তিনি প্যারোলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আরও শুনলাম যে তিনি এই সিদ্ধান্তের কথা ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন। শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সামনের রাস্তায় একটি গাড়ি এসে দাঁড়াতে দেখলাম। গাড়ি থেকে নেমে এলেন বেগম মুজিব। শেখ মুজিব উঠে গেলেন এবং তাঁকে ভেতরে আসতে বললেন। কিন্তু বেগম মুজিব ভেতরে না এসে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'শুনলাম তুমি নাকি প্যারোলে যাচ্ছ। যদি তাই যাও, তাহলে আমিই তোমার বিরুদ্ধে মিছিল করব। আর সেই মিছিলে তোমার পুত্র-কন্যারাও থাকবে।' এ কথা বলেই বেগম মুজিব দ্রুত গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। এ ঘটনার পর শেখ মুজিব আরও বিপন্নবোধ করতে লাগলেন। মনে হলো তিনি যেন আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। পরদিন সকালে রেডিওর খবরে বলা হলো, মুজিব প্যারোলে মুক্তি নিয়ে গোলটেবিলে যোগ দিতে যাচ্ছেন। এ খবর শুনেই তিনি চিৎকার করে রুম থেকে বের হয়ে বললেন, 'ডাকো তাদের...জিওসিকে খবর দাও। আমাকে জিজ্ঞেস না করে রেডিওতে নিউজ দিল কেন?' সম্ভবত বেগম মুজিব চলে যাওয়ার পরই শেখ মুজিব প্যারোলে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।[২০]

একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে আইয়ুব খান ঘোষণা করলেন, তিনি পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। ২২ ফেব্রুয়ারি এক ঘোষণায় আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয়। সব অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হয়। ঢাকায় অবস্থিত সেনাবাহিনীর চতুর্দশ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মোজাফফর উদ্দিনের নির্দেশে ব্রিগেডিয়ার রাও ফরমান আলী (পরে মেজর জেনারেল) ঢাকা সেনানিবাসের বন্দিশালা থেকে শেখ মুজিবকে নিজে গাড়ি চালিয়ে ধানমন্ডির বাসায় পৌঁছে দেন।[২১]

ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কাছে প্রস্তাব আসে শেখ মুজিবকে গণসংবর্ধনা দেওয়ার। ঠিক হয়, রেসকোর্সে (পরে নাম হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভার আয়োজন করা হবে। কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে সব রাজবন্দী মুক্তি পেলে ছাত্র ইউনিয়ন দাবি করে যে পরদিন রেসকোর্সে সবাইকে একযোগে সংবর্ধনা দেওয়া হোক। ছাত্রলীগ এতে রাজি হয়নি। তাদের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়, যেহেতু শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে বলে



জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর পল্টন ময়দানে আয়োজিত তাৎক্ষণিক এক সংবর্ধনা সভায় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র অন্যতম অভিযুক্ত লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, লিডিং সি-ম্যান সুলতান উদ্দিন, এ বি এম খুরশিদ ও শামসুর রহমান খান সিএসপি

ইতিমধ্যে ঘোষণা দেওয়া হয়ে গেছে, তাই এটি শুধু শেখ মুজিবেরই সংবর্ধনা হবে। পরে মণি সিংহসহ অন্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রলীগের এই 'সংকীর্ণতা' সহ্য করতে রাজি ছিল না। ফলে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। এ অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে বলা হয়, যেন ছাত্রলীগের প্রস্তাব মেনে নিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঐক্য রক্ষা করা হয় এবং সংবর্ধনা সভায় শেখ মুজিবকে দিয়ে সুস্পষ্টভাবে এগারো দফা সমর্থন করিয়ে নেওয়া হয়। ফলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঐক্য রক্ষা পায়। কিন্তু সংকীর্ণতা কেবল ছাত্রলীগের নয়। প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিব একাই ওই জনসভায় ভাষণ দিতে চাচ্ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে এই সভা থেকে 'আমি জনগণের ম্যান্ডেট লইয়া গোলটেবিল বৈঠকে যাইতে চাই'।[২২]

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) সাধারণ সম্পাদক সামসুদ্দোহা এ নিয়ে এতটাই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে তিনি ওই সভায় যেতে অস্বীকার করেন। সামসুদ্দোহার বর্ণনামতে, ২২ ফেব্রুয়ারি রাতে ইকবাল হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরীর অফিসকক্ষে সংগ্রাম পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত হয় শেখ মুজিব একাই ভাষণ দেবেন এবং মণি সিংহ, মওলানা ভাসানী, মোজাফফর আহমদ প্রমুখ নেতা মঞ্চে থাকবেন। কিন্তু ছাত্রলীগ শেখ মুজিব ছাড়া অন্য কোনো নেতার মঞ্চে উপস্থিত থাকার বিরোধিতা করে। ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) সভাপতি সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক এ বিষয়ে কোনো ছাড় না দিতে সামসুদ্দোহাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেন। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা

মোহাম্মদ ফরহাদ একটি চিরকুট পাঠান। যেখানে বার্তা ছিল, মঞ্চে অন্য কারও থাকার দরকার নেই। এই চিরকুট পেয়ে সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক ছাত্রলীগের প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। এতে সামসুদ্দোহা ক্ষুব্ধ হন। তাঁর ভাষ্য হলো :

> মানিক ভাই ছিলেন সংগঠনের সভাপতি, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মতামতই চূড়ান্ত হবে। কিন্তু তিনিই তো আমাকে শক্ত থাকতে বলেন। যা হোক, আমি ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভা আহ্বান করি এবং সেখানে মানিক ভাইয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করি। সারা রাত এবং পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি দুপুর পর্যন্ত না ঘুমিয়ে আর কিছুতেই থাকা যাচ্ছিল না, তদুপরি মানিক ভাইয়ের ওপর ক্ষোভ ও অভিমান খুবই হয় বিধায় ইকবাল হলে আমার রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।[২৩]

২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্সে শেখ মুজিবকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। ঢাকায় এর আগে সম্ভবত এত বড় জনসভা আর হয়নি। জনসভা আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন গাজী গোলাম মোস্তফা ও সিরাজুল আলম খান। ওই সভায় শেখ মুজিব ঘোষণা দেন, তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যাবেন, বাংলার মানুষের দাবি আদায় করবেন। সভাপতির ভাষণে তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' বলে ঘোষণা দেন। এত বড় জনসভা, কিন্তু কোনো রকম বিশৃঙ্খলা ছিল না। ঢাকার ডেপুটি কমিশনার এম কে আনোয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনি সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন।[২৪] তোফায়েলের 'বঙ্গবন্ধু' ঘোষণা নিয়ে কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সামসুদ্দোহা বলেন :

> ২২ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের সারা রাত ধরে যে মিটিং হয়, সেই মিটিংয়ে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে কেউ কোনো প্রস্তাব দেননি যে শেখ মুজিবুর রহমানের গণসংবর্ধনায় তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা হবে।...বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদানে কোনো আপত্তি কারোরই ছিল না বা নাই। কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কাউকে না জানিয়ে যে পদ্ধতিতে তাঁর মতো নেতাকে এই উপাধি দেওয়া হয়, তা না করে উচিত ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা। এটি আমাদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংকটের একটি নমুনা হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত থাকবে।...ওই সংকীর্ণতার কোনো প্রয়োজন ছিল না।[২৫]

২৩ ফেব্রুয়ারির জনসভায় তোফায়েল আহমেদ ছিলেন 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটির ঘোষক। শেখ মুজিবের জন্য এই নাম তৈরি হয়েছিল আগেই। ছাত্রলীগের ঢাকা কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক ৩ নভেম্বর (১৯৬৮) ছাত্রলীগের প্যাডে 'আজব দেশ' শিরোনামে বাঙালিদের অধিকার

আদায়ের সংগ্রাম সম্বন্ধে একটি লিফলেটের খসড়া লিখেছিলেন। মোশতাক 'সারথি' ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন। লেখাটির শেষ পৃষ্ঠায় শেখ মুজিব সম্পর্কে তিনি লেখেন, 'পূর্ব বাংলার নয়নমণি—মুক্তি দিশারি—বঙ্গবন্ধু—সিংহ শার্দূল জনাব শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রস্তাবিত ছয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে, আজব ও অভিনব পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি টিকে থাকতে পারে—নতুবা নয়।'[২৬] ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত চার পৃষ্ঠার বুলেটিন *প্রতিধ্বনি*র শেষ পৃষ্ঠায় 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি প্রথমবারের মতো ছাপা হয়। বুলেটিনটি সম্পাদনা করেছিলেন আমিনুর রহমান।[২৭] সিরাজুল আলম খান রেসকোর্স ময়দানে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি ঘোষণার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন এভাবে :



★ শিক্ষা ★ শান্তি ★ প্রগতি

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ

ঢাকা কলেজ শাখা

সূত্র তারিখ ৩-১১-৬৮

আজব দেশ || সারথি

পাকিস্তান একটি আজব দেশ— অভিনব রাষ্ট্র। বিশ্বের আর কোথাও এমন আরেকটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাকিস্তানের বেলায় কবির লেখা "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি" কাব্যছত্র উভয়ার্থে প্রযোজ্য হতে পারে। একটি রাষ্ট্রের সংহতি গড়ে উঠে একটি নির্দিষ্ট ও সংলগ্ন ভূ-খণ্ডে অবস্থিত এলাকা নিয়ে অথবা সম-জাতীয় জনসমষ্টির সমন্বয় সমাবেশ নিয়ে।

পরিশেষে একটি কথায় বলা যায়, দু'অংশের পার্থক্য ও অমিলকে স্বীকার করে, দু'অংশের পৃথক ভাষা ও সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে পাশাপাশি স্থান দিয়ে ও সর্বোপরি পূর্ব বাংলার নয়নমণি— মুক্তি দিশারী— বঙ্গবন্ধু— সিংহ শার্দুল জনাব শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক প্রস্তাবিত ৬-দফা কর্মসূচির বাস্তবায়নের মাধ্যমে, আজব ও অভিনব পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি টিকে থাকতে পারে— নতুবা নয়।

১৯৬৮ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের প্যাডে প্রচারপত্রের খসড়ায় 'বঙ্গবন্ধু' শব্দের প্রথম ব্যবহার

রেজাউল হক মুশতাক আর শেখ কামাল একটা ওয়ালপেপার বের করেছে। আহসানউল্লাহ হলের (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) ২১৪ নম্বর রুমে থাকতাম আমি। ওরা আমাকে আসতে বলল। গিয়ে দেখি যে বড় একটা পোস্টার, বঙ্গবন্ধু লেখা। এটি লাগাবে, পরামর্শটা চাচ্ছে। কাগজটা মুড়ি দিয়ে বললাম কাউকে কিছু বোলো না। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্সে যাচ্ছি। গাড়িতে মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে আমি আর তোফায়েল। সায়েন্স ল্যাবরেটরির কাছে এসে লিডার কানের কাছে মুখ এনে বললেন যে কী বলবেন-টলবেন। বললাম, আমাদের সব ঠিক আছে। তোফায়েল বলল, 'কী বলব?' আমি বললাম যে তুমি একটা টাইটেল দেবা। আমি বাঁয়ে ঝুঁকলাম লিডারকে বলার জন্য। তোফায়েল একটা জিনিস দেবে আপনাকে। উনি এটি বুঝলেন, সেন্স করেছেন। জিজ্ঞেসও করলেন না। উনার ওপর আমার একটি বিরাট কনফিডেন্স হলো। তোফায়েলকে বললাম, তোমার বক্তৃতা শর্ট হবে। এ জায়গায় এটি বলবা, রিসেপশনটা ভালো হবে। এটি আমরা আনলাম ইঞ্জিনিয়ারিং করে।[২৮]

রাজনীতিতে শেখ মুজিবের একক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। এটি পরে তাঁর নামের অপরিহার্য অংশ করে তোলার চেষ্টা হয়। ফলে রাজনীতিতে ব্যক্তির 'কাল্ট' প্রতিষ্ঠার পথে আওয়ামী লীগ এক ধাপ এগিয়ে যায়।

২৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব করাচি ও লাহোর হয়ে রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছান। তাঁর ১৭ জন সফরসঙ্গীর মধ্যে আইনজীবী ছিলেন তিনজন—ড. কামাল হোসেন, আমীর-উল-ইসলাম ও মওদুদ আহমদ। অন্যরা প্রায় সবাই আওয়ামী লীগের নেতা।[২৯] এই সুযোগে তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস এ রহমানের সঙ্গে তাঁর বাসায় দেখা করেন। শেখ মুজিবের সৌজন্যবোধ ছিল অসাধারণ। তিনি বিচারপতি রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন যে তাঁর (বিচারপতি রহমান) পক্ষপাতহীন আচরণের জন্যই তিনি (শেখ মুজিব) রক্ষা পেয়েছেন।[৩০]

২৪ ফেব্রুয়ারি রাতেই শেখ মুজিব আইয়ুব খানের সঙ্গে দেখা করেন। আইয়ুব তখনো মুজিবের সঙ্গে একটি আপসরফার আশা ছাড়েননি। ইতিমধ্যে আলতাফ গওহর ছাড়াও আরও দুজন দৃশ্যপটে হাজির হয়েছেন। তাঁরা হলেন পাকিস্তানের ধনী বাইশ পরিবারের অন্যতম হারুন ভ্রাতৃদ্বয়। হারুনেরা ছিলেন ভুট্টোর ঘোর বিরোধী। ভুট্টো যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, তখন তাঁদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। ভুট্টো যখন ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু করেন, আইয়ুব তখন আলতাফ গওহরের মাধ্যমে হারুন ভাইদের পক্ষে টেনে আনেন। মাহমুদ হারুনকে লন্ডনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত করা হয়। ইউসুফ হারুনকে পরে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর করা হয়েছিল।[৩১]

প্রেসিডেন্ট ভবনে গোপন আলোচনা চলল খুবই আন্তরিক পরিবেশে। ঠিক হলো, দেশে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার চালু করা হবে। শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। মুজিবের পছন্দমতো এম এন হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করা হবে। আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে বহাল থাকবেন।[৩২]

২৫ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠক শুরু হলে ওই রাতে আইয়ুব খানের সঙ্গে শেখ মুজিবের একান্তে দেখা ও কথা হয়। তাঁরা প্রেসিডেন্ট ভবনে একসঙ্গে রাতের খাবার খান। শেখ মুজিব কথা দেন যে তিনি গোলটেবিল বৈঠক সফল করতে চেষ্টা চালাবেন। তিনি প্রেসিডেন্টকে বলেন, প্রেসিডেন্ট যে পরবর্তী নির্বাচনে প্রার্থী না হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন, এটি একটি বড় ভুল।[৩৩] ২৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব তাঁর ডায়েরিতে লেখেন :

> কাল রাতে মুজিব আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমাদের কথাবার্তা ছিল খোলামেলা। তাকে একটু আপসমূলক মনে হলো। যদিও সে এটি বোঝাতে চেয়েছে যে তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের মুকুটহীন রাজা হিসেবে মেনে নিতে হবে। তার কথায় দেওয়া-নেওয়ার কোনো আভাস ছিল না। তার ওপর তার দলের চরমপন্থীদের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল এবং ছাত্ররা ছিল তার নিয়ন্ত্রণের পুরোপুরি বাইরে।[৩৪]

শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাবের বিষয়ে আইয়ুব খান তাঁর ডায়েরিতে কিছু লেখেননি। ১৯৭৪ সালের ৩০ অক্টোবর ঢাকায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে আলাপের সময় শেখ মুজিব বলেছিলেন, ১৯৬৯ সালে লাহোরে গোলটেবিল বৈঠক চলাকালে আইয়ুব খান তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[৩৫]

আইয়ুব-মুজিব আপসরফার ব্যাপারটি সেনাসদরে ভালো চোখে দেখা হলো না। ভুট্টো তাঁর বন্ধু জেনারেল পীরজাদার মাধ্যমে এ গোপন আলোচনার খবরটি পেয়ে যান। মুজিব খুব বিপন্নবোধ করতে শুরু করলেন। এ রকম অবস্থায় এ ধরনের একটি সমঝোতা করার ঝুঁকি ছিল অনেক। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি তখন খুবই ঘোলাটে। মওলানা ভাসানীর আহ্বানে সর্বত্র চলছে ঘেরাও আন্দোলন। অন্যদিকে আইয়ুব খান ক্ষমতা ধরে রাখার শেষ অবলম্বন হিসেবে মুজিবকে আঁকড়ে ধরে পার পেতে চাইছেন।[৩৬]

ভুট্টো চেয়েছিলেন গোলটেবিল বৈঠক বরবাদ হোক। শেখ মুজিব যাতে এই বৈঠকে যোগ না দেন, ভুট্টো সেই চেষ্টা করেছিলেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল গুল হাসান খান (পরে লে. জেনারেল ও সেনাপ্রধান)। গুল হাসানের বর্ণনা অনুযায়ী :



১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিব, তাঁর ডান পাশে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের একটি অংশের সভাপতি নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং বাম পাশে জামায়াতে ইসলামীর আমির মওলানা মওদুদী

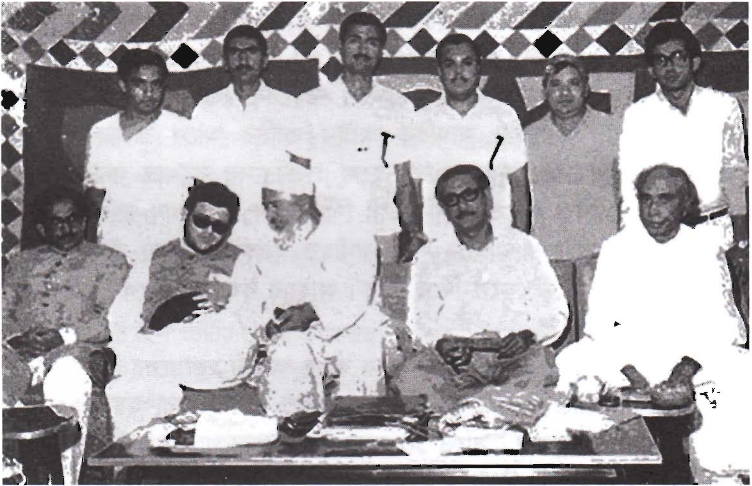
> একদিন সকালে একটি টেলিফোন কল এল করাচি থেকে। লাইনের অপর প্রান্তে জেড এ ভুট্টো। বললেন, তিনি ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কথা বলতে চান। শেখ তখনো মুক্তি পাননি। জবাবে বললাম, সে ক্ষেত্রে তাঁকে ঢাকায় রিং করতে হবে। তিনি বললেন যে ইতিমধ্যেই তা করেছেন। কিন্তু সেখানকার সামরিক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগের অনুমতি দিতে পারেন একমাত্র সিজিএস (চিফ অব জেনারেল স্টাফ) অর্থাৎ আমি। আমি ভুট্টোকে বললাম যে আমার কাছে এটি এক নতুন খবর, যেহেতু আমার দায়িত্ব ও করণীয় কী কী তা বলার সময় কেউ আভাসমাত্রও দেননি যে শেখের জিম্মাদারির ভারও আমার ওপর। ভুট্টোর মেজাজটা যে বিগড়ে গেল তা বুঝতে পারলাম। বললেন যে জরুরি ভিত্তিতে শেখের সঙ্গে তাঁর কথা বলার ব্যবস্থা আমাকেই করে দিতে হবে। কারণ, ব্যাপারটায় জাতীয় গুরুত্ব রয়েছে। বললাম, বিষয়টা যদি অতটা তাৎপর্যপূর্ণ হয় তাহলে তিনি প্রেসিডেন্টকে রিং করতে পারেন। প্রেসিডেন্ট এ রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামাল দেন। রেখে দিলাম ফোনটা। জানি না শেখের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করতে পেরেছিলেন নাকি পারেননি। সম্ভবত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সম্মেলনে যোগ না দেওয়ার জন্য শেখকে রাজি করানো।[৩৭]

২৫ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়। ওই দিনই সভা মুলতবি হয়ে যায়। শেখ মুজিব দলবলসহ ঢাকায় ফিরে আসেন। দুদিন পর তিনি ঈদ উদ্‌যাপনের জন্য গ্রামের বাড়ি টুঙ্গিপাড়ায় যান। ৩ মার্চ হেলিকপ্টারে চড়ে ইউসুফ হারুন হঠাৎ টুঙ্গিপাড়ায় এসে হাজির হন, কয়েক ঘণ্টা আলাপ করেন শেখ

মুজিবের সঙ্গে। তারপর ফিরে যান। তিনি আইয়ুবকে ধারণা দেন, সব সমস্যা মিটে যাবে।[৩৮]

১০ মার্চ গোলটেবিল বৈঠক আবার শুরু হলে শেখ মুজিব ছয় দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব দেন। একই সঙ্গে তিনি এক ব্যক্তি এক ভোট এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে চারটি প্রদেশ পুনর্বহালের প্রস্তাব করেন। তাঁর প্রস্তাবে অনেকেরই আপত্তি ছিল। শেখ মুজিব বৈঠক ছেড়ে চলে যান। ফলে গোলটেবিল বৈঠক ভেঙে যায়। রাজনৈতিক মঞ্চে সেনাবাহিনীর আগমনের আলামত দেখা যাচ্ছিল। আইয়ুব-মুজিব গোপন বৈঠকের কথা সেনাসদরে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। সামরিক জান্তার মুজিববিরোধী অংশটি শেখ মুজিবকে আইয়ুবের কথায় পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় না গিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে সামনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় যেতে পরামর্শ দেয়।[৩৯]

১২ মার্চ শেখ মুজিব সেনাপ্রধান ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেছিলেন। তিনি ইয়াহিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে ছয় দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি বাঙালিদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইয়াহিয়া সহানুভূতির সঙ্গে বলেছিলেন, আইয়ুব ও মোনায়েম খান ছয় দফাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা না করে 'অস্ত্রের ভাষা'য় জবাব দেওয়ার মনোভাব দেখিয়ে ভুল করেছেন।[৪০]



করাচিতে শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে শেখ মুজিব। বসা (বাঁ থেকে) তাগদিল আহমদ, পীর মানকি শরিফ, আরবাব নামতুল্লাহ, শেখ মুজিব, জি এম সৈয়দ; দাঁড়ানো (বাঁ থেকে) আমানুল্লাহ শেখ, শফি পানওয়ার, মুনীর চাল্লো, এজাজ কোরেশি, শওকত সিন্ধী ও ওবায়দুল্লাহ শেখ। হায়দার মঞ্জিল, করাচি, আগস্ট ১৯৬৯।

শেখ মুজিব ১৪ মার্চ ঢাকায় ফিরে আসেন। তেজগাঁও বিমানবন্দরে তিনি আচকান-পাঞ্জাবি পরা পূর্ব পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের কঠোর সমালোচনা করেন। মওলানা ভাসানীকে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পরামর্শ দেন। ২২ মার্চ শেখ মুজিব আইয়ুবের কাছে '৬২ সালের সংবিধানের কতগুলো সংশোধনী প্রস্তাব পাঠান। আইয়ুবের মনে হলো, এগুলো বাস্তবায়ন করলে পাকিস্তান আর টিকবে না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, শেখ মুজিব দলের চরমপন্থীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন।[৪১]

আইয়ুব খান আইনমন্ত্রী আলভিন রবার্ট কর্নেলিয়াস ও তথ্যসচিব আলতাফ গওহরের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন, সংবিধানে দুটি সংশোধনী আনতে হবে। এগুলো হচ্ছে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন ও পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা চালু করা। তিনি তাঁদের অনুরোধ করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সেনাপ্রধানের সঙ্গে আলোচনা করতে। দুপুরেই এ আলোচনাপর্ব শেষ হলো। সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া ক্রমেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলেন। তাঁর মত হলো, পরিস্থিতি খুবই খারাপ। সংবিধান পরিবর্তন করে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা যাবে না। নতুন গভর্নরদের হাতে কোনো জাদুর কাঠি নেই। সুতরাং তাঁকেই (ইয়াহিয়া) তাঁর কর্তব্য পালন করতে হবে। এটি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না, ইয়াহিয়া আসলে কী বলতে চাইছেন।[৪২]

আইয়ুব খান অনেক ভেবেচিন্তে দেখলেন, সামরিক আইন জারি করা ছাড়া উপায় নেই। মন্ত্রিসভার শেষ বৈঠকে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। সভায় ইয়াহিয়া উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষ হওয়ার পর আইয়ুব আর ইয়াহিয়া একান্তে আলোচনা শুরু করলেন। আইয়ুব জানতে চাইলেন, তিনি ইয়াহিয়ার সমর্থন পাবেন কি না। ইয়াহিয়া সামরিক আইন জারির আগে কয়েকটি বিষয় বাস্তবায়নের কথা বললেন। এগুলো হচ্ছে গভর্নরদের বরখাস্ত করতে হবে; জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলো ভেঙে দিতে হবে; সংবিধান বাতিল করতে হবে। শেষ প্রস্তাবটিতে আইয়ুব খুবই মর্মাহত হলেন। কেননা তাঁর বানানো সংবিধান তাঁকেই ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। আইয়ুব বুঝতে পারলেন, তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে।[৪৩]

২৪ মার্চ আইয়ুব জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের চিঠির খসড়া তৈরি করেন। পরদিন বেলা ১১টায় তাঁর ভাষণ রেকর্ড করা হয়। ২৫ মার্চ ক্ষমতার পালাবদল হলো। সাড়ে ১০ বছর প্রবল প্রতাপে ক্ষমতার চূড়ায় বসে থেকে আইয়ুব খান প্রায় নিঃশব্দে মঞ্চ থেকে সরে গেলেন।

গোলটেবিলে দর-কষাকষির জন্য শেখ মুজিব যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। এ জন্য তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন বাছাই করা বিশেষজ্ঞ, যাঁরা ছয় দফা এবং পূর্ব বাংলার ন্যায্য অধিকারের ব্যাপারে ছিলেন আন্তরিক। তিনি জানতেন, প্রয়োজনে

আইয়ুব সরকারের ঝানু আমলাদের সঙ্গে তাঁকে লড়তে হবে। এ ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা তো আছেনই, যাঁরা তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।[৪৪] কাকতালীয়ভাবে ভুট্টো ও শেখ মুজিব করাচি থেকে একই বিমানে চড়ে লাহোরে গিয়েছিলেন। ভুট্টো তাঁর দলবল নিয়ে প্রথম শ্রেণির এবং মুজিব তাঁর সহযোগীদের নিয়ে ইকোনমি ক্লাসের যাত্রী হন। শেখ মুজিবের বিশেষজ্ঞ দলে যোগ দিয়েছিলেন ড. কামাল হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ আনিসুর রহমান ও অধ্যাপক ওয়াহিদুল হক। অর্থনীতিবিদ ড. নূরুল ইসলামকে তৈরি থাকতে ও অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী অধ্যাপক মির্জা নূরুল হুদা আইয়ুবের দলের সদস্য হিসেবে বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগের উপদেষ্টাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং সরকারপক্ষে কী ঘটছে না ঘটছে সে সম্পর্কে 'ভেতরের খবর' সরবরাহ করতেন।[৪৫]

১৯৬৯ সালের ২১ মার্চ আইয়ুব খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এন হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। ২২ মার্চ ড. হুদা ইসলামাবাদ থেকে ঢাকায় পৌঁছান এবং পরদিন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি এ সিদ্দিকীর কাছে গভর্নর হিসেবে শপথ নেন। এরপর তিনি শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী, খাজা নাজিমুদ্দিন ও মৌলভি তমিজউদ্দিন খানের কবরে ফাতেহা পাঠ করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যান। তাঁর আগে গভর্নরের দায়িত্ব নেওয়ার পর শহীদ মিনারে যাওয়ার সাহস কেউ দেখাননি।[৪৬]

দুপুরের পর ড. হুদা সব প্রটোকল ভেঙে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে শুরু করেন। প্রথমেই দেখা করেন প্রবীণ রাজনীতিক নুরুল আমিনের সঙ্গে। তারপর যান শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির বাসায়। শেখ মুজিব লাউঞ্জে গাউন পরে আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন। নতুন গভর্নরের সঙ্গে তিনি সে অবস্থাতেই হাত মেলান। গভর্নরের এডিসি মেজর জিলানী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কে একজন বলল, তিনি একটু অসুস্থ, তাই...। কিন্তু মেজর জিলানীর মনে হলো, তিনি বুঝে-সুঝেই এ কাজ করেছেন—উপস্থিত লোকদের এটি দেখানোর জন্য যে তিনি কী পরিমাণ ক্ষমতাবান, গভর্নরকে থোড়াই কেয়ার করেন তিনি। ব্যাপারটি অধ্যাপক ড. হুদার জন্য ছিল লজ্জাকর। শেখ মুজিব যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ছাত্র, ড. হুদা তখন একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক। ড. হুদা এরপর আতাউর রহমান খান, মৌলভী ফরিদ আহম্মদ, হামিদুল হক চৌধুরী, আবদুস সালাম খান, অধ্যাপক গোলাম আযম, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, খাজা খয়েরুদ্দিন, নবাব খাজা হাসান আসকারী প্রমুখের সঙ্গে দেখা করেন। ২৪ মার্চ তিনি তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকর্মীদের সরিয়ে দেন, চলার পথে

ট্রাফিক সাইরেন বাজানো নিষিদ্ধ করেন এবং গভর্নর হাউসের সামনের রাস্তা জনসাধারণের চলাচলের জন্য খুলে দেন। সন্ধ্যায় তিনি মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করেন। সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় আইয়ুব খান বেতারে সামরিক শাসন জারি করেন। গভর্নররা বরখাস্ত হন। ড. হুদা গভর্নর হাউস ছেড়ে তাঁর মিন্টো রোডের বাসায় চলে যান।[৪৭]

ক্ষমতার এই পালাবদলের পেছনে দুটি বড় ঘটনা ঘটেছিল, যা পরবর্তী সময়ে এ দেশের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। একটি হলো, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা', অন্যটি হলো ১৯৬৮-৬৯ সালের ছাত্র গণ-আন্দোলন। এ দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় বীর হিসেবে পরিচিতি পান এবং দেশের রাজনীতিতে প্রধান নেতা হিসেবে তাঁর উত্থান হয়। উনসত্তরের গণ-আন্দোলন এ দেশের তরুণ সমাজকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়েছিল। ফলে তরুণ সমাজ, বিশেষ করে ছাত্ররা রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হন।

ছাত্রদের এগারো দফা আন্দোলনের ফলে ছাত্রনেতারা দেশব্যাপী পরিচিতি পান। কিন্তু আন্দোলনটি গড়ে তোলা খুব সহজ ছিল না। এর নেপথ্যে ছিলেন অনেকেই, যাঁদের ভূমিকা নিয়ে তেমন আলোচনা বা লেখাজোকা নেই। ইতিহাসের এই পর্বটির যথাযথ অনুসন্ধান আজও হয়নি।

১৯৬৬-৬৮ সাল ছিল আওয়ামী লীগের জন্য দুঃসময়। বেশির ভাগ নেতা ছিলেন জেলে আটক। যুবনেতাদের মধ্যে শেখ ফজলুল হক মণি, কে এম ওবায়দুর রহমান ও আবদুর রাজ্জাকও কারাগারে। বলা চলে, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আমেনা বেগম 'রীতিমতো হ্যারিকেন জ্বালিয়ে আওয়ামী লীগ অফিস পাহারা দিতেন', আর বাইরে থেকে আন্দোলনের জোয়ার তৈরির চেষ্টায় ছিলেন ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল আলম খান। মূল ভরসা ছিল ছাত্রলীগ। তারাই কোনোমতে দলের নিবু নিবু সলতেটাকে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। এ সময় তাঁদের পাশে দাঁড়ান সাইদুর রহমান নামের এক তরুণ ব্যবসায়ী। ওই সময়ের একটি ছবি পাওয়া যায় তাঁর বর্ণনা থেকে। প্রথমে ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুর রউফের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। রউফ তাঁকে ইকবাল হলে নিয়ে আসেন। সেখানে পরিচয় হয় সিরাজুল আলম খান ও তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে। চারদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কাজের তখন সবে শুরু। ছাত্র আন্দোলনের একপর্যায়ে ছাত্রলীগের সাবেক নেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও আবদুর রাজ্জাক জেল থেকে ছাড়া পান। তাঁদের সঙ্গেও সাইদুর রহমানের ঘনিষ্ঠতা হয়। সাইদুর রহমানের ভাষ্য অনুযায়ী :

> ওই সময় সমস্ত ইন্টেলিজেন্স উপেক্ষা কইরা এদের হাইডআউটের জন্য দুটি বাড়ি ভাড়া করছিলাম আমি। একটি করছিলাম বাসাবোতে, আরেকটি

> আদাবরে। এদের রাত্রিবেলা নিয়া যাওয়ার জন্য আমার ৩১৫৫ ঢাকা-ক ফক্স ওয়াগন তাদের জন্য ইউজ করছি। এরা আমার বাসায় থাকত। পরে ইন্টেলিজেন্স যখন এদের পেছনে লাগল, তখন গাড়িতে—আমার ওয়াইফ থাকত পেছনের সিটে। সিরাজ, মণি, তোফায়েল, রাজ্জাক, রউফ, যেকোনো একজন বা দুজন পেছনের সিটে আমার ওয়াইফের লগে বইত। আমি তাদের ড্রাইভার। এইভাবে রাত্রিবেলা তাদের নিয়া যাইতাম। আদাবর আর বাসাবো।[৪৮]

পরবর্তী সময়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে সাইদুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তিনি শেখ মুজিবের আস্থাভাজন হতে পেরেছিলেন। রাজনীতির নেপথ্যে দূতিয়ালির কাজে তিনি বেশ পারঙ্গম ছিলেন।

উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের পথ ধরে এ দেশের সমাজ ও রাজনীতি এগিয়েছে অনেকটা। ওই আন্দোলনে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সব অংশের তরুণ সমাজ এককাট্টা হয়েছিল। রক্ত ঝরেছিল অনেক। ১৯৬৮ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে যথাক্রমে ৪ ও ১১ জন নিহত হয়েছিলেন। যতই দিন গেছে, নিহত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে নিহত হন ৫৭ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৪৭ জন এবং মার্চে ৯০ জন। শেষ দিকে বিক্ষুব্ধ জনতা অনেক জায়গায় থানা আক্রমণ করে এবং সংঘর্ষে অনেক পুলিশ সদস্যও মারা যান। তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র লুট হয়।[৪৯]

২০ জানুয়ারি নিহত আসাদুজ্জামান ছিলেন প্রদেশে উনসত্তরের আন্দোলনের প্রথম শহীদ। তিনি মৃত্যুর পর তারকাখ্যাতি পান। ২৪ জানুয়ারি ঢাকায় গণ-অভ্যুত্থানে ৬ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও কিশোর নিহত হয়েছিল। এদের মধ্যে নবকুমার ইনস্টিটিউটের ছাত্র মতিউর ছাড়া আর কেউ গণমাধ্যমে প্রচার পায়নি। ১৫ ফেব্রুয়ারি নিহত হন সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি নিহত হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা। পেশাগত কারণেই তাঁদের প্রচারে ঘাটতি ছিল না। অন্যরা শহীদের তালিকায় অপাঙ্‌ক্তেয় থেকে যান।

আসাদের মৃত্যু এ দেশের মানুষকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। আন্দোলন তাতে বেগবান হয়েছিল সন্দেহ নেই। আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে রাজপথে মিছিল হয়েছিল। শামসুর রাহমান 'আসাদের শার্ট' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। তার শেষ লাইনগুলো ছিল :

> আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
> সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক,
> আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।[৫০]

নির্বাচন

আইয়ুব খানের তৈরি ’৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করলে জাতীয় পরিষদের স্পিকারের দায়িত্ব নেওয়ার কথা। বাঙালি স্পিকার আবদুল জব্বার খান আইয়ুবের একান্ত অনুগত হলেও আইয়ুব তাঁকে বিশ্বাস করেননি। সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়াই তিনি ভালো মনে করেছিলেন।[১]

জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে পাকিস্তানের ক্ষমতা হাতে নেন। ‘রাষ্ট্রীয় কাজের সুবিধা’র জন্য ৩১ মার্চ তিনি নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন। সেনাসদরে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দপ্তরের প্রধান নির্বাহী হলেন প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লে. জেনারেল সৈয়দ গোলাম মোহাম্মদ মহিউদ্দিন পীরজাদা। একটি জাতীয় নিরাপত্তা সেল তৈরি করা হলো। এর কাজ হলো সব গোয়েন্দা দপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য যাচাই-বাছাই করে প্রেসিডেন্টের জন্য একটি সমন্বিত প্রতিবেদন তৈরি করা। আগে একেক গোয়েন্দা দপ্তর থেকে একেক রকমের তথ্য পাওয়া যেত এবং এটি আইয়ুব খানকে যথেষ্ট ভুগিয়েছে। ফলে আন্তবাহিনী গোয়েন্দা দপ্তর (আইএসআই), গোয়েন্দা ব্যুরো (আইবি), পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরগুলো (সিআইডি ও স্পেশাল ব্রাঞ্চ) এবং সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরকে (এমআই) একটি চেইনের মধ্যে নিয়ে আসা হলো। জাতীয় নিরাপত্তা সেলের প্রধান নিযুক্ত হলেন মেজর জেনারেল গোলাম উমর। লে. জেনারেল আবদুল হামিদ খানকে জেনারেল পদমর্যাদা দিয়ে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ করা হলো। হামিদ-পীরজাদা-উমর এই ত্রয়ী ইয়াহিয়ার চারদিকে একটি বলয় তৈরি করতে সমর্থ হলেন, যা ভেদ করে বাইরের পৃথিবী দেখার ক্ষমতা ইয়াহিয়া হারিয়ে ফেললেন।

এর আগেও দেখা গেছে, সামরিক শাসন চালু হলে জেনারেলরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে রীতিমতো জিহাদ শুরু করে দেন। অসামরিক সরকারের সময় দেখা যায়, রাষ্ট্র চুনোপুঁটিদের দুর্নীতি নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকে। কারণ, বড়

দুর্নীতিবাজগুলো সরকারের ভেতরেই থাকে। সামরিক শাসনের শুরুতে দুর্নীতির দায়ে রুই-কাতলাদের ধরার একটি আয়োজন থাকে। এতে সেনাশাসকেরা বেশ জনপ্রিয়তা পেয়ে যান। ইয়াহিয়া খানের শুরুটাও হলো তেমনভাবেই। দুর্নীতিবাজদের একটি লম্বা তালিকা তৈরি হলো। আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল আইয়ুবের অনুগত আমলাবাহিনী। ৩০৩ জনকে নানাভাবে শায়েস্তা করা হলো। তাঁদের অনেকেই চাকরি হারালেন। তালিকার পয়লা নম্বরেই ছিলেন আইয়ুবের সবচেয়ে বিশ্বস্ত তথ্যসচিব আলতাফ গওহর। অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তার মধ্যে ছিলেন এন এ ফারুক ও ফিদা হাসান। তালিকাভুক্ত কর্মকর্তাদের বলা হলো 'থ্রি নট থ্রি'। এ নামে একটি রাইফেল আছে, যা সাধারণ সেনারা ব্যবহার করেন। এই রাইফেলের নলের ব্যাস শূন্য দশমিক ৩০৩ ইঞ্চি। এ জন্যই এই নামকরণ। থ্রি নট থ্রি নামটা বেশ চাউর হলো।

পীরজাদা একসময় প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সামরিক সচিব ছিলেন। ১৯৬৪ সালের দিকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আইয়ুব তাঁকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দেন। প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে বের করে দেওয়ার জন্য পীরজাদা কখনোই আইয়ুবকে ক্ষমা করতে পারেননি। ১৯৬৬ সালে আইয়ুব একই কাজ করেছিলেন ভুট্টোকে নিয়ে। তাসখন্দ চুক্তির অল্প কয়েক দিন পরই ভুট্টো তাঁর মন্ত্রিত্ব হারান। শুরু হয় ভুট্টো-পীরজাদা আঁতাত, যা পরে ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণে বড় ভূমিকা রেখেছিল।

ক্ষমতা নেওয়ার পর ইয়াহিয়া ২৬ মার্চ তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন, একটি সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা ছাড়া তাঁর আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। তিনি আরও বলেন যে একটি স্বচ্ছ ও সৎ প্রশাসন হচ্ছে সুষ্ঠু ও গঠনমূলক রাজনীতি এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বশর্ত।[২]

পাকিস্তানি কবি রইস আমরোহী ক্ষমতার এই পালাবদলকে উর্দুতে ছন্দোবদ্ধ করেছিলেন :

সালটা ছিল আটান্ন কিংবা উনসত্তর
আমার কাছে অর্থ একই দুটোর
ময়লা জমতে লেগেছে দশ বছর
সাফ করছি দশ বছর অন্তর।[৩]

সুলতান মোহাম্মদ খান তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরে সচিব)। কবিতার এই লাইনগুলো তিনি ইয়াহিয়াকে পড়ে শোনান। শুনেই ইয়াহিয়ার মন খারাপ হয়ে গেল। কয়েক দিনের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ অসামরিক কর্মকর্তাদের সভা ডাকলেন। সামরিক আইন জারির পটভূমি ব্যাখ্যা করে তিনি

একটি ভাষণ দিলেন। তারপর জানতে চাইলেন, কারও কোনো প্রশ্ন আছে কি না। কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব কুদরতউল্লাহ শাহাব অতীতে একাধিক সরকারের উত্থান-পতন দেখেছেন। তিনি একজন উচ্চ মানের লেখক হলেও কথাবার্তায় মোটেও চৌকস ছিলেন না। সামরিক শাসনের অধীনে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বললেন, রাস্তাঘাট সাফ করা, মশা-মাছি মারা, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ—সামরিক সরকারের অতি পছন্দের এসব কাজ বাদ দিয়ে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার দিকে নজর দেওয়া দরকার। ইয়াহিয়া এ রকম মন্তব্য আশা করেননি। শাহাব বরখাস্ত হলেন।[৪]

সামরিক আইন জারি করার পর চতুর্দশ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মুজাফফর উদ্দিনকে পূর্ব পাকিস্তানের (জোন-বি) আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। ৩১ মার্চ ইয়াহিয়া খান নিজেকে দেশের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করার কয়েক দিন পর মুজাফফর উদ্দিনকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। পরবর্তী সময়ে লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং ভাইস অ্যাডমিরাল এস এম আহসান পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক ও গভর্নরের দায়িত্ব পান। আহসান ১ সেপ্টেম্বর গভর্নর হিসেবে শপথ নেন। মুজাফফর উদ্দিন দুই মাস পর পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেলে তাঁর জায়গায় চতুর্দশ ডিভিশনের কমান্ডারের দায়িত্ব পান মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী গভর্নরের স্টাফ অফিসার হিসেবে বেসামরিক বিষয়গুলোর দেখভাল করতে থাকেন।[৫]

৪ আগস্ট ইয়াহিয়া অসামরিক ব্যক্তিদের নিয়ে ১০ সদস্যের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন বাঙালি—এ কে এম হাফিজুদ্দিন, শামসুল হক, আহসানুল হক, ডা. আবদুল মোতালেব মালেক ও অধ্যাপক গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী। ছয়জন বাঙালি সিএসপি কর্মকর্তাকে কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। সব মন্ত্রণালয়ে নির্দেশ যায়, কোনো পদ শূন্য হলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যেন বাঙালিদের নিয়োগ দেওয়া হয়।[৬]

ইয়াহিয়া রাজনৈতিক নেতাদের একসঙ্গে ডেকে নিয়ে কোনো সম্মেলন করেননি। তিনি আলাদা করে সবার সঙ্গে দেখা করে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। একটি সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের আগে তিনি চেয়েছিলেন সবার মন বুঝতে এবং মতামত যাচাই করে দেখতে। কিন্তু পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা শুনে তিনি অনেক সময় হতবুদ্ধি হয়ে পড়তেন।

রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আলোচনায় তিনটি বিষয় উঠে আসে, যা ইয়াহিয়াকে ভাবিয়ে তোলে। বিষয়গুলো ছিল : প্রথমত, বাঙালিদের পক্ষ থেকে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্বের দাবি; দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রের সঙ্গে প্রদেশের সম্পর্ক কেমন

হবে; এবং তৃতীয়ত, পশ্চিম পাকিস্তান 'এক ইউনিট' হিসেবে থাকবে কি থাকবে না। গভর্নর আহসান ও মন্ত্রী জি ডব্লিউ চৌধুরী শেখ মুজিবকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানের দাবিগুলোর ব্যাপারে যথেষ্ট সংবেদনশীল এবং এটাই বাঙালিদের জন্য শেষ সুযোগ। শেখ মুজিব দৃশ্যত ইয়াহিয়ার ওপর ক্রমশ আস্থাশীল হয়ে উঠছিলেন। তিনি ইয়াহিয়া ও আহসানকে এমনও বলেছিলেন যে তাঁর ছয় দফা কোরআন বা বাইবেল নয় এবং একটি সমঝোতায় পৌঁছানো খুবই সম্ভব। অধ্যাপক চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা করার সময় শেখ মুজিব দেয়ালে ঝোলানো সোহরাওয়ার্দীর ছবির দিকে তাকিয়ে একদা বলেছিলেন, 'এই মহান নেতার শিষ্য হয়ে আমি পাকিস্তান ভাঙার কথা কেমন করে ভাবতে পারি?' ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিব দুজনই আশাবাদী ছিলেন, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিরাজমান জটিল সম্পর্কের একটি স্থায়ী সমাধান সম্ভবপর হবে।[৭]

রাজনীতিবিদদের মতানৈক্যের পটভূমিতে ইয়াহিয়া নিজেই ঠিক করলেন তাঁর করণীয় কী? ২৮ নভেম্বর (১৯৬৯) দেশব্যাপী প্রচারিত এক বেতার ভাষণে তিনি কয়েকটি বিকল্প সম্ভাবনার উল্লেখ করেন। বিকল্পগুলো হলো :

১) একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিশন আহ্বান করা, যার কাজ হবে নতুন একটি সংবিধান তৈরি করা। এরপর কমিশন বিলুপ্ত হবে।
২) ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনর্বহাল করা।
৩) একটি সংবিধান তৈরি করে তার ওপর গণভোট আয়োজন করা।
৪) আগের সংবিধানগুলোর বিশ্লেষণ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গ্রুপের সঙ্গে আলোচনা এবং জনমতের ওপর ভিত্তি করে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি আইনি কাঠামো দেওয়া।

সব বিকল্পের সুবিধা-অসুবিধা বিচার করে ইয়াহিয়া চতুর্থ বিকল্পটি বেছে নেন। তিনি আরও ঘোষণা দেন, জনসংখ্যার অনুপাতে জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্ব থাকবে এবং এক কক্ষবিশিষ্ট জাতীয় পরিষদ হবে; পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল হবে এবং প্রদেশগুলো পুনর্বহাল হবে। জাতীয় পরিষদে সবকিছু সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্ধারিত হবে। ইয়াহিয়া আশা করেন, সবাই এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে একমত হবেন।[৮]

ইয়াহিয়ার এই ভাষণ ছিল সুস্পষ্টভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ইতিবাচক। শেখ মুজিব এটাই চেয়েছিলেন। কেন্দ্রের সঙ্গে প্রদেশগুলোর সম্পর্ক কী রকম হবে, সে ব্যাপারে ইয়াহিয়া কিছু বলেননি। শেখ মুজিব চাননি যে ইয়াহিয়া এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিক। তিনি চেয়েছিলেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সিদ্ধান্ত নেবেন। এ জন্য ইয়াহিয়াকে পশ্চিম পাকিস্তানে অনেকেই সমালোচনা করেন। এ ব্যাপারে ইয়াহিয়ার বক্তব্য ছিল পরিষ্কার :

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পূর্ণ অংশগ্রহণ নেই। এই পরিস্থিতিতে তাদের ক্ষোভ থাকাটাই স্বাভাবিক। এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। এ জন্য দরকার জাতীয় সংহতি ও দেশের অখণ্ডতা বজায় রেখে পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা রাখা।

কেন্দ্র-প্রদেশ সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর অন্যতম হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিষয়টি কীভাবে দেখা হবে। ফেডারেশন মানে শুধু আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ভাগাভাগি নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশীদারির বিষয়টিও দেখতে হবে। তাই প্রদেশগুলোর চাহিদা এবং একই সঙ্গে জাতীয় স্বার্থের দিকে তাকিয়ে ন্যায্য দাবিগুলোর সুরাহা করতে হবে। পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণের তাদের সম্পদ ও উন্নয়নের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে, যতক্ষণ না এটি কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকারিতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।[৯]

ইয়াহিয়ার ২৮ নভেম্বরের ভাষণে 'বাঙালি নিয়ন্ত্রিত' জাতীয় পরিষদের সম্ভাবনা দেখে সেনাসদরের কুশীলবেরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তাঁরা স্বায়ত্তশাসনের পরিধি সংজ্ঞায়িত করে একটি আইন জারি করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। তাঁরা প্রস্তাব দেন, সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বদলে ন্যূনতম ৬০ শতাংশ ভোটে সাংবিধানিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার। পূর্ব



১৯৬৯ সালে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলনের পর নবনির্বাচিত সভাপতি তোফায়েল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রব ও সংগঠক কামরুল আলম খান খসরুর সঙ্গে শেখ মুজিব

পাকিস্তানের অনেক রাজনীতিবিদও এই ধারণা সমর্থন করেন। কারণ, তাঁদের আশঙ্কা ছিল, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে না দিলে ছয় দফার জোয়ারে তাঁরা ভেসে যাবেন।

শেখ মুজিব গভর্নর আহসানের মাধ্যমে সবাইকে সতর্ক করে দেন যে 'এক ব্যক্তি এক ভোট' এই নীতির কোনো পরিবর্তন তিনি মেনে নেবেন না। আহসান ইয়াহিয়াকে ধারণা দেন যে শেখ মুজিবের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে পাকিস্তানের ঐক্য টিকিয়ে রাখা যাবে না। ইয়াহিয়া অবশ্য মনে করতেন, শেখ মুজিব হয়তো ছয় দফা পরিমার্জন করতে রাজি হবেন। ওই সময় অধ্যাপক জি ডব্লিউ চৌধুরী, যিনি সংবিধান বিষয়ে ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো এই তিনজনের মতামত যাচাই করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে নির্বাচন হয়ে গেলে মুজিব ছয় দফা পরিমার্জন করবেন। অধ্যাপক চৌধুরীর ছোটাছুটি ও দূতিয়ালি এ পর্যায়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর বক্তব্য এ ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক :

> ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুজিব আমাকে বললেন, প্রস্তাবিত আইনি কাঠামোতে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের সঙ্গে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনও হতে হবে। আমি বললাম, আইনি কাঠামো কোনো সংবিধান নয়। কীভাবে নির্বাচন ও সংবিধান তৈরি হবে, তার জন্য একটি পদ্ধতিগত নির্দেশনামাত্র। সংবিধান তৈরি হওয়ার পর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হতে পারে। মুজিব মুচকি হেসে বললেন, 'আপনি একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; আমি একজন রাজনীতিবিদ। ইয়াহিয়া কীভাবে আশা করেন যে আমি আমার দাবিগুলো পরিবর্তন করব?'
>
> আমি এই ইঙ্গিত ইতিবাচক মনে করলাম। আমার ধারণা হলো, তিনি একটি সর্বসম্মত সংবিধানের স্বার্থে ছয় দফা পরিমার্জন করবেন। আমি করাচি গেলাম ভুট্টোর সঙ্গে কথা বলতে। একই সময়ে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমি তাঁর মনোভাব জানতে চাইলাম। ভুট্টো জানতে চাইলেন, এটি মুজিবের প্রস্তাব কি না। আমি জবাব এড়িয়ে গেলাম। বললাম, আমার কাজ হলো সবার সঙ্গে কথা বলা। ভুট্টো প্রস্তাবে রাজি হলেন। বললেন, 'এটি হবে ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়া।' ইসলামাবাদে ফিরে আমি ইয়াহিয়াকে সব জানালাম। তিনি তখনই এটি মেনে নিলেন এবং আমাকে একটি আইনি কাঠামোর খসড়া তৈরি করতে বললেন। ইয়াহিয়া আরও বললেন, 'এক ব্যক্তি এক ভোট' বিষয়ে তিনি কোনো আপস করবেন না। তাহলে সামরিক শাসকদের ওপর বাঙালিদের আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। আর এতে পুরো প্রক্রিয়াটাই বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং সেনাসদরের সবাইকে এটি গিলতে হলো।
>
> জানুয়ারিতে এদের এক সভায় আমি বললাম, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিধি নির্ধারণ না করে পাকিস্তানের ঐক্য টিকিয়ে রাখার জন্য ন্যূনতম যা যা

দরকার, তা উল্লেখ করা হবে। আহসান সমর্থন দিলেন। ইয়াকুব বললেন, তিনি খোলা মন নিয়ে আলোচনার পক্ষপাতী। পীরজাদা ভুট্টোর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানালেন, ভুট্টোর কোনো আপত্তি নেই। ফলে পীরজাদা নিরপেক্ষ হয়ে গেলেন। কেবল হামিদ, টিক্কা ও উমর মুজিবের প্রতি 'নরম' মনোভাব দেখানোর জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

আমি পাঁচটি নীতিসংবলিত একটি খসড়া তৈরি করলাম। জেনারেলরা এটি মেনে নিলেন। মনে হলো, সংকট কেটে গেছে। নির্বাচনের পরবর্তী ঘটনাবলি থেকে প্রতীয়মান হয়, মাত্র এক বছরের জন্য বিষয়টি স্থগিত ছিল।[১০]

১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (এলএফও) শিরোনামে একটি আইনি কাঠামো ঘোষণা করা হলো। পাঁচটি নীতিসংবলিত এই কাঠামোয় ছিল :

১) পাকিস্তানের আদর্শগত ভিত্তি হবে ইসলাম।
২) একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান এবং সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে।
৩) রাষ্ট্রের অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে হবে।
৪) দেশের দুই অংশের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য—বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে—দূর করতে হবে; এ জন্য যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৫) কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার বিন্যাস এমন হবে, প্রদেশগুলো যেন সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন পায় এবং একই সঙ্গে কেন্দ্রের হাতে যেন পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকে, যাতে কার্যকরভাবে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা করা যায়।

এলএফওতে একটি ভূমিকা, ২৭টি ধারা এবং দুটি তালিকা ছিল। এটি ছিল একটি সংবিধানের মতোই; বলা যেতে পারে অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান। আইনি কাঠামোতে উল্লেখ করা হয়েছিল, জাতীয় পরিষদ যে সংবিধান তৈরি করবে, তা কার্যকর হতে প্রেসিডেন্টের সম্মতি লাগবে। ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান সফরে এলে ঢাকা বিমানবন্দরে একজন সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে ইয়াহিয়া বলেন, প্রেসিডেন্টের সম্মতির বিষয়টি পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। আইনি কাঠামোতে বলা হয়েছিল, নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান তৈরি করবে। যদি তা না হয়, তাহলে প্রেসিডেন্ট নিজেই একটি সংবিধান দেবেন। ইয়াহিয়া মনে করতেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস থাকলেই পাকিস্তান টিকবে। নির্বাচনের নামে জোচ্চুরি করে পাকিস্তানকে টেকানো যাবে না।[১১]

কিছুদিন পর ইয়াহিয়াকে একটি গোয়েন্দা প্রতিবেদন দেখানো হয়। এর সঙ্গে ছিল টেপে ধারণকৃত শেখ মুজিবের কণ্ঠ। মুজিব বলছেন, 'আমার লক্ষ্য বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। নির্বাচন হয়ে গেলে আমি এলএফও ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলব। নির্বাচনের পর কে আমাকে চ্যালেঞ্জ করবে?' ইয়াহিয়া মুজিবের

কণ্ঠস্বর শনাক্ত করতে পারলেন। বক্তব্যের সারমর্ম শুনে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। পরদিন সকালে অধ্যাপক চৌধুরী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে ইয়াহিয়া বলেন, 'মুজিব যদি বেইমানি করে, আমি তাকে দেখে নেব।' মনে হলো ইয়াহিয়ার একাধিক পরিকল্পনা আছে, যেমনটি আছে মুজিবেরও।[১২]

শেখ মুজিব সেনাশাসনকে শুধু অপছন্দই করতেন না, তিনি এটিকে রীতিমতো ঘৃণা করতেন। ২৬ অক্টোবর (১৯৬৯) শেখ মুজিব কয়েক দিনের জন্য লন্ডন সফরে যান। সবাই জানত তিনি আগরতলা মামলা চলাকালে প্রবাসী বাঙালিদের এবং তাঁর কৌসুলি স্যার টমাস উইলিয়ামকে কৃতজ্ঞতা জানাতে লন্ডনে যাচ্ছেন। যাওয়ার আগে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর নীলক্ষেত-বাবুপুরা ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আজিমপুর-নিউ পল্টন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম তালুকদারকে ইঙ্গিতে বলেন, 'লাল ফিতা পেলেই ধরবে।' লাল ফিতা বলতে তালুকদার বুঝলেন পাঞ্জাবি সেনা। ৩ নভেম্বর তালুকদার নীলক্ষেতে তাঁর অফিসে বসে কাজ করছিলেন। সেখানে মন্টু, খসরু এবং আরও কয়েকজন ছিলেন। খবর এল, নিউমার্কেটের ভেতরে সেনা ঢুকেছে। কয়েকজনের গায়ে ইউনিফর্ম, বাকিরা সাদাপোশাকে। তখন বেলা ১১টা। নিউমার্কেটের ১ নম্বর ও ২ নম্বর গেটের মাঝামাঝি জায়গায় তাঁদের ওপর অতর্কিতে হামলা হলো। পিটিয়ে এবং ছুরি মেরে কয়েকজনকে হত্যা করা হয়।[১৩] পিলখানায় ইপিআর সদর দপ্তরে আয়োজিত মীনাবাজার দেখে ওই অবাঙালি সেনারা ফিরে আসছিলেন। ১৪ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার ভাষ্য অনুযায়ী দুজন ননকমিশন্ড অফিসার (এনসিও) 'আওয়ামী লীগের গুন্ডাদের' ছুরির আঘাতে নিহত হয়েছিলেন।[১৪]

লালবাগ থানায় মামলা হলো। আসামি চারজন। তাঁরা হলেন নুরুল ইসলাম তালুকদার (হুকুমের আসামি), মোস্তফা মহসীন মন্টু, কামরুল আলম খান খসরু ও সেলিম জাহান (মন্টুর বড় ভাই)। প্রথমে গ্রেপ্তার হন নুরুল ইসলাম তালুকদার। '৭০ সালের মাঝামাঝি ইকবাল হল ঘেরাও করে মন্টু ও সেলিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই সময় খসরু ছাদে পানির ট্যাঙ্কের মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন বলে গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছিলেন। তালুকদারকে পার্লামেন্ট ভবনে (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়) স্থাপিত সামরিক আদালতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির করা হয়। বিচারক ছিলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, মেজর তিরমিজি ও মেজর দেলোয়ার হোসেন বাট। তালুকদার তিরমিজি ও বাটের সঙ্গে আপসরফা করলেন। প্রচুর টাকার বিনিময়ে তিনি মামলা থেকে খালাস পান। এয়ারপোর্টের কাছে ফলের দোকানে টাকা লেনদেন হতো। তালুকদার টাকা দিতে দিতে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। খসরু, মন্টু ও সেলিমের ১৪ বছরের সশ্রম

কারাদণ্ড হয়। শেখ মুজিব তাঁদের বাঁচানোর যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। তিনি এত দূর পর্যন্ত বলেছিলেন, যে তারিখে এ ঘটনা ঘটে সেই দিন অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এমনকি গভর্নর আহসানও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা তখন বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা উপদ্রুত ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকা সফর করছিলেন।[১৫] পাকিস্তানি সেনা হত্যার মধ্য দিয়ে একটি ঝড়ের আভাস পাওয়া যায়। মনে হয়, আগামী দিনে অনেক রক্তারক্তি ঘটবে।

৫ ডিসেম্বর (১৯৬৯) সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুদিবসে তাঁর সমাধি প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভায় শেখ মুজিব একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন। *ইত্তেফাক*-এ ছাপা হওয়া সংবাদটি ছিল :

> একসময় দেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে...আমি ঘোষণা করিতেছি—আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।[১৬]

এ সময় আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ দুজন নেতা দল থেকে ছিটকে পড়েন। আমেনা বেগম ১৯৬৬-৬৮ সালে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আওয়ামী লীগের দুঃসময়ের কান্ডারি ছিলেন। ১৯৬৯ সালের শেষ দিকে তিনি দল থেকে বহিষ্কৃত হন। শাহ আজিজুর রহমান ছিলেন ১৯৬৫-৬৯ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের উপনেতা এবং আওয়ামী লীগ সংসদীয় গ্রুপের মুখপাত্র। তিনিও পদত্যাগ করেন। এ সময় আতাউর রহমান খান পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ (পাকিস্তান জাতীয় লীগ) তৈরি করলে আমেনা বেগম ও শাহ আজিজ এই নতুন দলে যোগ দেন।

১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্য রাজনীতির ওপর থেকে বিধিনিষেধ উঠে যায়। ঢাকায় আওয়ামী লীগের প্রথম জনসভাটি হয় পল্টন ময়দানে ১১ জানুয়ারি। মঞ্চের সামনে খুব বড় করে লেখা ছিল 'জয় বাংলা'। দুটি কাঠের তক্তার ওপর আলাদা করে শব্দ দুটি লিখে মঞ্চের সামনে পেরেক ঠুকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সিরাজুল আলম খানের উদ্যোগে ও পরামর্শে 'বিজ্ঞাপনী'র শিল্পী কামাল আহমেদ এটি ডিজাইন করেছিলেন। 'বিজ্ঞাপনী'র মালিক ছিলেন সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি মাযহারুল হক বাকী। সভা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়ার আগে মঞ্চে দাঁড়িয়ে সিরাজুল আলম খান বেশ কয়েকবার 'জয় বাংলা' স্লোগানটি দেন। আওয়ামী লীগের কোনো নেতা মঞ্চে স্লোগানটি উচ্চারণ করেননি।[১৭] সভা শেষ হয়ে যাওয়ার পর মাযহারুল হক বাকী ও কামাল আহমেদ গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা করতে থাকেন। তাঁদের নিরাপত্তার কথা ভেবে সিরাজুল আলম খান মাঝরাতে একটি গাড়ির ব্যবস্থা করেন। গাড়ি তাঁদের দুজনকে কুমিল্লার একটি বাড়িতে পৌঁছে দেয়। বাড়িটির দেয়ালে 'শর্মা

Staff Officer
M L HQ Sector 1
Assembly Building
DACCA

POLICE REPORT - BAIL PETITIONS

..........Lalbagh..........PS Case No. 3(11)69

Part - 1

(Part I of this report must be completed and returned to Staff Officer ML HQ Sector - 1 within three days. OC PS concerned will submit his written explaination if report is delayed beyond 3 days).

1. Name of the accused — Nurul Islam Talukdar
2. Father's name — late Eliumuddin Talukdar
3. Age — About 30 years
4. Address — 10/4, Tallabagh P.S. Tejgaon Dacca
5. Arrested on — 21/11/69 (Date)
6. May be charged undere PPC Sec MLR — The prima facie charge under section 302 P.P.C. has not yet been established.
7. Probable date by which charge sheet will be submitted. — The investigation is still in progress and the probable date for charge-sheet in this case can not be committed.
8. Details of movable/immovable property — The accd has a two storied pucca-building at 10/4 Tallabagh under P.S. Tejgaon [illegible]
9. Probability of absconding — NO. (Yes/No)
10. Will his freedom on bail affect the course of investigation — No (Yes/No)
11. Does his name appear in FIR as an accused. — No
12. The alleged offence is bailable under civil law.. — No (Yes/No)
13. Recommendations.
   a. Bail is recommended.
   ~~b. Bail is not recommended.~~
   (Delete which ever is not applicable).

ঢাকার নিউ মার্কেটে পাকিস্তানি সেনা হত্যার দায়ে অভিযুক্ত আওয়ামী লীগের নেতা নুরুল ইসলাম তালুকদারের জামিনের আবেদন

কেমিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড' নামে একটি সাইনবোর্ড ছিল। সেখানে তাঁরা তিন দিন আত্মগোপন করে ছিলেন।[১৮]

১৯৭০ সালের ৪-৫ জুন ঢাকায় হোটেল ইডেন প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে ১ হাজার ১৩৮ জন

কাউন্সিলর যোগ দেন। আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ করা ঠিক হবে কি না, তা নিয়ে অধিবেশনে আলোচনা ও বিতর্ক হয়। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ আজিজের অনুসারী একটি গ্রুপ এলএফওর অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার পক্ষে মত দেয়। অন্যদিকে জহুর আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্বে অন্য একটি গ্রুপ নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে মত দেয়। শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়। সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে অবশ্য বলা হয়, আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনে কোনো ঐক্যজোটে যাবে না। অধিবেশনে দলের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দেওয়া ৪০ মিনিটের বক্তৃতায় বলেন:

> বাঙালি জাতির মুক্তির আন্দোলনে আওয়ামী লীগকে একাই লড়ে যেতে হবে। আওয়ামী লীগের কোনো বন্ধু নেই। ছয় দফা কর্মসূচিকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য রাজনৈতিক দলগুলো সমর্থন করেনি। এমনকি গোলটেবিল বৈঠকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়নি।...হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী লীগে দলাদলির কোনো স্থান নেই। ক্ষমতার জন্য যাঁরা এসেছেন তাঁরা চলে যেতে পারেন। কারণ, আওয়ামী লীগ ক্ষমতার রাজনীতি করে না। আওয়ামী লীগ চায় জনগণের মুক্তি। ছয় দফা জনগণের মুক্তিসনদ। এই ছয় দফার জন্য প্রয়োজনে সবকিছু ত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত আছি। আপনারাও যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকবেন। যেকোনো ধরনের ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আমি আপস করব না। চারদিক থেকে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। সাবধান।[১৯]

কাউন্সিলে শেখ মুজিব তৃতীয়বারের মতো দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে অন্য যাঁরা নির্বাচিত হন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সহসভাপতি: সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও খন্দকার মোশতাক আহমদ; সাধারণ সম্পাদক: তাজউদ্দীন আহমদ; সাংগঠনিক সম্পাদক: মিজানুর রহমান চৌধুরী; প্রচার সম্পাদক: আবদুল মমিন; দপ্তর সম্পাদক: মুহম্মদুল্লাহ; শ্রম সম্পাদক: জহুর আহমদ চৌধুরী; সাংস্কৃতিক সম্পাদক: বেগম বদরুন্নেসা আহমদ; সমাজসেবা সম্পাদক: কে এম ওবায়দুর রহমান এবং কোষাধ্যক্ষ: মোহাম্মদ মহসিন। আসন্ন নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার জন্য সভাপতিকে প্রধান করে একটি পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করা হয়।

সম্মেলন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের জন্য নতুন একটি কর্মসূচি তৈরি করা হয়। তাজউদ্দীন আহমদ খসড়াটি সম্পাদনা করেন এবং শেখ মুজিবের সঙ্গে পরামর্শ করে তা চূড়ান্ত করা হয়। ৬ জুন কাউন্সিল সভায় কর্মসূচিটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়।[২০]

এই কর্মসূচি তৈরির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন ওই সময়ে ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক মোহাম্মদ আনিসুর রহমান। ১৯৭০ সালের মার্চে পাকিস্তানের ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিল চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরির কাজে অংশ নেওয়ার জন্য অর্থনীতিবিদদের একটি প্যানেল গঠন করে। প্যানেলের

বাঙালি সদস্যদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক আনিসুর রহমান, অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, ড. আখলাকুর রহমান ও ড. আজিজুর রহমান খান। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে দুই অঞ্চলের অর্থনীতিবিদদের একমত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। প্যানেলের সদস্যরা দুই ভাগ হয়ে আলাদা আলাদা রিপোর্ট তৈরি করেন। আনিসুর রহমানের মন্তব্য ছিল, 'আমি দেয়ালের লিখন পড়েছিলাম। মনে আছে প্যানেলের শেষ বৈঠকে পশ্চিম পাকিস্তানি সহকর্মীদের বিদায় জানিয়ে আমি বলেছিলাম, দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তোমরা রাজি হলে না। তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা করতে হলে আমাদের ভিসার প্রয়োজন হবে।'[২১]

এই প্যানেলে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে বাঙালি অর্থনীতিবিদদের উপলব্ধি হয় যে তাঁরা শেখ মুজিবকে অর্থনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন। অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, ড. আজিজুর রহমান খান, অধ্যাপক আনিসুর রহমান ও স্বদেশ রঞ্জন বোস একসঙ্গে বসে একটি 'অর্থনৈতিক ম্যানিফেস্টো' তৈরি করেন। শেখ মুজিবের কাছে এই ম্যানিফেস্টো পৌঁছে দেওয়া হয়। আনিসুর রহমান ঘনায়মান সংকট সম্পর্কে বলেন :

> পশ্চিম পাকিস্তানি বন্ধুরা আমাকে পশ্চিম পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। তাঁদের একজন আমাকে বলেছিলেন, জেনারেলরা বসে ঠিক করেছেন কোনো অবস্থাতেই পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে এই প্রদেশকে 'ইন্দোনেশিয়া' বানানো হবে, মানে দশ লাখ লোককে মারা হবে, যেমনটি হয়েছিল ইন্দোনেশিয়ায়। এক ব্যক্তিগত সফরে ঢাকায় গিয়ে আমি শেখ মুজিবকে এ কথা জানিয়েছিলাম। স্বভাবসুলভ আত্মবিশ্বাসী ঢঙে তিনি বলেছিলেন, 'ডাক্তার সাহেব, আমি জানি।'[২২]

৬ জুন (১৯৭০) নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে সভাপতি এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন সহসভাপতি : কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ, মাস্টার খান গুল ও ব্যারিস্টার বরকত আলী সালমী; যুগ্ম সম্পাদক : মোহাম্মদ খান রহমানী ও শামসুল হক; সাংগঠনিক সম্পাদক : সৈয়দ খলিল আহমদ তিরমিজী; প্রচার সম্পাদক : আবদুল মান্নান; শ্রম সম্পাদক : মালিক ফররুখ শিয়ার আওয়াল; সমাজসেবা ও সংস্কৃতি সম্পাদক : মোস্তফা সরোয়ার; দপ্তর সম্পাদক : শফিউল আলম; কৃষি সম্পাদক : সৈয়দ এমদাদ মোহাম্মদ শাহ; মহিলা সম্পাদক : বেগম নুরজাহান মুরশিদ এবং কোষাধ্যক্ষ : অধ্যাপক হামিদুর রহমান। একচেটিয়া পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, জমিদারি, জায়গিরদারি, সরদারি প্রথা বাতিল করে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশব্যাপী সাম্যবাদী অর্থনীতি চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তার কর্মসূচি ঘোষণা করে।[২৩] কাউন্সিলের শেষ অধিবেশনে শেখ মুজিব দলে

নবাগত দুজনকে উপস্থিত কাউন্সিলরদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁরা হলেন ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি ও ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তোফায়েল আহমেদ এবং শেরেবাংলা ফজলুল হকের ছেলে ফায়জুল হক। আওয়ামী লীগের এই কাউন্সিল সভায় ছাত্রলীগের সাবেক দুই সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খান প্রথমবারের মতো কাউন্সিলর হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন।[২৪]

১৯৭০ সালের ৭ জুন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচারকাজ শুরু করেন। জনতার প্রতি আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি যদি কলাগাছকে নমিনেশন দিই, আপনারা তাকেই ভোট দেবেন।' উল্লেখ্য, ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় ভারতের মুসলমানদের অনুরোধ করা হয়েছিল, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ যদি ল্যাম্পপোস্টকেও মনোনয়ন দিয়ে থাকে, তাকেই যেন ভোট দেওয়া হয়। ওই নির্বাচনকে মুসলিম লীগ বলেছিল যে এটি পাকিস্তান প্রশ্নে 'গণভোট'। ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে আওয়ামী লীগ ছয় দফার পক্ষে গণভোট হিসেবে প্রচার করে। বক্তৃতার একপর্যায়ে শেখ মুজিব জুতসই রূপক ব্যবহার করে একটি লোকজ কবিতার দুটি লাইন উদ্ধৃত করেন:

বারবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান
এইবার ঘুঘু তোমার বধিব পরান।

এই ঘুঘু হলো পশ্চিম পাকিস্তানি শোষক এবং তাকে নির্মূল করার ঘোষণা দিয়ে শেখ মুজিব তাঁর আসল বার্তাটি দিয়ে দিলেন।

রেসকোর্সের জনসভায় শেখ মুজিব সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ছয় পয়সা দামের একটি পোস্টকার্ড যার যার গ্রামে পাঠিয়ে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিন।' বিনয়ের সঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি নেতা নই, কর্মী। নেতা ওই যে ঘুমিয়ে আছেন—শেরেবাংলা আর সোহরাওয়ার্দী।' তিনি ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী 'আইয়ুব নগর' এখন থেকে হবে 'শেরেবাংলা নগর', রেসকোর্স হবে 'সোহরাওয়ার্দী উদ্যান'। সমমনা অন্যান্য রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মোজাফফর আহমদ অনেক দিন ধরেই নির্বাচনী ঐক্যের প্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন। শেখ মুজিব ঘোষণা দিলেন, 'নেতার ঐক্য চাই না, চাই জনতার ঐক্য।' আরও বলেন, 'সাইনবোর্ড পাল্টে আওয়ামী লীগে চলে আসুন।' এই জনসভায় শেখ মুজিব নিজ কণ্ঠে প্রথমবারের মতো 'জয় বাংলা' স্লোগান উচ্চারণ করেন। একই সঙ্গে তিনি জয় পাঞ্জাব, জয় সিন্ধু, জয় সীমান্ত প্রদেশ, জয় বেলুচিস্তান এবং জয় পাকিস্তান স্লোগান দেন।[২৫]



১৯৭০ সালের ২০ আগস্ট আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ ইয়ার মোহাম্মদ খানের বড় মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে মওলানা ভাসানী,. শেখ মুজিব ও অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী

৭ জুন রেসকোর্সে বক্তৃতা দেওয়ার আগে শেখ মুজিব ছয় দফার প্রতীক হিসেবে ছয়টা পায়রা ওড়ান। পাঁচটি ওড়ে, একটি ডানা ঝাঁপটাতে ঝাঁপটাতে তাঁর হাতেই ফিরে আসে। দৈনিক *পূর্বদেশ*-এ আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী তাঁর 'তৃতীয় মত' কলামে মন্তব্য করেন, তাহলে কি ইয়াহিয়ার পাঁচ দফাই (এলএফও) টিকে থাকবে? শুরু হয় কলম লড়াই। *ইত্তেফাক*-এ খন্দকার আবদুল হামিদ 'স্পষ্টভাষী' নামে তাঁর কলামে গাফ্ফার চৌধুরীর সমালোচনা করেন। গাফ্ফার চৌধুরী এর জবাব দেন, খন্দকার হামিদ আবার লেখেন। গাফ্ফার চৌধুরী শেষমেশ খন্দকার হামিদকে ছেড়ে শেখ মুজিবের কড়া সমালোচনা করে লেখেন, শেখ মুজিব পলায়নমুখী মানসিকতার রাজনীতিবিদ, সব সময় বাক্স-পেটরা গুছিয়ে গ্রেপ্তারের আশায় বসে থাকেন। গাফ্ফার চৌধুরী সম্ভবত *পূর্বদেশ*-এর মালিক পিডিপি নেতা হামিদুল হক চৌধুরীকে খুশি করার জন্য এ মন্তব্য করেছিলেন।

বিরোধীদের নানা রকম প্রচারণা সত্ত্বেও শেখ মুজিব তত দিনে দেশের সবচেয়ে বড় নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন। তাঁর চেয়ে যাঁরা বয়সে বড় ও রাজনীতিতে জ্যেষ্ঠ এবং যাঁরা তাঁর সমসাময়িক, সবাইকে ছাড়িয়ে তিনি তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। তিনি এ দেশের সাধারণ মানুষকে বোঝাতে পেরেছিলেন, 'আমি তোমাদেরই লোক।'

এ দেশের গরিব মানুষেরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তাদের শ্রেণিভুক্ত মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মূল্যায়নটি প্রাসঙ্গিক :

> শেখ মুজিব মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকেই এসেছিলেন। উচ্চমধ্যবিত্ত নয়, নিম্নমধ্যবিত্ত। প্রথম যখন ঢাকায় আসেন শহরে তাঁর থাকার কোনো স্থায়ী ঠিকানা ছিল না। কিন্তু ওই শ্রেণিতে তিনি আটকে থাকেননি, বের হয়ে গেছেন, বের হয়ে গিয়ে পরিণত হয়েছেন জনগণের নেতাতে, তাঁর জোরটা ছিল ওখানেই। কেবল মধ্যবিত্তের হলে ব্যক্তিগতভাবে উঠতেন নিশ্চয়ই, কিন্তু মহাকাব্যের নায়ক হতে পারতেন না।[২৬]

নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন করা নিয়ে আওয়ামী লীগের প্রধান চিন্তা ছিল, দলকে জেতাতে হবে। ওই সময় যাঁরা আওয়ামী লীগের জেলা ও তৃণমূলের নেতা ছিলেন, তাঁরা অনেকেই পারিবারিকভাবে সচ্ছল ছিলেন না। যাঁরা মুসলিম লীগের রাজনীতি করেছেন, তাঁরা ছিলেন তুলনামূলকভাবে সম্পদশালী। এ নিয়ে আওয়ামী লীগের কৌশল সম্পর্কে একটি বিবরণ পাওয়া যায় চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৯৫৪ ও ১৯৬২ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য বেগম তোহফাতুন্নেসা আজিমের ছেলে আরিফ মইনুদ্দীনের কাছ থেকে। চট্টগ্রামে মনোনয়ন দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> বঙ্গবন্ধু আমার আম্মাকে বলেছিলেন, আপনার মেয়ের জামাই তানভির আহমদ সিদ্দিকীকে আওয়ামী লীগে নিয়া আসেন। আমি তাঁকে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে নমিনেশন দিব। আমি আর আম্মা গেলাম তানভির সিদ্দিকীর বাসায়। উনার নিক নেম নেপোলিয়ন। আম্মা বললেন, 'নেপু, আমাকে তো মুজিবুর বলল, তোমাকে নমিনেশন দিবে। তুমি চলে আসো।' তানভির সিদ্দিকী এনএসএফের ফাউন্ডার ট্রেজারার ছিলেন। বললেন, 'দেখেন আম্মা, আমি তো আওয়ামী লীগে জয়েন করতে পারি না। আমি ইন্ডিপেনডেন্ট ইলেকশন করব।' আম্মা বললেন, 'না তুমি ইন্ডিপেনডেন্ট করলে পারবা না। ছয় দফা অনেক ভোট পাবে এবং ছয় দফা পাওয়ারে আসবে।'
>
> উনি আম্মার কথা শুনলেন না। সাত-আট দিন পর আমি আর আম্মা গেলাম চট্টগ্রামে, এয়ারপোর্টে বঙ্গবন্ধুকে সি-অফ করতে। উনি চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু আম্মাকে দেখে দাঁড়ায়া গেলেন। বললেন, 'আপা, কী হলো, আপনার জামাই?' আম্মা বললেন, 'মুজিবুর, ও তো নাকি ইন্ডিপেনডেন্ট ইলেকশন করবে।' বঙ্গবন্ধু দুই সেকেন্ড থেমে বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে আমি ওকে ডিফিট দিয়া দিব।' উনি ঠিকই শামসুল হক সাহেবকে দিয়ে তানভির সিদ্দিকীকে ডিফিট দিলেন।
>
> চট্টগ্রামে দেখলাম, এম এ আজিজ ফটিকছড়িতে মীর্জা আবু মনসুরকে প্রাদেশিক পরিষদে নমিনেশন দিলেন। মির্জা আবু মনসুরের বাবা মির্জা আবু

আহমেদ ইস্ট পাকিস্তান অ্যাসেম্বলিতে সিক্সটি টু ও সিক্সটি ফাইভে মুসলিম লীগের এমপি ছিলেন। আতাউর রহমান কায়সার সাহেবকে এম এ আজিজ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে দিলেন। তাঁর আব্বা ক্যাপ্টেন ইয়ার আলী খান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে মুসলিম লীগের মেম্বার ছিলেন।

চট্টগ্রামে নমিনেশনে আমি যা দেখলাম, পুরা এম এ আজিজ সাহেবের চয়েস। বঙ্গবন্ধুর নমিনেশনের ফারসাইটেডনেস—মুসলিম লীগকে ভাঙতে হবে, আওয়ামী লীগকেও জিতাইতে হবে।

চট্টগ্রামে মহিলা নমিনেশন হবে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে। আম্মা বললেন, 'আজিজ দেখিস, ন্যাশনালে যেন আমার সিটটা থাকে।' তুই করে বলতেন আম্মা। উনি বললেন, 'চাচি, আপনি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে আর সাজ্জনি (সাজেদা চৌধুরী) প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলিতে যাবে।' এম এ আজিজ সাহেব মারা যাওয়ায় এটি আর হয়নি।[২৭]

এ সময় আওয়ামী লীগের একটা নির্বাচনী পোস্টার সাধারণ মানুষের মধ্যে তুমুল আলোড়ন তোলে, যা হাজারটা বক্তৃতায়ও সম্ভব হতো না। 'সোনার বাঙলা শ্মশান কেন' শিরোনামে এই রঙিন পোস্টারটি তৈরি করেন আওয়ামী লীগের কর্মী নূরুল ইসলাম। এটি এঁকেছিলেন শিল্পী হাশেম খান।[২৮] পোস্টারে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অসাম্যের ভয়াবহ রূপ ফুটে উঠেছিল।

এই পোস্টারের একটি বাস্তব ভিত্তি ছিল। ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ছিল ২৮৮ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৩৫১ টাকা, অর্থাৎ বৈষম্যের হার ছিল ২১ দশমিক ৯ শতাংশ। ১৯৬৯-৭০ সালে মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানে বেড়ে হয় ৩৩১ টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে হয় ৫৩৩ টাকা। বৈষম্যের হার তিন গুণ বেড়ে হয় ৬১ শতাংশ। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো ছিল ভোগ্যপণ্যের উচ্চমূল্য। পাকিস্তান অর্থনৈতিক সমীক্ষার (১৯৬৯-৭০) তথ্য অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে এক মণ চালের দাম ছিল ৪২ টাকা ৩৭ পয়সা। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে ২২ টাকা মণ দরে চাল পাওয়া যেত। সামাজিক অবকাঠামোর মধ্যেও বৈষম্য ছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে ২৮ হাজার ২২৫টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৩৩ হাজার ২৭১টি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও ছিল অনেক ফারাক। ওই বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রসংখ্যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে ৯ হাজার ৯৮৪ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪ হাজার ৪২৫ জন।[২৯]

প্রার্থী মনোনয়নের পর দেখা গেল সবাই কলাগাছ নন। জাতীয় পরিষদের জন্য আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে ৪৭.৫৩ শতাংশ ছিলেন আইনজীবী, ১৯.১৩ শতাংশ ব্যবসায়ী, ৭ শতাংশ জোতদার এবং ৬.১৭ শতাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। প্রার্থীদের ৮১.৪৩ শতাংশ ছিলেন ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রিধারী, যার মধ্যে ৬১ শতাংশ ছিল স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। বয়সের দিক থেকে

প্রার্থীদের অধিকাংশ ছিলেন তরুণ কিংবা মধ্যবয়সী। মাত্র ২০ শতাংশ প্রার্থীর বয়স ছিল পঞ্চাশের বেশি এবং ৩২ শতাংশের বয়স ছিল চল্লিশের নিচে।[৩০]

সরকার বেতার ও টেলিভিশনে জাতীয় নেতাদের প্রাক-নির্বাচনী ভাষণ

সোনার বাঙলা শ্মশান কেন?

বৈষম্য বিষয়	বাঙলাদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরী	শতকরা ১৫ জন	শতকরা ৮৫ জন
সামরিক বিভাগে চাকরী	শতকরা ১০ জন	শতকরা ৯০ জন
চাউল মণ প্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণ প্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তৈল সের প্রতি	৫ টাকা	২.৫০ পয়সা
স্বর্ণ প্রতি ভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

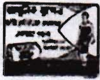
হাশেম খানের আঁকা বিখ্যাত পোস্টার ‘সোনার বাঙলা শ্মশান কেন?’

প্রচারের ব্যবস্থা করে। রাজনৈতিক দলের নামের ইংরেজি বানানের প্রথম অক্ষরের ক্রম অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের রেকর্ডকৃত ভাষণটি সবার আগে ২৮ অক্টোবর (১৯৭০) প্রচার করা হয়। ৩০ মিনিটের এ ভাষণের খসড়া তৈরি করেছিলেন ড. কামাল হোসেন, রেহমান সোবহান ও তাজউদ্দীন আহমদ।[৩১] ভাষণে দেওয়া দলের প্রতিশ্রুতিগুলো ছিল :

ক) প্রকৃত কৃষকের স্বার্থে গোটা ভূমিব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস;
খ) যমুনা নদীর ওপর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেতু নির্মাণ এবং সিন্ধু, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও কর্ণফুলীর ওপর সেতু নির্মাণ;
গ) প্রতি ইউনিয়নে একটি করে পল্লি চিকিৎসাকেন্দ্র এবং থানা সদরে হাসপাতাল স্থাপন;
ঘ) জাতীয় উৎপাদনের ন্যূনতম ৪ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয়;
ঙ) কোরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন তৈরি না করা;
চ) স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ;
ছ) ফারাক্কা বাঁধজনিত সমস্যার ন্যায়সংগত সমাধান;
জ) ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন;
ঝ) জাতীয়করণের মাধ্যমে ব্যাংক ও বিমা কোম্পানিগুলোকে জনগণের মালিকানায় আনা;
ঞ) উপজাতীয় এলাকা উন্নয়নের ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো;
ট) জাতীয় জীবনের সঙ্গে মোহাজেরদের একাত্ম করা।[৩২]

নির্বাচনী প্রচারে অভিযোগ, গালাগাল, চরিত্রহনন সবই ছিল। ভুট্টো অভিযোগ করলেন, মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর এজেন্ট এবং নির্বাচন নিয়ে তিনি ষড়যন্ত্রে মেতেছেন। জামায়াতে ইসলামী চীনের দিকে তর্জনী তুলে বলল, মাও সেতুং নির্বাচনে পিপলস পার্টির পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করছেন। ইসলামাবাদে মার্কিন ও চীনা রাষ্ট্রদূত এসব প্রচারণায় বিচলিত হন। পররাষ্ট্রসচিব সুলতান খান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে অনুযোগ করেন, বিদেশিদের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার তাঁদের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। ইয়াহিয়া ব্যাপারটি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। জামায়াতের চীনবিরোধী প্রচার থেমে যায়। কিন্তু ভুট্টো মুখ বন্ধ করেননি।[৩৩]

এ সময় উপকূলীয় অঞ্চলে এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। ১২ নভেম্বর রাতে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়। এদের সংখ্যা সঠিকভাবে কখনোই জানা যায়নি। মার্কিন ত্রাণ সংস্থাগুলোর অনুমান, ঝড়ে কমপক্ষে ২ লাখ ৩০ হাজার মানুষ মারা গেছে, যা কিনা দুর্গত এলাকার জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ছিল ৫ লাখ।[৩৪] লাখ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে, গবাদিপশু সব ভেসে



ইত্তেফাক

এদেশের মানুষের জন্য আওয়ামীলীগ কি চায়–

রেডিও টেলিভিশনে শেখ মুজিব কর্তৃক জাতির উদ্দেশে নিজ দলের কর্মসূচী ব্যাখ্যা



দুই শত ২৩ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার

অভূতপূর্ব প্রাণবন্যা।

বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত শেখ মুজিবের প্রাক-নির্বাচনী ভাষণের ছাপা হওয়া সংবাদ

যায়। এক রাতের মধ্যেই অনেক মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। দুর্গত এলাকায় উদ্ধারকাজ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা ছিল দুর্বল ও অগোছালো। প্রদেশে মাত্র একটি হেলিকপ্টার ছিল, যা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের চলাচলের জন্যই ব্যবহৃত হচ্ছিল। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে ৫৯টি হেলিকপ্টার অলস বসে ছিল।[৩৫]

ঘূর্ণিঝড়ের সময় ইয়াহিয়া এক সফরে চীনে ছিলেন। ফেরার পথে তিনি ঢাকায় এলেন। কিন্তু দুর্গত এলাকা সফর না করেই তিনি ইসলামাবাদে ফিরে যান। ফলে তিনি প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়েন। ২৬ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের সমালোচনা করে বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের এই দুর্দিনে ওরা কেউ দেখতেও আসেনি। এটি প্রকৃতপক্ষে ঠান্ডা মাথায় খুন। তাদের চরম শাস্তি হওয়া দরকার। আমার ক্ষমতা থাকলে আমি তাদের বিচার করতাম। কোটিপতি বস্ত্রকল মালিকেরা এক গজ কাপড় দিয়েও সাহায্য করেনি। ওদের এত বড় সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও লাশ দাফন করতে ব্রিটিশ মেরিনদের সাহায্য নিতে হয়েছে।' শেখ মুজিব আরও বলেন যে এই ছুতোয় নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা হলে গৃহযুদ্ধ বাধবে। পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাবে। ১০ লাখ মানুষ ইতিমধ্যে প্রাণ হারিয়েছে। প্রয়োজনে আরও ১০ লাখ মানুষ জীবন দেবে।[৩৬]

বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছিল। ইয়াহিয়া অবশ্য নির্বাচন পেছানোর দাবি মেনে নেননি। শুধু দুর্গত এলাকার ৯টি জাতীয় পরিষদের এবং ২১টি প্রাদেশিক পরিষদের আসনে নির্বাচনের তারিখ

পিছিয়ে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি ঠিক করা হয়। প্রাদেশিক ন্যাপের সভাপতি মোজাফফর আহমদ সরকারের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন। ২৯ নভেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'কোন যুক্তিতে ও কী উদ্দেশ্যে সরকার ৭ ডিসেম্বর তারিখেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা দুষ্কর।...যে সকল দল নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি তুলিয়া গণবিরোধী সরকারের ওই অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত লইতে সাহায্য করিয়াছে তাহারাও যে পূর্ব বাংলার লাখ লাখ দুর্গত মানুষকে রক্ষা করার চাইতে মন্ত্রিত্বের গদিকে বড় মনে করে, তাহাও তাহাদেরই দাবি হইতে জনগণের নিকট পরিষ্কার হইয়াছে।'[৩৭]

নির্বাচনে তাঁর দলের যে খুব সুবিধা হবে না, মওলানা ভাসানী সেটি বুঝতে পেরেছিলেন। ঘূর্ণিঝড়ের অজুহাত তুলে তিনি নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন। আতাউর রহমান খানের দল পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগও নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেয়। তিনিও দেয়ালের লেখা পড়তে পেরেছিলেন।

নির্বাচন নিয়ে সারা দেশে ছিল প্রচণ্ড উৎসাহ। কেননা এর আগে সারা দেশে কোনো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ভোটার হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স ছিল ২১ বছর। তবে অনেক কম বয়সী তরুণ বয়স বাড়িয়ে ভোটার হয়েছিলেন। সর্বত্র ছিল উৎসবের আমেজ। নির্বাচন নিয়ে কূটনীতিকদের মধ্যেও ছিল প্রবল আগ্রহ ও কৌতূহল। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

মার্কিন দূতাবাসের কর্মীরা নিজেদের মধ্যে একটি লটারির আয়োজন করেছিল। প্রত্যেকে ১০ টাকা করে জমা দেয়। প্রশ্ন ছিল, কোন দল কত পারসেন্ট আসন পাবে? ঢাকাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের অনুমান ছিল পিপলস পার্টি ও আওয়ামী লীগ নিজ নিজ প্রদেশে ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ আসন পাবে। তাঁর নিজস্ব ধারণা ছিল, আওয়ামী লীগ পাবে ৮৫ শতাংশ। ফলাফল ঘোষণার পর দেখা গেল, ইসলামাবাদ অফিসের এক নারী কর্মকর্তার পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে পূর্বাভাস সবচেয়ে কাছাকাছি হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাপারে ঢাকার একজন কর্মকর্তার পূর্বাভাস সবচেয়ে কাছাকাছি ছিল। নির্বাচনের দুদিন আগে আর্চার ব্লাডের সঙ্গে শেখ মুজিবের দেখা হয়। মুজিব ছিলেন অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। তিনি জানালেন, পিডিপির নুরুল আমিন এবং স্বতন্ত্র চাকমা প্রার্থী ত্রিদিব রায় ছাড়া বাকি সব আসন আওয়ামী লীগ পাবে।[৩৮] অথচ অক্টোবরের ২১ তারিখ আর্চার ব্লাড তাঁর সহকর্মী বব কার্লকে নিয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে মুজিব বেশ আস্থার সঙ্গেই বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৪০টি পাবে। এর সঙ্গে যোগ হবে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৭টি আসন, যার সবই আওয়ামী লীগ পাবে। এ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ চার থেকে ছয়টি আসন পেতে

পারে। সেখানে আওয়ামী লীগের আটজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে অন্তত ১০ জন তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে পারেন বলে মুজিব আশা করেন। ফলে তাঁর পক্ষে সরকার গঠন করা সম্ভব হবে। পূর্ব পাকিস্তানে অন্য কোনো দল পাঁচটির বেশি আসন পাবে বলে তাঁর মনে হয় না।[৩৯] একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে ভোটের হিসাব-নিকাশ কত উল্টে দিতে পারে, তার প্রমাণ দুই মাস পরই পাওয়া গেল। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের দুটি ছাড়া সব আসনে বিজয়ী হলো।

আওয়ামী লীগের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে উত্থান ঘটেছিল, তা মোকাবিলা করার ক্ষমতা অনেক দলে বিভক্ত ডানপন্থীদের ছিল না। ১৬২টি নির্বাচনী এলাকার এক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১২৫টি এলাকায় আওয়ামী লীগবিরোধী ভোট একাধিক ডানপন্থী দলের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। ৪৮টি নির্বাচনী এলাকায় মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম ও পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির (পিডিপি) প্রার্থীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন এবং স্বায়ত্তশাসনপন্থীদের পুরো নজর ছিল আওয়ামী লীগের দিকে। মাত্র ২৪টি এলাকায় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে একজন প্রার্থী ছিলেন। নির্বাচনে বাম দলগুলোর প্রার্থীদের উপস্থিতি কম থাকায় আওয়ামী লীগ সুবিধা পেয়েছিল। ওয়ালি-ন্যাপের প্রার্থী ছিলেন ৩৬ জন। ভাসানী-ন্যাপের ১৫ জন এবং আতাউর রহমান খানের জাতীয় লীগের মাত্র ১৪ জন প্রার্থী ছিলেন। তাঁরা অবশ্য পরে নির্বাচন বর্জন করেছিলেন।[৪০]

পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৩৮টি আসনের মধ্যে ভুট্টোর পিপলস পার্টি পেল ৮১টি আসন। ভোট পড়েছিল ৫৭.৭ শতাংশ। মোট প্রদত্ত ভোটের ৩৮.৩ শতাংশ পেল আওয়ামী লীগ, ১৯.৫ শতাংশ পেল পিপলস পার্টি। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ৭৪.৯ শতাংশ, পাঞ্জাবে ০.০৭ শতাংশ, সিন্ধুতে ০.০৭ শতাংশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ০.২ শতাংশ এবং বেলুচিস্তানে ১ শতাংশ ভোট পেল। পক্ষান্তরে পিপলস পার্টি পাঞ্জাবে ৪১.৬ শতাংশ, সিন্ধুতে ৪৪.৯ শতাংশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৪.২ শতাংশ এবং বেলুচিস্তানে ২.৩ শতাংশ ভোট পেল। পূর্ব পাকিস্তানে পিপলস পার্টির কোনো প্রার্থী ছিল না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সবচেয়ে বেশি ভোট পায় জমিয়তে উলেমা ইসলাম (২৫.৪%)। বেলুচিস্তানে ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ সর্বাধিক ৪৫.১ শতাংশ ভোট পায়।[৪১]

৯ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের' ওপর গণভোটের দাবি জানান। মওলানা ভাসানীর কথায় ইয়াহিয়া গুরুত্ব দেননি। এ প্রসঙ্গে মার্কিন কনস্যুলেট জেনারেল আর্চার ব্লাডের মন্তব্য ছিল, বয়সের ভারে ন্যুব্জ নিষ্ফলা

রাজনীতিবিদ মওলানা ভাসানী তাঁর কাছ থেকে মুজিবের কাছে ছিনতাই হয়ে যাওয়া জনগণের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন।[৪২]

দুর্গত এলাকায় নির্বাচন হলো জানুয়ারিতে। ৯টি আসনের সবই আওয়ামী লীগ পেল। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেল ২৮৮টি আসন। একেই বলে ভূমিধস বিজয়। জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ৭টি সংরক্ষিত মহিলা আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেলেন নূরজাহান মুরশিদ, রাফিয়া আখতার ডলি, সাজেদা চৌধুরী, মমতাজ বেগম, রাজিয়া বানু, তসলিমা আবেদ ও বদরুন্নেসা আহমদ।[৪৩] প্রাদেশিক পরিষদের ১০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনে তখন পর্যন্ত মনোনয়ন দেওয়া হয়নি।

চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের নেতা এম এ আজিজ ও জহুর আহমদ চৌধুরীর মধ্যে রেষারেষি ছিল। নির্বাচনে এর প্রভাব পড়েছিল। বাঁশখালীতে প্রাদেশিক পরিষদের আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী জাকিরুল হক চৌধুরী পিডিপির মওলানা আহমদ সগিরের কাছে হেরে যান। কক্সবাজারে প্রাদেশিক পরিষদের একটি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন মোজাম্মেল হক। আওয়ামী লীগের স্থানীয় তরুণ নেতা মোস্তাক আহমদ চৌধুরী ওই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ান। তিনি জহুর আহমদ চৌধুরীর সমর্থন পেয়েছিলেন। নির্বাচনে মোস্তাক চৌধুরী জয়ী হন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে ছিলেন মুসলিম লীগ ও জামায়াতের প্রার্থী। মোজাম্মেল হকের স্থান ছিল চতুর্থ।[৪৪]

এত দিন চিন্তা ছিল নির্বাচন হবে কি হবে না। নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর ফলাফলে এমন মেরুকরণ হলো যে তা পাকিস্তানের ভিত্তিমূল রীতিমতো কাঁপিয়ে দিল। প্রমাণিত হলো, পাকিস্তানে জাতীয়ভিত্তিক কোনো রাজনৈতিক দল নেই। দুটি আঞ্চলিক দল এখন পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থান করছে। এটি ছিল একটি ঝড়ের পূর্বাভাস।

সেনাসদরের প্রভাবশালী একটি চক্র জেনারেল ইয়াহিয়াকে সব সময় খোশমেজাজে রাখার চেষ্টা করত। তারা একটি ধারণা দিয়েছিল যে দেশে অনেক রাজনৈতিক দল কিন্তু সেগুলো কখনো জোট বাঁধতে পারবে না। নির্বাচন হলেও একটি ঝুলন্ত পার্লামেন্ট হবে, কারও সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে না। সুতরাং, ইয়াহিয়া ইচ্ছামতো কলকাঠি নাড়াতে পারবেন। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল সব হিসাব-নিকাশ গোলমাল করে দিল।

পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ভাবতেও পারেনি, নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এত বড় জয় পাবে। চতুর্দশ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার অনুমান ছিল, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৭৫ ভাগ আসনে জয়ী হবে। এ কথা তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দপ্তরকে

জানিয়েছিলেন। ঢাকার সামরিক আইন প্রশাসকের দপ্তরের মেজর জেনারেল গোলাম জিলানী খানের ধারণা ছিল, আওয়ামী লীগ শতকরা ৮৫ ভাগ আসন পাবে। জেনারেলদের ধারণা হয়েছিল, আওয়ামী লীগকে কেন্দ্রে সরকার গঠন করতে হলে অন্যান্য দলের সাহায্য নিতে হবে। সে জন্য ছয় দফা থেকে তাদের সরে আসতে হবে। আইএসআই-এর মহাপরিচালক প্রতিদিন জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সিএমএলএ সদর দপ্তর এবং প্রেসিডেন্টের কাছে একটি প্রতিবেদন পাঠাতেন। তাঁরা সত্যিকার অবস্থা ঠিকঠাকভাবে তুলে ধরেননি।[৪৫]

নির্বাচনের তিন দিন পর ইসলামাবাদে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড ঢাকার কনসাল জেনারেলের অফিসে নিম্নবর্ণিত নির্দেশ পাঠালেন :

বিষয় : নির্বাচনসংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া

১) এটি নিশ্চিত করতে হবে যে মার্কিন দূতাবাসের সব কর্মী যেন মন্তব্য করার ক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছে কোনো ভ্যালু জাজমেন্ট না দেন।

২) আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে, যাতে করে কেউ মনে না করে যে মার্কিন সরকার ভুট্টোর জয়ে হতাশ কিংবা মুজিবের জয়ে তুষ্ট।[৪৬]

আর্চার ব্লাড ৩০ ডিসেম্বর সহকর্মী বব কার্লকে নিয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে নির্বাচনে বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানান। শেখ মুজিব ২৩ বছরের শোষণের ব্যাপারে তিক্ততা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, ভারতের সঙ্গে স্বাভাবিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকাটা খুব দরকার এবং বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য পাকিস্তান-ভারত সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। তিনি ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান তৈরি করবেন এবং এ জন্য তিনি সবার সহযোগিতা চান। সহযোগিতা না পেলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে তাঁরাই এটি করবেন এবং ইতিমধ্যে এর খসড়া তৈরি হয়ে গেছে। পত্রিকায় প্রকাশিত ভুট্টোর আসন্ন ঢাকা সফর সম্পর্কে মুজিব মন্তব্য করেন, তিনি এলে তাঁকে স্বাগত জানানো হবে, যেমনটি অন্যদের বেলায়ও প্রযোজ্য। তাঁকে খুবই আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছিল।[৪৭]

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় ছিলেন সমগ্র পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত একমাত্র অমুসলমান সদস্য। ১৯৬৯ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পাকিস্তানের ১২ শতাংশ এবং পূর্ব পাকিস্তানের ২০ শতাংশ মানুষ ছিলেন অমুসলমান। ফলে ত্রিদিব রায়ের নির্বাচিত হওয়া ছিল নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। তা সত্ত্বেও তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মূলধারার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি। এ দেশে আওয়ামী লীগের ঘোষিত অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারার সঙ্গে এটি ছিল সাংঘর্ষিক।

ত্রিদিব রায় ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সত্তরের নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় পরিষদের জন্য

বরাদ্দ একটিমাত্র আসনে তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী প্রার্থী। পাকিস্তান কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী ত্রিদিব রায়কে মুসলিম লীগের টিকিটে নির্বাচন করতে বলেছিলেন। তিনি এ জন্য ত্রিদিব রায়কে এক লাখ টাকাও দিতে চেয়েছিলেন। রায় রাজি হননি। তিনি যখন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিতে তৈরি হচ্ছিলেন, সে সময় তিনি বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে একটি টেলিগ্রাম পান। বঙ্গবন্ধু তাঁকে ঢাকায় এসে দেখা করতে বলেন। তাঁদের মধ্যকার কথোপকথন উঠে এসেছে ত্রিদিব রায়ের বয়ানে :

রায় : মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না। কাপ্তাই বাঁধের কারণে যারা ভিটে হারিয়েছে, তারা এখনো উঠে দাঁড়াতে পারেনি। এ মুহূর্তে তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক সুরক্ষা।

মুজিব : আমার দল ক্ষমতায় এলে ওই এলাকায় উন্নয়ন করব।

রায় : আমরা পার্বত্য এলাকার আলাদা মর্যাদা চাই। সংবিধানে নিরাপত্তা চাই।

মুজিব : রাজা সাহেব, আমাদের দরকার উন্নয়ন। কথা দিচ্ছি, আমি আপনাদের উন্নয়নে সাহায্য করব। (তারপর জোরে হেসে উঠলেন) আমার দলে যোগ দিচ্ছেন না কেন?

রায় : আমরা দলীয় রাজনীতি ভালো বুঝি না শেখ সাহেব। আপনার প্রস্তাবের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছি। এখন মত বদলালে লোকে এটিকে ভালোভাবে নেবে না।

শেখ মুজিব আমার বিরুদ্ধে কোনো প্রার্থী না দেওয়ার বিনিময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাদেশিক পরিষদের দুটি আসনে আমার সমর্থন চান। আমার উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শের পর আমি এ প্রস্তাব বাতিল করে দিই। দক্ষিণে আমরা অং সু প্রুকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ওখানে আওয়ামী লীগের একজন ভালো বাঙালি প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু তিনি জিতলে আমাদের জন্য তা হতো কবর খোঁড়ার শামিল। শেখ মুজিব আমার বিরুদ্ধে জাতীয় পরিষদের আসনে চারু বিকাশ চাকমাকে মনোনয়ন দেন।...

৪ জানুয়ারি (১৯৭১) আমি শেখ মুজিবের ধানমন্ডির বাসায় গেলাম আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আরও আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে স্বাগত জানালেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাংবিধানিক মর্যাদার বিষয়টি আলোচনা করতে চাইলে তিনি বিষয়টি ঘুরিয়ে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের কথা বলতে থাকলেন। পার্বত্য এলাকার জন্য সাংবিধানিক রক্ষাকবচের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল না। আমি তাঁর কাছে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট উত্তর চাইলে তিনি আমাকে তাঁর আইন ও সংবিধানবিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে দেখা করতে বললেন।

> কামাল হোসেন সৌজন্য দেখালেন।...তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন ককটেল পার্টিতে আগে দেখা হয়েছে। তিনি ছিলেন উদার মনের মানুষ। তাঁর স্ত্রী সিন্ধুর মেয়ে, পাকিস্তানের একজন সেরা কূটনীতিক ইকবাল আখুন্দের বোন। তাঁকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলতেই তিনি সহানুভূতি দেখালেন। কিন্তু কাজের কথা কিছুই বলেননি। জানতাম, তিনি চাইলেও দলীয় রাজনীতিকদের চাপের কারণে কার্যকর কিছু করতে পারবেন না, এমনকি মুজিবও যদি সহানুভূতিশীল হন।[৪৮]

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অবিসংবাদী নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তার পরও দেশের এক-দশমাংশ এলাকায় ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষেরা রয়ে গেলেন বিচ্ছিন্ন। এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

সত্তরের নির্বাচনে জয় পাওয়া ছিল আওয়ামী লীগের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মাইলফলক। এই নির্বাচনে রাজনীতিতে যে মেরুকরণ ঘটে, তা এ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত অতীতের সব সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলকে ম্লান করে দেয়। সত্তরের নির্বাচন প্রমাণ করে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাঁদের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব আওয়ামী লীগের হাতেই তুলে দিয়েছেন এবং আওয়ামী লীগ বাঙালি জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জনে পুরোপুরি সফল। দলটি প্রমাণ করল, তারা এ অঞ্চলে এক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

নির্বাচন নিয়ে সন্দেহের দোলাচলে ছিলেন অনেকেই। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের চাপিয়ে দেওয়া এলএফও নিয়ে অস্বস্তি ও শঙ্কা ছিল। চরমপন্থী শ্লোগান দিয়ে কেউ কেউ নির্বাচন বর্জন করেছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ তার অবস্থানে ছিল অনড়। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দেখিয়ে দিল পূর্ব পাকিস্তানের হয়ে কথা বলার অধিকার একমাত্র তারই। ভোটারদের এই নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেট আওয়ামী লীগকে শুধু কেন্দ্রে ও প্রদেশে সরকার গঠন করার বৈধ অধিকারই দেয়নি, নিজের অবস্থানে অটল থাকার সঞ্জীবনী শক্তিও যুগিয়েছে। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হয়ে উঠলেন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। নির্বাচন-প্রসূত এই ম্যান্ডেট কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল পরবর্তী ঘটনাক্রমে তা উপলবদ্ধি করা গেছে।

উপসংহার

সময়ের বিচারে আওয়ামী লীগ একটি পুরোনো রাজনৈতিক দল। এ দেশে অনেক প্রতিষ্ঠানই এত দিন টেকে না। রাজনৈতিক দল তো নয়ই। মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের চেয়েও পুরোনো। মুসলিম লীগকে এখন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে। আওয়ামী লীগেও ভাঙন ধরেছে বারবার। তবুও এর মূল ধারাটি রয়ে গেছে সচল।

পাকিস্তান আমলের ২৪ বছর দলটি কেন্দ্রে একটি কোয়ালিশন সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছিল ১৩ মাস। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জোট সরকার ছিল নানা মেয়াদে প্রায় দুই বছর। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছে বিরোধী দল হিসেবে। দীর্ঘদিন সরকারে না থেকেও প্রতিকূল পরিবেশে একটি রাজনৈতিক দল যে টেকসই হতে পারে, আওয়ামী লীগ তার একটি বড় উদাহরণ।

মুসলিম লীগের বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরাই আওয়ামী লীগ তৈরি করেছিলেন। মুসলিম লীগের ডকট্রিন ছিল 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'। এই তত্ত্বের সারকথা হলো মুসলমানরা একটি আলাদা জাতি এবং তারা এই অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটি অভিন্ন রাষ্ট্রে সমতা ও ন্যায্যতা নিয়ে বাস করতে পারবে না। অখণ্ড ভারতে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ছিল হিন্দুভীতি। 'ভীতি' একটি নেতিবাচক প্রবণতা। কোনো নেতিবাচক ধারণা নিয়ে একটি জাতিরাষ্ট্র গঠন করা যায় না। হিন্দুবিদ্বেষ পাকিস্তানি মনস্তত্ত্বে উন্মাদনা তৈরি করতে সাহায্য করেছিল বটে, তবে রাষ্ট্র গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল হিন্দুবিরোধিতার মোড়কে ভারতবিরোধিতা। মুসলিম লীগের কোনো কর্মসূচি ছিল না। একটিই আওয়াজ ছিল: 'ইসলাম খতরে মে হ্যায় (ইসলাম বিপন্ন)'। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে এ দেশের মানুষ মুসলিম লীগকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছিল। তাতে ইসলামের তেমন ক্ষতি হয়নি। মানুষের ইসলামপ্রীতিতেও ভাটা পড়েনি।

কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শের ভিত্তি ছিল সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা। এই ডকট্রিন ছিল সাধারণ মানুষের বোধের বাইরে। এ ছাড়া কমিউনিস্টবিরোধীরা সব সময় প্রচার করত, কমিউনিজম একটি ইসলামবিরোধী মতবাদ। জাত্যাভিমানী বাঙালির মনে সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য একে 'বিদেশি ইজম' হিসেবেও ঢালাও প্রচার করা হতো। ফলে কমিউনিস্ট পার্টি কখনোই জনপ্রিয়তা পায়নি।

এদিক থেকে আওয়ামী লীগ ছিল ব্যতিক্রম। প্রথম থেকেই একটি কর্মসূচি নিয়ে দলটি মাঠে নেমেছিল। তাদের লড়াই ছিল একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের জন্য, অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের জন্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসনের কথা কমবেশি অনেক দলই বলত। তবে আওয়ামী লীগ এ বিষয়ে ছিল অনেকটাই খোলামেলা, স্পষ্ট ও আক্রমণাত্মক।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী—তাঁরা তিনজনই ছিলেন কিংবদন্তিতুল্য নেতা। তাঁদের উত্তরাধিকার বহন করেছেন আরেক কিংবদন্তি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ফজলুল হক বাদে বাকি তিনজনই আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের মধ্যে এ রকম বটবৃক্ষসম নেতৃত্বের সমাহার এ দেশে আর দেখা যায়নি। তাঁরা শুধু আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন সত্যিকার অর্থেই জননেতা। তাঁদের কথা শোনার জন্য লাখ লাখ মানুষ মাইলের পর মাইল পথ পাড়ি দিয়ে হাজির হতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা আগ্রহ নিয়ে বসে থাকতেন। তাঁদের তর্জনীর ইশারায় সাধারণ মানুষ বিপদে ঝাঁপ দিতেও দ্বিধা করতেন না। তাঁদের কণ্ঠে আগুন ঝরত। তাঁরা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন এবং রাজনীতির জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকারেও তাঁরা পিছপা হননি। জীবনের অনেক মূল্যবান সময় তাঁরা জেলে বন্দী ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে আত্মগোপনে থাকা বা জেলখাটা—এ ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির নেতারাও ছিলেন সামনের কাতারে। কিন্তু তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেননি।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের পুনর্জন্ম হয়েছিল। ১৯৬৩ সালের পরে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানভিত্তিক রাজনীতি নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায়নি। তাদের চিন্তাভাবনা 'বাংলাদেশ' নিয়েই ঘুরপাক খেয়েছে। সোহরাওয়ার্দী ছিলেন আওয়ামী লীগের একমাত্র নেতা, যিনি পাকিস্তানের দুই অংশেই পরিচিত ছিলেন এবং পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার জন্য তাঁর একরকম দায় ছিল। একটি কথা বলা যেতেই পারে, সোহরাওয়ার্দী যদি আরও কয়েক বছর বেঁচে থাকতেন, পূর্ব পাকিস্তানের 'বাংলাদেশ' হয়ে ওঠা হয়তো আরও পিছিয়ে যেত।

অখণ্ড পাকিস্তানের ২৪ বছরের জীবনে গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও ছিল না। ক্ষমতাসীন চক্র আওয়ামী লীগকে কোণঠাসা এমনকি নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল। ১৯৫৮-৬২ সালের সামরিক শাসনের সময় সব রাজনৈতিক দলের ওপর দিয়েই কমবেশি ঝড় বয়ে গেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগকে মূল্য দিতে হয়েছিল বেশি। প্রথম সারির অনেক নেতা হয় বন্দী হয়েছিলেন অথবা বাধ্য হয়ে রাজনীতি থেকে নির্বাসনে চলে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার আওয়ামী লীগ বৈরী পরিস্থিতির শিকার হয় ১৯৬৬-৬৮ সালে। দলটির ওপর রীতিমতো দুর্যোগ নেমে আসে। তার পরও নিবেদিতপ্রাণ তরুণেরা দলের পতাকা বয়ে বেড়িয়েছেন। ওই সময় দেশের রাজনীতিতে অনেক স্রোতোধারা ছিল। কিন্তু ১৯৬৯ সালে আওয়ামী লীগ দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ হয়েছিল মূলধারা।

পাকিস্তানের ২৪ বছরের রাজনীতিতে বাঙালির চাওয়া-পাওয়া আবর্তিত হয়েছে প্রধানত গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে কেন্দ্র করে। একই দাবি অন্য দলগুলোরও ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ যত স্পষ্টতার সঙ্গে দাবিগুলো তুলে ধরতে পেরেছিল, অন্যরা তা পারেনি। আরেকটি বিষয়ে আওয়ামী লীগ ছিল সামনের কাতারে। দলটি জনসম্পৃক্ত হতে পেরেছিল।

আওয়ামী লীগ বরাবরই নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি করে এসেছে। দলের নেতাদের বিশ্বাস ছিল, একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে তাঁরা জনসমর্থন পাবেন। তাঁরা যেকোনো উপায়ে একটি নির্বাচন আদায়ের জন্য মরিয়া ছিলেন। ইয়াহিয়া খানের জারি করা আইনি কাঠামোর অধীনে নির্বাচনে যেতে অনেকেরই আপত্তি ছিল। আওয়ামী লীগের নেতারা কিন্তু ইয়াহিয়ার শর্ত মেনেই সত্তরের নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল একটাই, আওয়ামী লীগ যে এই অঞ্চলের গণমানুষের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি, এটি প্রমাণ করা। ১৯৭০ সালের আগস্টে দেশব্যাপী বন্যা এবং নভেম্বরে উপকূলীয় এলাকায় প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সময়মতো নির্বাচন অনুষ্ঠান ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। অনেক দল নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করে। আওয়ামী লীগ নির্বাচন পেছাতে রাজি ছিল না। এ জন্য তাকে অনেক সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছিল। আওয়ামী লীগ জানত, একবার যদি জনগণের ম্যান্ডেট পাওয়া যায়, তাহলে তার দর-কষাকষির ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যাবে।

আওয়ামী লীগের মূল দাবি ছিল পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। এই দাবি পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই করে আসছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। এই দাবির সঙ্গে অন্যান্য আর্থসামাজিক দাবিও ছিল। আওয়ামী লীগ ছয় দফার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের একটি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ফর্মুলা দিয়েছিল। ছয় দফা বাঙালি

জাতীয়তাবাদের জোয়ার তৈরি করেছিল। সেই জোয়ারে অন্যান্য রাজনৈতিক দল প্রায় খড়কুটোর মতো ভেসে যায়।

আওয়ামী লীগ বারবার বিপর্যয়ে পড়েছে। ফলে ভাঙন এসেছে ১৯৫৭, ১৯৬৩ ও ১৯৬৭ সালে। অনেক জ্যেষ্ঠ নেতা দল ছেড়ে চলে গেছেন। তাতে আওয়ামী লীগ সাময়িকভাবে দুর্বল হয়েছে, কিন্তু ভেঙে পড়েনি। ছয় দফা ঘোষণা করে আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হন। দলের মধ্যে তৈরি হয় সংহতি। এই সংহতির দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, দলের প্রধান নেতা শেখ মুজিবের প্রতি অধিকাংশ নেতা-কর্মীর প্রশ্নাতীত আস্থা ও আনুগত্য এবং দ্বিতীয়ত, দলটিকে তৃণমূলে সংগঠিত করতে পারা। আওয়ামী লীগই একমাত্র রাজনৈতিক দল, যার ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কমিটি ছিল। এটিই একমাত্র রাজনৈতিক দল, যা সত্তরের নির্বাচনে প্রদেশের প্রতিটি আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছিল। প্রদেশে জাতীয় পরিষদের আসনগুলোয় আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ৭৫ শতাংশ ভোট এবং মাত্র ৬ শতাংশ ভোট পেয়ে জামায়াতে ইসলামী ছিল নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী।

আওয়ামী লীগের একটি বড় অর্জন হলো দেশের বুদ্ধিজীবীদের প্রাগ্রসর অংশটিকে আস্থায় নিয়ে তাঁদের মেধাকে কাজে লাগাতে পারা। দেশের কয়েকজন খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞকে নিয়ে আওয়ামী লীগ গড়ে তুলতে পেরেছিল একটি শক্তিশালী টিম। পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ, সামরিক-অসামরিক আমলা ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁরা আঞ্চলিক বৈষম্যের খুঁটিনাটি এবং এর সমাধানের তাত্ত্বিক ভিত্তি দাঁড় করাতে পেরেছিলেন।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭০, এর মধ্যে আছে অনেক মাইলফলক, যেমন ১৯৪৮, ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬২, ১৯৬৬ এবং ১৯৬৯-এর আন্দোলন-সংগ্রাম। আওয়ামী লীগ জড়িয়ে আছে সব কটির সঙ্গে, কখনো অংশীদার হিসেবে, কখনো নেতৃত্বে। জাতিকে একটি গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল জাতীয় একাত্মতাবোধ তৈরির, যে জাতীয়তাবোধের প্রধান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের অবস্থান

প্রদেশ	**মুসলমানদের জন্য বরাদ্দ আসন**	**মুসলিম লীগের পাওয়া আসন**
পাঞ্জাব	৮৬	৭৫
বাংলা	১১৯	১১৩
আসাম	৩৪	৩৩
সিন্ধু	৩৪	২৮
যুক্তপ্রদেশ	৬৬	৫৪
বোম্বাই	৩০	৩০
মাদ্রাজ	২৯	২৯
মধ্যপ্রদেশ	১৪	১৩
উড়িষ্যা	৪	৪
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩৮	১৭
বিহার	৪০	৩৪
মোট	**৪৯৪**	**৪৩০**

সূত্র : Singh, p. 568

পরিশিষ্ট ২

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হবে। উচ্চ হারের খাজনা ন্যায়সংগতভাবে হ্রাস করা হবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হবে।

৩. পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে একে পূর্ব বাংলা সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করে পাটচাষিদের পাটের ন্যায্যমূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলে পাট কেলেঙ্কারি তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট সবার শাস্তির ব্যবস্থা ও তাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৪. কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে এবং সরকারি সাহায্যে সব ধরনের কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে।

৫. পূর্ব বাংলাকে লবণশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈরির কারখানা স্থাপন করা হবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণের কেলেঙ্কারি সম্পর্কে তদন্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে এবং তাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণির গরিব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করে তাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হবে।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল হতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হবে।

৮. পূর্ব বাংলাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করে এবং কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করে শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সব ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সংগত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১০. শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকর করে কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর বর্তমান ভেদাভেদ উঠিয়ে দিয়ে একই পর্যায়ভুক্ত করে সব বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কালাকানুন বাতিল ও রহিত করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হবে।

১২. শাসনব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমিয়ে ও নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়িয়ে তাদের আয়ের একটি সুসংগত সামঞ্জস্য বিধান করা হবে। যুক্তফ্রন্টের কোনো মন্ত্রী এক হাজারের বেশি বেতন গ্রহণ করবেন না।

১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা করা হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারী ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

১৪. জননিরাপত্তা আইন, অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করে বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে। রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হবে।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে।

১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হবে।

১৭. বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যাঁরা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হয়েছেন, তাঁদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হবে এবং তাঁদের পরিবারগুলোকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করে তাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌম করা হবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ছাড়া আর সব বিষয় পূর্ব বাংলার সরকারের হাতে আনা হবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান

ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করে পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হবে।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোনো অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াতে পারবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস আগেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হবে, তিন মাসের মধ্যে তা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে এবং পরপর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে।

সূত্র : হক ও আলম, পৃ. ২৯৫-২৯৬

পরিশিষ্ট ৩

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ১৯৬৫

	প্রাপ্ত আসন	
দল/জোট	**জাতীয় পরিষদ**	**প্রাদেশিক পরিষদ**
কনভেনশন মুসলিম লীগ	১২০	৬৬
কাউন্সিল মুসলিম লীগ	-	৩
* কপ (কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি)	১০	-
এনডিএফ	৫	৩
আওয়ামী লীগ	-	১১
ন্যাপ	-	৪
জামায়াতে ইসলামী	-	১
নেজামে ইসলাম	-	১
স্বতন্ত্র	১৪	৫৮

সূত্র : হক ও আলম, পৃ. ৫১

* পাঁচদলীয় জোট কপ-এর মধ্যে ছিল আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলাম পার্টি। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে কপ-এর দলগুলো আলাদাভাবে প্রার্থী দিয়েছিল।

পরিশিষ্ট ৪

ছয় দফা

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এক সংবাদ সম্মেলনে ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন। ছয় দফা নিম্নরূপ :

১. **শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি :** ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান একটি যুক্তরাষ্ট্র হইবে। সেখানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অঞ্চলগুলোকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে। পাকিস্তানে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত আইনসভার সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

২. **কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা :** কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল দুটি বিষয়, যথা : দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতিতে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

৩. **মুদ্রা ও অর্থসম্বন্ধীয় ক্ষমতা :** (ক) দুই প্রদেশের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকিবে। অথবা (খ) সমগ্র দেশের জন্য একটি মুদ্রাই রাখা যাইতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধ করার জন্য কার্যকর সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভ এবং পৃথক অর্থ ও মুদ্রাবিষয়ক নীতি থাকিবে।

৪. **রাজস্ব, কর ও শুল্কসম্বন্ধীয় ক্ষমতা :** কর ধার্যের কোনো ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের থাকিবে না। এই ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলির হাতে ন্যস্ত থাকিবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাজ্যের রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ লাভ করিবে।

৫. **বৈদেশিক বাণিজ্যবিষয়ক ক্ষমতা :** পাকিস্তান ফেডারেশনভুক্ত দুটি অঙ্গরাজ্যের (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের দুটি পৃথক খাত হিসেবে রাখা হইবে। বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত পূর্ব পাকিস্তানের আয় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে বা সর্বসম্মত কোনো হারে অঙ্গরাজ্যগুলিই মিটাইবে। অঙ্গরাজ্যগুলির

মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধা-নিষেধ থাকিবে না। সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বিদেশের সহিত বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হইবে।

৬. **আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা :** আঞ্চলিক সংহতি ও সংবিধান রক্ষার জন্য সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান ইহার নিজস্ব আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও পোষণ করার অধিকারী হইবে।

সূত্র : চৌধুরী, মিজানুর রহমান

পরিশিষ্ট ৫

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে প্রতিনিধিত্ব

প্রধানমন্ত্রী/প্রেসিডেন্ট	সময়	মন্ত্রিসভার সদস্য		
		পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	মোট
লিয়াকত আলী খান	১৫.৮.৪৭-১৬.১০.৫১	১২	৫	১৭
খানা নাজিমউদ্দিন	১৯.১০.৫১-১৭.৪.৫৩	১১	৬	১৭
মোহাম্মদ আলী বগুড়া	১৭.৪.৫৩-২৪.১০.৫৪	৯	৫	১৪
	২৪.১০.৫৪-১১.৮.৫৫	৯	৭	১৬
চৌধুরী মোহাম্মদ আলী	১১.৮.৫৫-১২.৯.৫৬	১০	৭	১৭
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী	১২.৯.৫৬-১৮.১০.৫৭	৬	৮	১৪
ইসমাইল আই চুন্দ্রিগড়	১৮.১০.৫৭-১৬.১২.৫৭	৯	৭	১৬
মালিক ফিরোজ খান নুন	১৬.১২.৫৭-৭.১০.৫৮	১৭	১১	২৮
মুহাম্মদ আইয়ুব খান	২৮.১০.৫৮-১৭.২.৬০	৯	৩	১২
	১৭.২.৬০-৮.৬.৬২	১১	৫	১৬
	৮.৬.৬২-২৩.৩.৬৫	৯	৮	১৭
	২০.৩.৬৫-২৫.৩.৬৯	১১	৬	১৭

সূত্র : Humayun, p. 127

পরিশিষ্ট ৬

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা ব্যয়

সাল	ব্যয় (মিলিয়ন রুপি)		প্রতিরক্ষা ব্যয় (%)
	মোট	প্রতিরক্ষা	
১৯৪৭-৪৮	২৩৬.০	১৫৩.৮	৬৫.২
১৯৪৮-৪৯	৬৪৭.০	৪৬১.৫	৭১.৪
১৯৪৯-৫০	৮৫৬.০	৬২৫.৪	৭৩.১
১৯৫০-৫১	১২৬৬.২	৬৪৯.৯	৫১.১
১৯৫১-৫২	১৪৪২.৩	৭৭১.১	৫৫.০
১৯৫২-৫৩	১৩২০.১	৭৮৩.৪	৫৬.৭
১৯৫৩-৫৪	১১০৮.৭	৬৫৩.২	৫৮.৭
১৯৫৪-৫৫	১১৭২.৬	৬৩৫.১	৫৭.৫
১৯৫৫-৫৬	১৪৩৩.৪	৯১৭.৭	৬৪.০
১৯৫৬-৫৭	১৩৩০.৭	৮০০.৯	৬০.২
১৯৫৭-৫৮	১৫২১.৮	৮৫৪.২	৫৬.১
১৯৫৮-৫৯	১৯৫৬.৫	৯৯৬.৬	৫১.০
১৯৫৯-৬০	১৮৪৬.৫	১০৪৩.৫	৫৬.০
১৯৬০-৬১	১৭৭৫.৭	১০০৫.৩	৫৬.৬
১৯৬১-৬২	১৮৮৫.৯	১০১০.১	৫৩.৬
১৯৬২-৬৩	১৮০৫.২	৯৫৪.৩	৫২.৯
১৯৬৩-৬৪	২৩৯৪.৭	১২১০.৭	৫৪.৭
১৯৬৪-৬৫	২৭৭১.৭	১২৬২.৩	৪৬.২
১৯৬৫-৬৬	৪১৩৩.৯	২৭১০.০	৬৫.৫
১৯৬৬-৬৭	৩৭১৪.০	২২৫০.০	৬০.৬
১৯৬৭-৬৮	৪০৪২.০	২২৩০.০	৫৭.৩
১৯৬৮-৬৯	৪৩৬২.০	২৪৫০.০	৫৫.৭

Source : Finance Division, Government of Pakistan (1972). Pakistan Economic Survey 1971-72, p. 94-95; cited in Humayun, p. 161

পরিশিষ্ট ৭

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ নির্বাচন ১৯৭০

(পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন দলের অবস্থান)

দল	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট (%)
আওয়ামী লীগ	১৬০	৭৫.১১
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	-	১.০৭
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	-	২.৮১
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	-	১.০৬
পিডিপি	১	২.৮১
ন্যাপ (ওয়ালি)	-	২.০৬
জামায়াতে ইসলামী	-	৬.০৭
জমিয়াতুল উলেমা ই-ইসলাম	-	০.৯২
নেজামে ইসলাম	-	২.৮৩
অন্যান্য দল	-	১.২৫
স্বতন্ত্র	১	৩.৩৭

সূত্র: Election Commission, Pakistan, Report on General Election 1970-71, Islamabad, 1972, p. 202-203; ঘোষ, পৃ. ৩১২

পরিশিষ্ট ৮

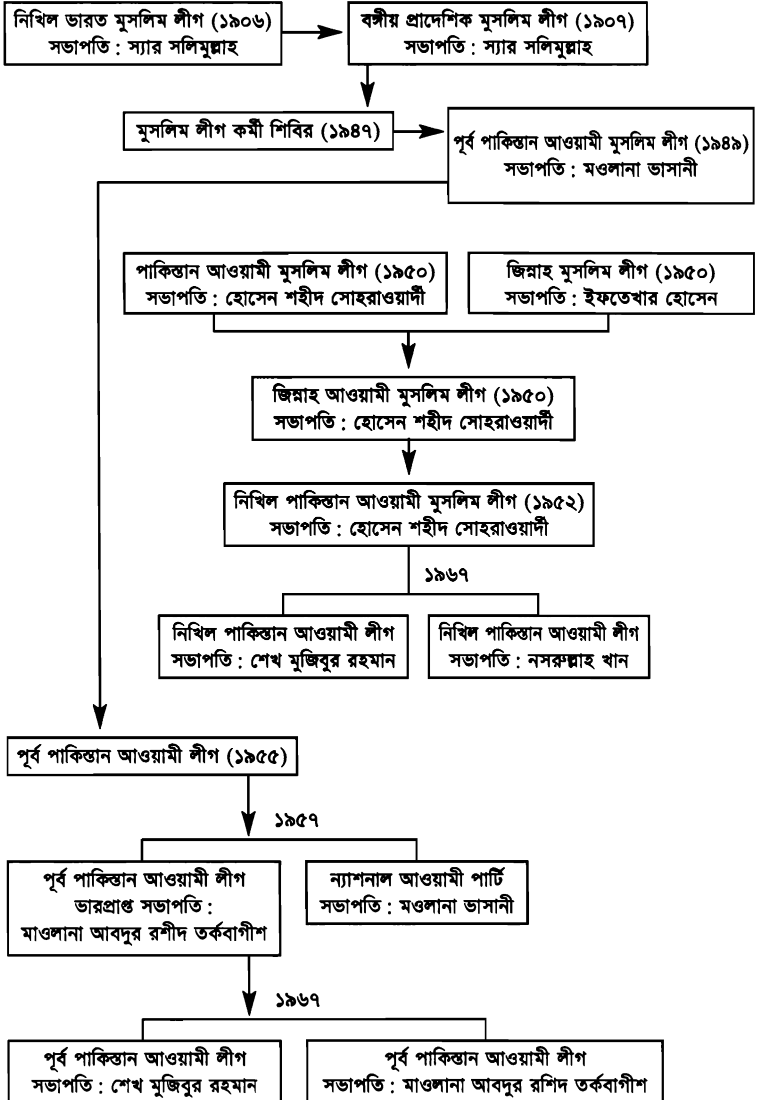
পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ১৯৭০

দল	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট (%)	জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়া প্রার্থী (%)
আওয়ামী লীগ	২৮৭	৭০.৪৫	০
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	-	০.০২	১০০
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	-	১.১১	৯৪.৫
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	১	৩.৫৪	৮৯.৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	-	১.২২	৯৩
পিডিপি	২	১.৯৮	৯২
ন্যাপ (ওয়ালি)	১	৩.২৭	৭৪.৮
জামায়াতে ইসলামী	১	৪.৫০	৭৮
জমিয়াতুল উলেমা ই-ইসলাম	-	১.৪৮	৬৩.৫
অন্যান্য দল	-	১.১৬	১০০
স্বতন্ত্র	৮	১০.৭৬	৮২.৫

সূত্র : Election Commission, Pakistan, (1972) p. 172-216-17; ঘোষ, পৃ. ৩১৫

পরিশিষ্ট ৯

আওয়ামী লীগের জন্ম ও বিবর্তন



তথ্যসূত্র

দেশভাগ

১. Sarkar, J. N. (1985). *Hindu-Muslim Relations in Medieval Bengal.* Idarah-1-Adabiyat-1-Delhi, p.11, quoted from E. C. Sachau, Alberuni's India (1901), London

২. সেন, সুকুমার (১৩৫২ বাংলা)। *মধ্যযুগের বাঙলা ও বাঙালি*। বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, পৃ. ৬৫; Cited in Sarkar, p. 43

৩. আহমদ, আবুল মনসুর (২০০২)। *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*। খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, পৃ. ১০৪

৪. ইসলাম, মাযহারুল (১৯৯৩)। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৫৩

৫. চ্যাটার্জী, জয়া (২০০৩)। *বাঙলা ভাগ হল: হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭*। ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ৩১৬-৩১৯

৬. রহিম, এম এ (২০০২)। *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*। আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃ. ১৫৮

৭. ওই, পৃ. ১৯৪-১৯৬

৮. সরকার, স্বরোচিত (১৯৯৮)। *মাহমুদ নূরুল হুদা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩০-৩৪

৯. আহ্মদ, কামরুদ্দিন (২০০২)। *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ২১-২২

১০. হাবীবুল্লাহ, বি ডি (১৩৬৯ বাংলা)। *শেরেবাংলা*। প্রকাশক : এস এম আজিজুল হক, ঢাকা, পৃ. ৭৯

১১. আহ্মদ, কামরুদ্দিন, পৃ. ৪৬-৪৮

১২. Aziz, K K (1993). *The murder of history : a critique of history textbooks used in Pakistan.* Vanguard, Lahore, p. 142

১৩. Khaliquzzaman, Choudhary (1961), *Pathway to Pakistan*, Longman, Lahore

১৪. Ahmad, Kamruddin (undated). *The Social History of East Pakistan.* Published by Mrs. Raushan Ara Ahmed, Dhaka, p. 42-43

১৫. আহ্মদ, কামরুদ্দিন, পৃ. ৪৮
১৬. Chattarji, Joya (1994). *Bangal Divided. Hindu Communalism and Partition 1932-1947.* Cambridge University Press, Cambridge, p. 224
১৭. Singh, Jaswant (2009). *Jinnah : India-Partition Independence*. Rupa, New Delhi, p. 568
১৮. আহ্মদ, কামরুদ্দিন, পৃ. ৬৮-৬৯
১৯. ওই
২০. ওই, পৃ. ৭০
২১. Pirzada, Sharifuddin (1970). *Foundations of Pakistan*, National Publishing Houses, Karachi, Vol. II, p. 505-535
২২. ইসলাম (১৯৯৩), পৃ. ৮০-৮১
২৩. আহ্মদ, কামরুদ্দিন, পৃ. ৭২
২৪. ওই, পৃ. ৭৩
২৫. আহমদ, আবুল মনসুর, পৃ. ১৯৫
২৬. Fischer, Louis, ed. (1983), *The Essential Gandhi.* Vintage Books, New York, p. 351-352
২৭. আহ্মদ, কামরুদ্দিন, পৃ. ৭৮-৮১
২৮. আহাদ, অলি (২০১২)। *জাতীয় রাজনীতি-১৯৪৫ থেকে ৭৫*। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ঢাকা, পৃ. ২৯
২৯. আহ্মদ, কামরুদ্দিন, পৃ. ৮১-৮২
৩০. ওই, পৃ. ৮২
৩১. রায়, অন্নদাশঙ্কর (১৯৯০)। *যুক্তবঙ্গের স্মৃতি*। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলিকাতা, পৃ. ৯
৩২. ওই, পৃ. ৯৫
৩৩. আহমেদ, সিরাজউদদীন (১৯৯৭)। *হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী*। ভাস্কর প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৪৭
৩৪. হাশিম, আবুল (২০০২)। *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., চট্টগ্রাম, পৃ. ১৬৫
৩৫. আহাদ, পৃ. ২৪
৩৬. ওই, পৃ. ৩১
৩৭. আহমেদ, সিরাজউদদীন (১৯৯৭), পৃ. ১৫১
৩৮. হাশিম, পৃ. ১৬৫-১৬৬
৩৯. আহ্মদ, কামরুদ্দিন, পৃ. ৮৪-৮৬
৪০. উমর, বদরুদ্দীন (১৯৯৫)। *সাম্প্রদায়িকতা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৪০
৪১. আহ্মদ, কামরুদ্দিন, পৃ. ৮৭
৪২. Huque, Kazi Anwarul (1991). *In Quest of Freedom*. UPL. Dhaka. p. 78

ছাত্রলীগের জন্ম

১. উমর, বদরুদ্দীন (১৯৭০)। *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড)*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ১-৩

২. ওই, পৃ. ৬-১৩

৩. রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ৮৩-৮৫

৪. ওই, পৃ. ৮৭-৮৮

৫. হক, সৈয়দ আজিজুল (২০০৩), সংগ্রহ ও সম্পাদনা। *আবদুল হক স্মৃতি-সঞ্চয়*। সময় প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১৩-১৪

৬. উমর, পৃ. ১৪-১৫

৭. আহাদ, পৃ. ৪১-৪২

৮. রহমান, পৃ. ৮৯

৯. উমর, পৃ. ১৮৬-১৮৭

১০. Karim, S. A. (2009). *Sheikh Mujib : Triumph and Tragedy*. UPL, Dkaka, p. 38

১১. রহমান, পৃ. ৮৯

১২. উমর, পৃ. ৫১

১৩. Karim, p. 39

১৪. আহাদ, পৃ. ৪৫

১৫. ওই, পৃ. ৪৫-৪৭

১৬. ওই, পৃ. ৪৭

১৭. রহমান, পৃ. ৯২-৯৩

১৮. আহাদ, পৃ. ৪৮-৪৯

১৯. উমর, পৃ. ৮১

২০. Khan, Mohammad Ayub (2008). *Friends Not Masters : A Political Autobiography.* UPL, Dhaka, p. 29-30

২১. আহাদ, পৃ. ৫৭-৬২

২২. উমর, পৃ. ১৩৮

২৩. ওই, পৃ. ১০৯

২৪. ওই, পৃ. ১১০

২৫. আহাদ, পৃ. ৭০-৭১

২৬. শাজাহান, এস এম আজিজুল হক (১৪১৮ বাংলা)। *আজিজুল হক শাজাহানের নির্বাচিত কলাম*। অমরাবতী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৪৭-৫০

২৭. ওই

২৮. আহাদ, পৃ. ৮১-৮২

২৯. ওই, পৃ. ৮৩-৮৪

৩০. ওই, পৃ. ৮৫-৮৬
৩১. রহমান, পৃ. ১১৪
৩২. ওই, পৃ. ১১৫-১১৯
৩৩. উমর, পৃ. ১৯০
৩৪. রহমান, পৃ. ১২৬

মোগলটুলী থেকে রোজ গার্ডেন

১. উমর, পৃ. ৩৮
২. ওই, পৃ. ২২১-২২২
৩. রহমান, পৃ. ১০১
৪. আহাদ, পৃ. ৮৮
৫. ওই, পৃ. ৮৯
৬. উমর, পৃ. ২৩২-২৩৩
৭. ওই, পৃ. ২৪৬-২৪৭
৮. আহাদ, পৃ. ৯৬
৯. উমর, পৃ. ২৪৭
১০. ওই, পৃ. ২৪৭-২৪৮
১১. আহাদ, পৃ. ৯৭
১২. আলী, মোহাম্মদ (২০১১)। *ভাষাসংগ্রামী আবদুল মতিন*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৭২। আবদুল মতিন রচিত 'জীবন পথের বাঁকে বাঁকে', সাহিত্যিকা থেকে উদ্ধৃত।
১৩. আহাদ, পৃ. ৯৭
১৪. উমর, পৃ. ২৫১-২৫২
১৫. ওই, পৃ. ২৪৮-২৬৪
১৬. আহাদ, পৃ. ৩৪৪
১৭. রহমান, পৃ. ১২১
১৮. উমর, পৃ. ২৫০
১৯. রহমান, পৃ. ১২১-১২২
২০. ওই, পৃ. ১৩০
২১. আহাদ, পৃ. ১০৩
২২. আজিজ, শেখ আবদুল (২০০৯)। *রাজনীতির সেকাল ও একাল*। দি স্কাই পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ১৮০
২৩. রহমান, পৃ. ১৩০
২৪. ওই, পৃ. ১৩২
২৫. ওই, পৃ. ১৩৪-১৩৫
২৬. ওই, পৃ. ১৩৫

২৭. Karim, p. 48-49
২৮. রহমান, পৃ. ১৭৫, ১৮৬
২৯. আহাদ, পৃ. ১০৯
৩০. শাজাহান, পৃ. ৩৭২-৩৭৩
৩১. আহাদ, পৃ. ১০৪
৩২. শাজাহান, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪
৩৩. রায়, খোকা (১৯৮৬)। *সংগ্রামের তিন দশক*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৭০-৭১
৩৪. ওই, পৃ. ১০৭-১০৯
৩৫. আহমেদ, সিরাজউদদীন (১৯৯৭), পৃ. ২২৩
৩৬. Dawn, Karachi, 1 November 1950; cited in Sisson, Richard & Rose, Leo (1990). *War and Secession : Pakistan, India and the Creation of Bangladesh*. University of California Press, California, p.11
৩৭. আহমেদ, মহিউদ্দিন (২০০২)। *আমার জীবন আমার রাজনীতি*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা। পৃ. ১০৭-১৪৩
৩৮. ওই, পৃ. ১৪২-১৪৩
৩৯. রহমান, পৃ. ২১৬
৪০. ওই, পৃ. ২১২-২১৩
৪১. ইসলাম (১৯৯৩), পৃ. ১২৬
৪২. রহমান, পৃ. ২২০-২২১

ভাষার লড়াই

১. রায়, পৃ. ৭০-৭১
২. Khan, Lal (2008). *Pakistan's other story : The 1968-69 Revolution*. The Struggle Publications, Lahore, p.107; Ali, Tariq (1983). *Can Pakistan Survive?* Penguin Books, Middlesex. p. 56
৩. Gankovsky, Y. V. and Gordon-Polonskaya, L. R. (1972). *A History of Pakistan 1947-1958*. People's Publishing House, Lahore, p. 175-176; Zaheer, Hasan (1998). *The Times and Trial of the Rawalpindi Conspiracy 1951*. Oxford University Press, Karachi; Ahmed, Ishtiaq (2013). *The Pakistan Military in Politics: Origins, Evolution, Consequences*. Amaryllis, New Delhi, p. 95
৪. Khan (2008), p. 37
৫. Ahmad, Kamruddin; p. 106-107
৬. আহাদ, পৃ. ১৩০-১৩১
৭. ইসলাম (১৯৯৩), পৃ. ১২৯; আহাদ, পৃ. ১৬৭
৮. Karim, p. 50

৯. আহাদ, পৃ. ১৩৪
১০. ওই
১১. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারি* (১৯৫৩) গ্রন্থে সংযোজিত, ফয়েজ আহমদ, 'সুলতানের সঙ্গে কথোপকথন', পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২২৩-২৩৪
১২. আহাদ, পৃ. ১৪১-১৪৯
১৩. রফিক, আহমদ (২০১৫)। *একুশ থেকে একাত্তর*। বেঙ্গল পাবলিকেশনস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ. ১৩৭
১৪. Khan, Lal, p.102
১৫. *একুশে ফেব্রুয়ারি* সংকলনে সংযোজিত, কবির উদ্দিন আহমেদ, 'একুশের ঘটনাপঞ্জি', পৃ. ১৩৩-১৩৪
১৬. রহমান, পৃ. ১৯৬-২০৪
১৭. ওই, পৃ. ২০৫-২২০
১৮. ওই, পৃ. ২১১
১৯. আহাদ, পৃ. ১৬৯
২০. আহাদ, পৃ. ১৫৮
২১. রহমান, পৃ. ২১৪-২১৬
২২. Karim, p. 53

যুক্তফ্রন্ট

১. রহমান, পৃ. ২৩৭
২. আহাদ, পৃ. ১০৩-১০৪
৩. রহমান, পৃ. ২৪৪
৪. হাবীবুল্লাহ, পৃ. ১১১
৫. রহমান, পৃ. ২৪৪
৬. ওই, পৃ. ২৫০
৭. হাবীবুল্লাহ, পৃ. ১১৬
৮. আহমদ, আবুল মনসুর (২০০২), পৃ. ২৫২
৯. হাবীবুল্লাহ, পৃ. ১১২-১১৩
১০. চৌধুরী, মিজানুর রহমান (২০০১)। *রাজনীতির তিন কাল*। হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, ঢাকা, পৃ. ৩২-৩৩
১১. রায়, পৃ. ১২৯-১৩০
১২. আহাদ, পৃ. ১৮৮
১৩. রহমান, পৃ. ২৫৯-২৬০
১৪. আমানউল্লাহ
১৫. ওই

১৬. আরিফ মঈনুদ্দীন
১৭. আমানউল্লাহ
১৮. আহাদ, পৃ. ১৯০
১৯. ওই, পৃ. ১৮৯-১৯১
২০. রহমান, পৃ. ২৬৭
২১. ওই
২২. ওই, পৃ. ২৭০
২৩. Gauhar, Altaf (1993). *Ayub Khan : Pakistan's First Military Ruler*. Sang-e-Meel Publications, Lahore, p. 97-99
২৪. রহমান, পৃ. ২৭০-২৭৩
২৫. ওই, পৃ. ২৮৩
২৬. ইসলাম, পৃ. ১৫৩
২৭. আহমদ, আবুল মনসুর (২০০২), পৃ. ৪৩৪
২৮. আহমেদ, মহিউদ্দিন (২০০২), পৃ. ২২৭-২২৯
২৯. হাবীবুল্লাহ, পৃ. ১২৪-১২৫
৩০. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন, ২১-২২-২৩ অক্টোবর ১৯৫৫, সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের বার্ষিক রিপোর্ট, প্রচার সম্পাদক অলি আহাদ কর্তৃক প্রকাশিত, ৫৬ সিমসন রোড, ঢাকা
৩১. আহমেদ, মহিউদ্দিন (২০০২), পৃ. ২৩১-২৩৫
৩২. ওই
৩৩. Karim, p. 66
৩৪. Ibid, p. 68
৩৫. Ibid. p. 67
৩৬. আহমদ, আবুল মনসুর (২০০২), পৃ. ৩০২

ভাঙাগড়া

১. আহাদ, পৃ. ৫২২-৫২৩
২. ওই, পৃ. ১৯৮-১৯৯
৩. Khan, Lal (2008), p. 105
৪. Khan, Sultan M (1997). *Memoirs & Reflections of a Pakistani Diplomat.* The London Centre for Pakistan Studies, London, p. 127
৫. Khan, Lal (2008), p. 105
৬. আহাদ, পৃ. ২০৭
৭. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন, সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের বার্ষিক রিপোর্ট, ঢাকা, ১৯৫৫
৮. আজিজ, পৃ. ২৪৬

৯. আহমেদ, মহিউদ্দিন (২০০২), পৃ. ২৩৯
১০. আহাদ, পৃ. ২০৪-২০৫
১১. ওই, পৃ. ২০৭
১২. Ahmad, Kamruddin, p. 125
১৩. আহমেদ, মহিউদ্দিন (২০০২), পৃ. ২৪৮
১৪. ওই
১৫. আহাদ, পৃ. ২১২-২১৪
১৬. জিলানী, এস জি (১৯৯৫)। *বঙ্গভবনে ১৫ গভর্নর*। অনুবাদ, মোস্তফা দৌলত, সৌখিন প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২২
১৭. খান, আতাউর রহমান (২০০০)। *ওজারতির দুই বছর*। নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, পৃ. ১২৩-১২৪
১৮. ওই, পৃ. ১০০
১৯. ওই, পৃ. ১২৪-১২৫
২০. আমানউল্লাহ
২১. আহাদ, পৃ. ২১৫
২২. Karim, p. 78
২৩. আহমেদ, মহিউদ্দিন (২০০২), পৃ. ১২৭
২৪. আহাদ, পৃ. ২২৬-২২৭
২৫. ওই, পৃ. ২৩০-২৩১
২৬. Karim, p. 80
২৭. আহাদ, পৃ. ২৩১
২৮. চৌধুরী, মিজানুর রহমান, পৃ. ৩৯-৪০
২৯. Karim, p. 81
৩০. হাবীবুল্লাহ, পৃ. ১৩৪
৩১. আমানউল্লাহ
৩২. Gauhar, p. 42
৩৩. কামাল, কাজী আহমদ (২০১৫)। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের জন্ম*। অক্ষরপত্র, ঢাকা, পৃ. ৭৯
৩৪. Karim, p. 84
৩৫. ইসলাম (১৯৯৩), পৃ. ১৭৩-১৭৬
৩৬. হক, আবদুল (১৯৯৬)। *লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি-পরিক্রমা, প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশ ১৯৫৩-'৯১*। নূরুল হুদা সম্পাদিত, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ৫৬
৩৭. শাজাহান, পৃ. ৩১৯-৩৩১
৩৮. আমানউল্লাহ
৩৯. শাজাহান, পৃ. ৩৩১

৪০. ইসলাম (১৯৯৩), পৃ. ১৭৬। আহমদ, আবুল মনসুর, পৃ. ৪৩৮
৪১. Top Secret File, Karachi 775-790d.00/10-458, National Archives Washington; cited in Gauhar, p. 147-148
৪২. Karim, p. 93
৪৩. বেগম জাহানারা খান

উর্দিশাসন

১. আহমেদ, মহিউদ্দিন (২০০২), পৃ. ২৮০
২. চৌধুরী, মিজানুর রহমান, পৃ. ৪৬
৩. Dawn, Karachi, 29 October 1958, Cited in Gauhar, p. 156
৪. আহাদ, পৃ. ২৪৬
৫. ওই, পৃ. ২৪৮
৬. Gauhar, p. 51
৭. চৌধুরী, মিজানুর রহমান, পৃ. ৪৪
৮. Khan (2008), p. 209
৯. Ibid, p. 210-219
১০. Ibid, p. 205-207
১১. চৌধুরী, মিজানুর রহমান, পৃ. ৪৭
১২. Gauhar, p. 160
১৩. Ahmed, Sufia (2012), ed. *Diaries of Justice Muhammad Ibrahim (1960-1966).* Academic Press and Publishers Library, Dhaka, p. 226-228
১৪. Ibid, p. 145-146
১৫. Ibid, p. 149
১৬. জিলানী, পৃ. ৩৫-৩৬
১৭. হাবিব, খালেদা (১৯৯১)। *বাংলাদেশ: নির্বাচন, জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিসভা*। প্রকাশক, এ আর মুরশিদ, ঢাকা, পৃ. ১৮৯-১৯০
১৮. জিলানী, পৃ. ৩৫-৩৬
১৯. আহাদ, পৃ. ২৫৭-২৬০
২০. হাসান, মোরশেদ শফিউল (২০১৪)। *স্বাধীনতার পটভূমি: ১৯৬০ দশক*। অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৫৩-৫৪
২১. মতিউর রহমান
২২. আলী, সৈয়দ মোদাচ্ছের (১৯৯১)। *স্মৃতিতে অম্লান ষাট দশকের ছাত্র রাজনীতি*। নাজমুন্নেছা পাবলিকেশনস, ঢাকা, পৃ. ৪০
২৩. উল্লাহ, মাহফুজ (২০১২)। *পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন: গৌরবের দিনলিপি*। অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃ. ১১১

২৪. Sobhan, Rehman (2016). *Untranquil Recollection: The Years of Fulfilment.* Sage, New Delhi, p. 242
২৫. চৌধুরী, মিজানুর রহমান, পৃ. ৩৪-৩৫

ত্রিপুরা মিশন

১. শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন
২. রায়, পৃ. ১৮২-১৮৩
৩. লেনিন, নূহ-উল-আলম (২০১৫)। *কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস প্রসঙ্গ ও দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬৪-১৯৭১)*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৩৬০, ৪০৯-৪১০
৪. রেজা আলী, 'আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ ফরহাদ ভাই'। *আকণ্ঠ বিপ্লব পিপাসা* (২০০১), (মোহাম্মদ ফরহাদ স্মারক গ্রন্থ)। মোহাম্মদ ফরহাদ স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা, পৃ. ২৩৪-২৩৫
৫. Karim, p. 108-109
৬. Ibid, p. 109-110
৭. আহমদ, ফয়েজ (১৯৯৪)। *'আগরতলা মামলা', শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পরিশিষ্ট-৭
৮. Karim, p. 110
৯. Banarjee, Sashanka S (2011). *India, Mujibur Rahman, Bangladesh Liberation & Pakistan.* Aparajta Sahitya Bhaban, Narayanganj, p. 9-17
১০. ওই
১১. ওই
১২. ওই

পুনর্জন্ম

১. আহাদ, পৃ. ২৭৫-২৭৬
২. Ali (1983), p. 77
৩. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২৮ আগস্ট ১৯৬৩
৪. ঘোষ, শ্যামলী (২০০৭)। *আওয়ামী লীগ ১৯৪৯-১৯৭১*। ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ৯৯-১০০
৫. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ২১ নভেম্বর ১৯৬৩
৬. ওই, ১৮ মার্চ ১৯৬৩
৭. ঘোষ, পৃ. ৮৩
৮. খান, আতাউর রহমান (২০০১)। *স্বৈরাচারের দশ বছর*। নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, পৃ. ২১৩-২১৪
৯. ঘোষ, পৃ. ৮৮
১০. ওই, পৃ. ৮৮-৮৯

১১. চৌধুরী, মিজানুর রহমান, পৃ. ৬২
১২. শেখ মুজিবুর রহমান, 'বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় সাংবাদিক মানিক ভাই', দৈনিক *ইত্তেফাক*, ৯ জুন ১৯৬৯
১৩. Ahmed (2012), p. 171
১৪. চৌধুরী, মিজানুর রহমান, পৃ. ৬৩
১৫. ঘোষ, পৃ. ৯৯-১০০
১৬. খান, আতাউর রহমান (২০০১), পৃ. ২২৮-২২৯
১৭. ঘোষ, পৃ. ৭৮-৭৯
১৮. জিলানী, পৃ. ৩৮-৪০
১৯. ঘোষ, পৃ. ১০৪-১০৫; আহাদ, পৃ. ২৭৯
২০. আহাদ, পৃ. ২৭৯
২১. আবদুল করিম
২২. চৌধুরী, মিজানুর রহমান, পৃ. ৩৬৪
২৩. আমানউল্লাহ
২৪. খান, আতাউর রহমান (২০০১), পৃ. ২৩৬-২৪০
২৫. *কুদরতউল্লাহ শেহাবের ডায়েরী (১৯৯৫)*। অনুবাদ: মোস্তফা দৌলত, সৌখিন প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩১-৩২
২৬. আযম, গোলাম (২০০৪)। *জীবনে যা দেখলাম,* তৃতীয় খণ্ড। কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৪০-৪২
২৭. খান, আতাউর রহমান (২০০১), পৃ. ২৪৯
২৮. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ৩ জানুয়ারি ১৯৬৫
২৯. Khan, (2008), p. 254
৩০. Ibid, p. 240; Gauhar, p. 286
৩১. Ali (1983), p. 73
৩২. Humayun, Syed (1995). *Sheikh Mujib's 6-Point Formula: An Analytical Study of the Breakup of Pakistan.* Royal Book Company, Karachi, p. 209

ছয় দফা

১. এস এম ইউসুফ
২. সিরাজুল আলম খান
৩. Khan, Arshad Sami (2008). *Three Presidents and an Aide : Life Power and Politics.* Pentagon Press, New Delhi, p. 69
৪. ইসলাম (১৯৯৩), পৃ. ২৪১-২৪২
৫. Karim, p. 135
৬. Hossain, Kamal (2013). *Bangladesh: Quest for Freedom and Justice.* UPL, Dhaka, p. 17-18

৭. ইসলাম (১৯৯৩), পৃ. ২৪২
৮. Hossain, p. 19
৯. ইসলাম (১৯৯৩), পৃ. ২৪৭-২৪৮
১০. Karim, p. 136
১১. খান, আতাউর রহমান (২০০১). পৃ. ২৬৭
১২. ওই, পৃ. ২৬৭-২৬৮
১৩. ঘোষ, পৃ. ১২৭
১৪. 'ছয় দফা ও দুই অর্থনীতি', নুরুল ইসলাম, *প্রতিচিন্তা,* পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ৯-১২
১৫. Sobhan, p. 253-256
১৬. ওই, পৃ. ১২৯-১৩১
১৭. আহমদ, মহিউদ্দিন (২০১৪)। *জাসদের উত্থান-পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ১৬
১৮. ইসলাম (১৯৯৩), পৃ. ২৭০
১৯. রহমান, শেখ মুজিবুর (১৯৬৬)। *আমাদের বাঁচার দাবি ছয় দফা কর্মসূচি*। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ঢাকা, পৃ. ১৬
২০. আহমদ, আবুল মনসুর, পৃ. ৫৩২
২১. *সংবাদ,* ২১ মার্চ ১৯৬৬
২২. *ইত্তেফাক,* ২৫ এপ্রিল ১৯৬৬
২৩. রায়, পৃ. ১৯৭-১৯৮
২৪. আহাদ, পৃ. ৩০৭-৩০৮
২৫. ওই, পৃ. ৩০৮-৩১০
২৬. লেনিন (২০১৫)। *কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস প্রসঙ্গ ও দলিলপত্র, ২য় খণ্ড*। পৃ. ৪০২
২৭. মতিউর রহমান
২৮. মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম
২৯. ইসলাম (১৯৯৩), পৃ. ২৮৩-২৮৫
৩০. *প্রথম আলো,* ৭ জুন ২০১৫
৩১. উল্লাহ, পৃ. ১১৫৮-১১৫৯; সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমদের কার্যবিবরণী, কাউন্সিল অধিবেশন, ২২-২৫ নভেম্বর ১৯৬৬
৩২. ওই, পৃ. ১১৯৪-১১৯৫; পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন প্রাদেশিক সম্মেলন, ৩-৫ নভেম্বর ১৯৬৭ কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর কার্যবিবরণী, আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন
৩৩. ঘোষ, পৃ. ১৪৯
৩৪. আহাদ, পৃ. ৩১৩-৩১৪
৩৫. ওই, পৃ. ৩১৪-৩১৫

৩৬. ঘোষ, পৃ. ১৫০-১৫২
৩৭. মতিউর রহমান
৩৮. উল্লাহ, পৃ. ২২১-২২২
৩৯. আহাদ, পৃ. ৩২১

পাকদর্শন

১. আলী, শাহেদ (১৯৮৯) সম্পাদিত। *আমাদের সাহিত্যে ও ভাবনায় কায়েদে আজম*। মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলন, ঢাকা, পৃ. ১৮২
২. ওই, পৃ. ১৮৩
৩. ওই, পৃ. ১৭৩
৪. ওই, পৃ. ১৪৫
৫. ওই, পৃ. ১৫১
৬. ওই, পৃ. ২৯৯
৭. হাসান (২০১৪), পৃ. ১৫৬-১৫৮
৮. হক, সৈয়দ আজিজুল (২০০৫) সম্পাদিত। *আজিজুল হক স্মৃতিসঞ্চয়* ২। মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৪৩
৯. হাসান (২০১৪), পৃ. ১৬০-১৬১
১০. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৪ জুন ১৯৬৭; উদ্ধৃতি দিয়েছেন : হক, আবুল কাসেম ফজলুল (১৯৭২)। *মুক্তি সংগ্রাম, প্রথম পর্ব*। বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৮
১১. *দৈনিক পাকিস্তান*, ঢাকা, ২৫ জুন ১৯৬৭; হক, পৃ. ১৮-১৯
১২. আনিসুজ্জামান
১৩. *দৈনিক পাকিস্তান*, ঢাকা, ২৯ জুন ১৯৬৭, হক, পৃ. ১৯-২০
১৪. ওই; হক, পৃ. ২০-২১
১৫. *দৈনিক পাকিস্তান*, ঢাকা, ২ জুলাই ১৯৬৭
১৬. আলী (১৯৯১), পৃ. ৮৬
১৭. হক (১৯৭২), পৃ. ২২
১৮. মতিউর রহমান
১৯. Baxter, Craig (2008), ed. *Diaries of Field Marshal Mohammed Ayub Khan 1966-1972*. Oxford University Press, Karachi. p. 122
২০. Ibid
২১. Ibid, p. 36-267
২২. Khan, Arshad Sami (2008), p. 22-23

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

১. Baxter, p. 192-204
২. Ibid

৩. Gauhar, p. 409; বেগম, সাহিদা (২০০০) সম্পাদিত। *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৩৪-৩৫
৪. বেগম, পৃ. ৩৬
৫. ওই, পৃ. ১৩-১৪
৬. Karim, p. 22-24
৭. বেগম, পৃ. ১৮-২১
৮. ওই
৯. ওই
১০. ওই
১১. ওই
১২. ওই
১৩. Gauhar, p. 408-421
১৪. Ibid, p. 422
১৫. Ibid, p. 410-411
১৬. কোহিনূর হোসেন
১৭. বেগম, পৃ. ৬১
১৮. আলী, পৃ. ১০৪
১৯. বেগম, পৃ. ৮৭
২০. Gauhar, p. 422
২১. আহমদ, মওদুদ (২০১০)। *চলমান ইতিহাস : জীবনের কিছু সময় কিছু কথা*। ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ৫৬-৫৮
২২. *The Times*, London, 1 July 1968; Gauhar, p. 423
২৩. বেগম, পৃ. ২৪-২৫
২৪. Hossain, p. 31
২৫. আহমদ, ফয়েজ (১৯৯৪), পৃ. ৫৯
২৬. বেগম, পৃ. ৮২৯-৮৩৪
২৭. আহমদ, ফয়েজ (১৯৯৪), পৃ. ১১৫-১১৯
২৮. বেগম, পৃ. ৮২৪-৮২৯
২৯. ওই, পৃ. ২৭
৩০. ইসলাম (১৯৯৩), পৃ. ৩৫৪
৩১. মতিউর রহমান
৩২. সামসুদ্দোহা, মো. (২০০৯)। *ইতিহাসের অল্প কথা*। অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৬০-৬২
৩৩. ওই
৩৪. মাহফুজ উল্লাহ
৩৫. সামসুদ্দোহা, পৃ. ৫৯

পালাবদল

১. Khan, Arshad Sami, p. 34-35
২. Ibid, p. 54
৩. Ibid
৪. Ibid
৫. Gauhar, p. 456
৬. *শহীদ আসাদ পরিষদ পত্রিকা*, সংখ্যা ১, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১। সম্পাদক : আবুল কাসেম ফজলুল হক, শহীদ আসাদ পরিষদ, ঢাকা
৭. সামসুদ্দোহা, পৃ. ৭৭
৮. আলী, পৃ. ১১৩-১৪
৯. ওই, পৃ. ১১৪
১০. The Pakistan Observer, 1 February 1969
১১. Dawn, Karachi, 4 February 1969; Gauhar, p. 443
১২. Gauhar, p. 445-448
১৩. আলী, পৃ. ১১৬-১৭
১৪. কামালউদ্দিন আহমেদ
১৫. ওই
১৬. ওই
১৭. খান, লে. ক. এস আই এম নূরন্নবী (১৯৯৩)। *জীবনের যুদ্ধ যুদ্ধের জীবন*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৫৮-৬১
১৮. Karim, p. 152
১৯. আবদুর রাজ্জাক
২০. রউফ, আবদুর (২০০০)। *আগরতলা মামলা ও আমার নাবিক জীবন*। মীরা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৭৮-৭৯
২১. আলী, রাও ফরমান (১৯৭৮)। *ভুট্টো শেখ মুজিব বাংলাদেশ*। অনুবাদ মোস্তফা হারুন, সৌখিন প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ২৮
২২. ফরহাদ, মোহাম্মদ (১৯৮৯)। *উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৭৩
২৩. সামসুদ্দোহা, পৃ. ৯০
২৪. সিরাজুল আলম খান
২৫. সামসুদ্দোহা, পৃ. ৯০-৯১
২৬. রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক
২৭. আহমদ (২০১৪), পৃ. ২৩-২৪
২৮. সিরাজুল আলম খান
২৯. আহমদ, মওদুদ (২০১০), পৃ. ৬১
৩০. আসাদ রহমান

৩১. Chowdhury. G. W. (1994). *The Last Days of United Pakistan.* UPL, Dhaka, p. 38-39
৩২. Ibid
৩৩. Gauhar, p. 456
৩৪. Baxter, p. 302
৩৫. খান, মিজানুর রহমান (২০১৩)। *মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৩৪৬
৩৬. Chowdhury, p. 38-39
৩৭. খান, লে. জেনারেল গুল হাসান (১৯৯৬)। *পাকিস্তান যখন ভাঙলো*। সংকলন ও অনুবাদ : এ টি এম শামসুদ্দীন, ইউপিএল, ঢাকা, পৃ. ৭-৮
৩৮. Chowdhury, p. 38-39
৩৯. Ibid, p. 39
৪০. হোসেন, ড. কামাল (২০০৫)। *স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা ১৯৬৬-১৯৭১*। অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৯
৪১. ওই, পৃ. ৪১
৪২. Baxter, p. 308
৪৩. Chowdhury, p. 40
৪৪. মিয়া, এম এ ওয়াজেদ (১৯৯৩)। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ. ৫৩
৪৫. হোসেন (২০০৫), পৃ. ৩৫-৩৭
৪৬. জিলানী, পৃ. ৪২-৪৩
৪৭. ওই
৪৮. সাইদুর রহমান
৪৯. Ali, p. 81
৫০. *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৭৪

নির্বাচন

১. Khan (1997), p. 221
২. হক, পৃ. ৮৪
৩. Khan (1997), p. 222 (translated by the author)
৪. Ibid, p. 223-224
৫. জিলানী, পৃ. ৪৪-৪৬
৬. Chowdhury, p. 54-55
৭. Ibid, p. 85
৮. Ibid, p. 87
৯. Ibid, p. 88

১০. Ibid, p. 92-93
১১. Ibid, p. 89
১২. Ibid, p. 98
১৩. নুরুল ইসলাম তালুকদার
১৪. Raja, Major General (Retd) Khadim Hussain (2012). *A Stranger in My Own Country*. Oxford, Karachi, p. 17
১৫. নুরুল ইসলাম তালুকদার
১৬. দৈনিক *ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৬৯
১৭. সিরাজুল আলম খান
১৮. কামাল আহমেদ
১৯. চৌধুরী, মিজানুর রহমান, পৃ. ৯৮-৯৯
২০. Sobhan, p. 293
২১. Rahman, Muhammad Anisur (2001). *My Story of 1971: Through the Holocaust that Created Bangladesh*. Liberation War Museum, Dhaka, 22-24
২২. Ibid
২৩. ইসলাম (১৯৯৩), পৃ. ৪৭৮-৪৭৯
২৪. লেখকের স্মৃতি থেকে। লেখক কাউন্সিল সভায় উপস্থিত ছিলেন
২৫. আহমদ (২০১৪), পৃ. ২৭
২৬. অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'শেখ মুজিবের অঙ্গীকার'। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থ*, খণ্ড ২ (২০১২), সম্পাদনা এম নজরুল ইসলাম, পরিবেশক জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা, পৃ. ৭৮১-৭৮২
২৭. আরিফ মঈনুদ্দীন
২৮. হাশেম খান, 'বঙ্গবন্ধু, শিল্পাচার্য ও কিছু অনুভব'। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩০
২৯. Sobhan, Rehman (1995). *Bangladesh : Problems of Governance*. UPL, Dhaka, p. 89-92
৩০. ঘোষ, পৃ. ২১২-২১৬
৩১. Sobhan, p. 295
৩২. *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ অক্টোবর ১৯৭০
৩৩. Khan (1997), p. 274-275
৩৪. Bass, Gary J (2013). *The Blood Telegram: Nixon, Kissinger and a Forgotten Genocide*. Alfred A. Knoph, New York, p. 22
৩৫. Karim, p. 169
৩৬. Blood, Archer K (2006). *The Cruel Birth of Bangladesh- Memoirs of an American Diplomat*. UPL, Dhaka p. 116

৩৭. *দৈনিক সংবাদ*, ৩০ নভেম্বর ১৯৭০

৩৮. Blood, p. 128

৩৯. Ibid, p. 68

৪০. Sobhan, Rehman (2015). *From Two Economies to Two Nations : My Journey to Bangladesh*. Daily Star Books, Dhaka, p. 91

৪১. Chowdhury, p. 129

৪২. Blood, p. 130

৪৩. হাবীব, পৃ. ৩৩

৪৪. মোস্তাক আহমদ চৌধুরী, আরিফ মঈনুদ্দীন

৪৫. Matinuddin, Lt. Gen. Kamal. *Tragedy of Errors-East Pakistan Crisis 1968-1971*. Wajidalis, Lahore, P. 107

৪৬. Blood, p. 129

৪৭. Ibid, p. 131-132

৪৮. Roy, Raja Tridiv (2003). *The Departed Melody (Memoirs)*. PPA Publications, Islamabad, p. 202-206

যাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে

আ স ম আবদুর রব : পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি, জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমানে এর একটি অংশের সভাপতি। ২৮ অক্টোবর ২০১৫

আনিসুজ্জামান : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১০ অক্টোবর ২০১৬

আবদুল করিম : ছাত্রলীগের সাবেক সংগঠক। ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান পণ্ড করার দায়ে দুই বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। পরে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। সাবেক সংসদ সদস্য ও হুইপ। পরে নাম হয়েছিল আবদুল করিম আব্বাসী। ২২ এপ্রিল ২০১৬

আবদুর রাজ্জাক : ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। অক্টোবর ১৯৮৩

আমানউল্লাহ : এপিপির চিফ রিপোর্টার এবং ইউপিআই, *ডেইলি টেলিগ্রাফ* ও ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদদাতা ছিলেন। পরে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ছিলেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

আরিফ মঈনুদ্দীন : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক সহকারী অধ্যাপক, বিএনপি সরকারের সাবেক উপমন্ত্রী। ১৩ অক্টোবর ২০১৫, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

আসাদ রহমান : পাকিস্তানের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও মানবাধিকার সংগঠক। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস এ রহমানের ছেলে। ১৮ জুলাই ২০০৮

এস এম ইউসুফ : ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি (১৯৭০-৭২), আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আওয়ামী লীগের সাবেক শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং পরে শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক, অবলুপ্ত বাকশালের সাংগঠনিক সম্পাদক। ২১ অক্টোবর ২০১৫

কোহিনূর হোসেন : 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় অভিযুক্ত লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের স্ত্রী। ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪

কামালউদ্দিন আহমেদ : তিতুমীর কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক সহসভাপতি, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র অন্যতম অভিযুক্ত সুলতান উদ্দিন আহমদের ছোট ভাই। জুলাই-আগস্ট ২০১৩

কামাল আহমেদ : ১৯৬০ ও সত্তরের দশকের রাজনৈতিক পোস্টার আঁকিয়ে। ঢাকার বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থায় শিল্প উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানে কানাডাপ্রবাসী। ২৬ জানুয়ারি ২০১৫

নুরুল ইসলাম তালুকদার : আইনজীবী, সাবেক বিডি মেম্বার, নীলক্ষেত-বাবুপুরা ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি। এপ্রিল ২০১১

বেগম জাহানারা খান : আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম কোষাধ্যক্ষ ইয়ার মোহাম্মদ খানের স্ত্রী। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

মতিউর রহমান : সম্পাদক, *প্রথম আলো*। সাপ্তাহিক *একতা* ও দৈনিক *ভোরের কাগজ*-এর সাবেক সম্পাদক। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সাবেক সদস্য। ২৮ জুলাই ২০১৬

মাহফুজ উল্লাহ : ছাত্র ইউনিয়নের (মেনন গ্রুপ) সাবেক সংগঠক, সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*র সাবেক সহকারী সম্পাদক, লেখক ও গবেষক। ২২ মে ২০১৬

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম : সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি এবং ডাকসুর সাবেক সহসভাপতি। ৩১ জুলাই ২০১৬

মোস্তাক আহমদ চৌধুরী : আওয়ামী লীগ নেতা। সাবেক সংসদ সদস্য। বর্তমানে কক্সবাজার জেলা পরিষদের সভাপতি। ২ এপ্রিল ২০১৬

রেজাউল হক চৌধুরী মুশতাক : ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক দপ্তর সম্পাদক। বর্তমানে ব্যবসায়ী। ২৮ এপ্রিল ২০১৫

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন : ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ, খন্দকার মোশতাক আহমদের সরকারের প্রতিমন্ত্রী, জাতীয় পার্টির সাবেক মহাসচিব। বর্তমানে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান। ৯ অক্টোবর ২০১৫

সাইদুর রহমান : ব্যবসায়ী। শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত আস্থাভাজন। জাসদের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

সিরাজুল আলম খান : ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। বিএলএফের (মুজিব বাহিনী) অন্যতম সংগঠক। জাসদের প্রতিষ্ঠাতা। নভেম্বর ২০১৩-মে ২০১৪, ১৭ আগস্ট ২০১৬

নির্ঘণ্ট

ই

এ

ও

জ

ট

ড

ঢ

ত

ধ

ন

